বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন

শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ
পিএইচ.ডি গবেষক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ২০১৮

বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন

তত্ত্বাবধায়ক	পিএইচ.ডি গবেষক
অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া	শিপক কৃষ্ণ দেবনাথ
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ	পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর ২০১৮

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ. ডি গবেষক শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ **"বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন"** শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে সমাপ্ত করেছেন। আমি অভিসন্দর্ভটি নিরীক্ষা করেছি এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের নির্দেশনা প্রদান করেছি। অভিসন্দর্ভটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণার বিষয় এবং এই অভিসন্দর্ভে তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। এ গবেষণাকর্ম বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

উপর্যুক্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে আমি পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের গবেষক শিপক কৃষ্ণ দেব নাথকে **"বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন"** শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী জমা দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

(অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া)

পিএইচ. ডি তত্ত্বাবধায়ক

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র

আমি শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ, পিএইচ. ডি গবেষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে যথাযথভাবে প্রয়োজনীয় কোর্স ওয়ার্ক সমাপ্ত করার পর গবেষণার নিয়ম অনুসরণপূর্বক **"বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন"** শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করেছি। এ অভিসন্দর্ভে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তার দায়-দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ ইতঃপূর্বে কোথাও প্রকাশিত কিংবা অন্য কোনো ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত হয় নি।

(শিপক কৃষ্ণ দেব নাথ)

পিএইচ. ডি গবেষক

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচি

	পৃষ্ঠা
অবতরণিকা	**১-৯**
১. গবেষণার প্রস্তাবনা	১
২. গবেষণার উদ্দেশ্য	২
৩. গবেষণার পরিধি	২
৪. গবেষণা পদ্ধতি	৪
৫. অভিসন্দর্ভের গঠন-শৈলী	৫
৬. গবেষণার উৎস	৭
৭. সীমাবদ্ধতা	৭
৮. কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৭
প্রথম অধ্যায় : অশ্বঘোষের জীবন-চরিত: একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা	**৯-৪৪**
১. ভূমিকা	৯
২. সময়কাল	৯
৩. জন্ম ও বংশ পরিচয়	১৮
৪. নামকরণ	২২
৫. অশ্বঘোষের বাল্য ও যৌবনকাল	২৩
৬. বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা	২৫
৭. নিকায় (Sect)	২৯
৮. দীক্ষা-উত্তর জীবন	৩০

৯. পাণ্ডিত্য ও অভিধা ৩৪

১০. উপসংহার ৩৮

তথ্যনির্দেশ ৩৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ ৪৪-৭৯

১. ভূমিকা ৪৪

২. প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ পদ্ধতি ৪৫

৩. ঐতিহ্য বা উৎস অনুসারে অশ্বঘোষের রচনা তালিকা উপস্থাপন ৪৬

৪. ঐতিহ্যে বর্ণিত অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম সমীক্ষা ৪৭

৪.১. বুদ্ধচরিত (বুদ্ধচরিতম্) ৪৭

৪.২. সৌন্দরনন্দ (সৌন্দরনন্দম্) ৪৯

৪.৩. শারিপুত্রপ্রকরণ (শারিপুত্রপ্রকরণম্) ও নাম বিহীন প্রতীকী নাটক ৫০

৪.৪. অন্যান্য নাটক ৫২

৪.৫. রাষ্ট্রপাল ৫২

৪.৬. সূত্রালংকার ৫৩

৪.৭. বজ্রসূচী ৫৭

৪.৮. গণ্ডীস্তোত্রগাথা ৫৯

৪.৯. শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র ৬০

৪.১০. কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ৬৩

৪.১১. ষড়্গতিকারিকাহ্ ৬৪

৪.১২. শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র ৬৫

৪.১৩. বিভিন্ন উৎসে বর্ণিত অন্যান্য গ্রন্থ ৬৮

৫. উপসংহার ৬৮

তথ্যনির্দেশ ৭১

তৃতীয় অধ্যায় : অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস অন্বেষণ ৮০-১২৩

১. ভূমিকা ৮০

২. অশ্বঘোষের বিতর্কমুক্ত সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস ৮০

২.১. বুদ্ধচরিত ৮১

২.১.১. বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল বিষয়বস্তু ৮১

২.১.২. বুদ্ধচরিত কাব্যে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্র ৮৮

২.১.৩. বুদ্ধচরিত কাব্যের বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি ৮৯

২.১.৪. বুদ্ধচরিত কাব্যের উৎস ৯০

২.১.৫. সমাজ জীবনে বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রভাব ৯৩

২.২. সৌন্দরনন্দ ৯৫

২.২.১. সৌন্দরনন্দ কাব্যের বিষয়বস্তু ৯৫

২.২.২ সৌন্দরনন্দ কাব্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র ১০৪

২.২.৩. সৌন্দরনন্দ কাব্যের বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি ১০৫

২.২.৪. সৌন্দরনন্দ কাব্যের উৎস ১০৬

২.২.৫. সমাজ জীবনে সৌন্দরনন্দ কাব্যের প্রভাব ১০৮

২.৩. নাটকের বিষয়বস্তু ও উৎস ১১০

৩. অশ্বঘোষের বিতর্কযুক্ত সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু ও উৎস ১১২

৩.১. সূত্রালংকার গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উৎস ১১২

৩.২. বজ্রসূচী গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উৎস ১১৩

৩.৩. শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র ১১৭

৩.৪. গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্ধের বিষয়বস্তু ও উৎস ১১৯

৪. উপসংহার ১২০

তথ্যনির্দেশ ১২১

চতুর্থ অধ্যায় : অশ্বঘোষের রচনাশৈলী, রচনার উদ্দেশ্য এবং স্বাজাত্যবোধ ১২৪-১৬০

১. ভূমিকা ১২৪

২. অশ্বঘোষের রচনাশৈলী : প্রেক্ষিত বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্য ১২৪

৩. রচনার উদ্দেশ্য ১৩৪

৩.১. সৌন্দরনন্দ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ১৩৫

৩.২. বুদ্ধচরিত কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ১৩৬

৩.৩. নাটক রচনার উদ্দেশ্য ১৩৭

৩.৪. শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ১৩৮

৩.৫. অন্যান্য গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ১৩৯

৪. অশ্বঘোষের স্বাজাত্যবোধ ১৪১

৪.১. প্রাচীন ভারতের জনপদ ১৪১

৪.২. নদ-নদী ১৪৪

৪.৩. প্রকৃতি : বৃক্ষ, ফুল-ফল ১৪৬

৪.৪. প্রাণীকূল ১৪৮

৪.৫. সমাজ জীবন ১৮৯

৪.৬. ধার্মিক ব্যক্তিত্ব ১৫০

৫. উপসংহার ১৫৬

তথ্যনির্দেশ ১৫৭

পঞ্চম অধ্যায় : মহাকবি হিসেবে অশ্বঘোষের মূল্যায়ন : প্রেক্ষিত বুদ্ধচরিত ১৬১-২০৭

১. ভূমিকা ১৬১

২. মহাকাব্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা ১৬২

৩. বুদ্ধচরিত কাব্য সমীক্ষা ১৬৩

৪. বুদ্ধচরিত কাব্যে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা ১৬৯

৪.১. সূচনা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৬৯

৪.২. বিষয়বস্তু বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৭১

৪.৩. নায়ক বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৭২

৪.৪. নামকরণ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য ১৭৪

৪.৫. সর্গ বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৭৪

৪.৬. উদ্দেশ্য বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৭৯

৪.৭. ছন্দ-অলংকার বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৮১

৪.৮. রস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৯০

৪.৮.১. বীররস ১৯১

৪.৮.২ শৃঙ্গার রস ১৯৩

৪.৮.৩. শান্তরস ১৯৫

৪.৯. ভাষা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৯৫

৪.১০. নানা বৃত্তান্ত বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ১৯৭

৪.১১. বিরহ-মিলন বিষয়ক বৈশিষ্ট্য ২০০

৫. উপসংহার ২০১

তথ্যনির্দেশ ২০২

উপসংহার **২০৮-২২০**

গ্রন্থপঞ্জি **২২১-২৩১**

অবতরণিকা

১. গবেষণার প্রস্তাবনা

বুদ্ধ-উত্তর কালে বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম-দর্শনকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে পালি ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায়ও প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে 'বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' নামে পরিচিত। যেসব কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক বুদ্ধের জীবন-দর্শনকে ভিত্তি করে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা পূর্বক বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে অশ্বঘোষ অন্যতম। অশ্বঘোষের জীবন স্রোত নানা ধারায় প্রবাহিত ছিল। বিশেষত, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ - এই দু'টি পরস্পর ভিন্নমুখী ধারার জীবন চর্যা তাঁর মনোজগতকে নানাভাবে করেছিল ঋদ্ধ। দু'টি পরস্পর বিপরীত ধারার আদর্শকে তিনি স্বীয় জীবনে আপন মহিমায় ধারণ করেছিলেন, যা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে করেছিল প্রজ্ঞালোকে উদ্ভাসিত, সৃজনশীল এবং মহিমামণ্ডিত। বেদশাস্ত্র, পুরাণশাস্ত্র ও বৌদ্ধশাস্ত্রের পাশাপাশি দর্শন, কলাবিদ্যা, জ্যোর্তিবিদ্যা, আয়ুর্বেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, ছন্দ, অলংকার, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রেও ছিল তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য। বহুমাত্রিক জ্ঞান ও অতুলনীয় প্রতিভার অধিকারী এ প্রবাদ তুল্য পুরুষ সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে সগৌরবে বিচরণ করেছেন এবং প্রাচীন ভারতের সাহিত্যজগতকে করেছিল ঋদ্ধ থেকে ঋদ্ধতর। নানা আঙ্গিকের কালজয়ী সাহিত্যকর্ম রচনা এবং কীর্তিময় কর্ম সম্পাদনপূর্বক তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন মহাকবি, গায়ক, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, ধর্মপ্রচারক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠক হিসেবে। তাঁর কালজয়ী সাহিত্যকর্ম বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই কীর্তিমানের অবদান মূল্যায়ন করাই আমার গবেষণার মূল প্রস্তাবিত বিষয়।

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

গৌতম বুদ্ধের জীবন-দর্শন অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের মূল উপজীব্য বিষয়। তাঁর সাহিত্যকর্মে বুদ্ধের জীবন-দর্শনের পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজ, ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য ও তত্ত্বও আলোচিত হয়েছে। পণ্ডিতগণ অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে নিহিত থাকা এসব তথ্য ও তত্ত্ব প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হিসেবে গণ্য করে থাকেন। এসব তথ্য ও তত্ত্ব উন্মোচিত করার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করা সম্ভব। তাছাড়া, ভারতীয় উপমহাদেশে বর্তমানে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জীবনের বিবর্তিত রূপ। মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জীবন সম্পর্কিত ধারণাসমূহ বর্তমান সমাজ জীবনের নঞর্থক দিক্সমূহ চিহ্নিতকরণ ও বিদূরিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ কারণে মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের পঠন-পাঠন এবং গবেষণা অত্যাবশ্যক। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়নপূর্বক প্রাচীন ভারতীয় সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করাই এই অভিসন্দর্ভের প্রধান উদ্দেশ্য।

৩. গবেষণার পরিধি

আমরা জানি, প্রাচীন ভারতীয় কবি-সাহিত্যিকগণ ছিলেন আত্ম-প্রচার বিমুখ। তাঁরা উত্তরসূরীদের অমূল্য রত্নরাজি উপহার দিয়ে গেলেও তাঁদের কাছে নিজেদের গোপনও করে গেছেন। এ কারণে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের জীবন-চরিত আমাদের অজ্ঞাত। আমরা জানি না তাঁদের সঠিক পিতৃ-মাতৃ পরিচয়, জানি না বংশ এবং আবাস স্থলের কথা কিংবা কখন তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, কেউ কেউ তাঁদের রচনার পাতায় নিজেদের নামটি পর্যন্তও উহ্য রেখেছেন, ফলে দূরপণীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে অজ্ঞাত-পরিচয় সেই রচনাটি কার সৃষ্ট তা

নির্ধারণে। এসব কারণে সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের জীবন-চরিত ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে যুক্ত হয়েছে একের পর এক জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি। কারও কারও জীবনকথা ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এই জনশ্রুতি বা কিংবদন্তিই একমাত্র উৎস, যা আমাদের আলোচ্য প্রতিভা অশ্বঘোষের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর জীবন-চরিত যেমন কুয়াশাচ্ছন্ন, তেমনি তাঁর সাহিত্যকর্মের অধিকাংশই তিব্বতি ও চৈনিক ভাষায় সংরক্ষিত। তাছাড়া, তাঁর সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত বহু গ্রন্থের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে এই মহাপণ্ডিতের জীবন ও কর্ম-দর্শন এখনো গবেষণার উপজীব্য বিষয় হিসেবে যথেষ্ট সমাদৃত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম প্রাচীন ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর। তাই অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম ও জীবন-দর্শনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে উক্ত বিষয়ে বহির্বিশ্বে বহু গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। যথেষ্ট গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু প্রবন্ধ রচিত হলেও প্রস্তাবিত বিষয়ে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা এখনো হয়নি। তার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ চিহ্নিত করা যায় :

১. অশ্বঘোষের অল্পসংখ্যক গ্রন্থ কেবল বাংলায় অনূদিত হয়েছে। কলিকাতা হতে প্রকাশিত হওয়ায় সেসব গ্রন্থও বাংলাদেশে সহজলভ্য নয়।

২. অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত তিব্বতি ও চৈনিক ভাষায় অনূদিত বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বহু গ্রন্থের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি বহু গ্রন্থ বাংলা ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় ভাষান্তরিত এখনো হয়নি।

৩. বাংলাদেশে বিদেশি গবেষকদের অশ্বঘোষ বিষয়ক গবেষণাকর্ম সহজলভ্য নয়।

৪. বাংলাদেশে মূলত পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন বিষয়ক গ্রন্থের পঠন-পাঠন ও গবেষণা যথেষ্টভাবে হলেও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের গবেষণা তেমন একটা হয়নি। বুদ্ধের জীবন-দর্শন অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের মূল উপজীব্য বিষয় হলেও

সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশে তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিষয়ে গবেষণা খুব একটা হয়নি। সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের অভাবকে এর মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশ বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তিতে বহু উন্নত হয়েছে। ফলে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের যোগাযোগ ও সম্পর্ক যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ও সম্পর্কও সৃষ্টি হয়েছে, যা বাংলাদেশে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং তথ্যকে সহজলভ্য করে তুলেছে। নানা প্রতিকূলতা থাকলেও উপরিউক্ত কারণে আমি প্রস্তাবিত বিষয়টি গবেষণার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছি। তাছাড়া, সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার কারণেও আমি উক্ত বিষয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছি।

৪. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়টি মূলত সাহিত্য নির্ভর, বিবৃতিমূলক এবং সমাজ বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। এ কারণে গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে 'Content Analysis' পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকের মতো অশ্বঘোষের জীবন-চরিত ও সাহিত্যকর্ম বিষয়েও সৃষ্টি হয়েছে বহু জনশ্রুতি বা কিংবদন্তি। ফলে অতিরঞ্জিত ও ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ পৃথক্ করার ক্ষেত্রে আমি 'Content Analysis' পদ্ধতি গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

অশ্বঘোষ রচিত সাহিত্যকর্ম, অন্যান্য ভাষায় অনূদিত অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম; সমসাময়িককালে রচিত সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত এবং ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থসমূহ গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছি। অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ও গবেষকদের গবেষণাকর্ম দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গণ্য করেছি। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎসে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ 'Content Analysis` পদ্ধতির মাধ্যমে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। প্রস্তাবিত বিষয়ে উৎসসমূহে

অভিন্নভাবে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ইতিহাসস্পর্শী তথ্য হিসেবে এবং বৈসাদৃশ্য তথ্যসমূহ অতিরঞ্জিত তথ্য হিসেবে গণ্য করেছি। এভাবে 'Content Analysis' পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক তথ্যসমূহ চিহ্নিত করে গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়টি আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।

৫. অভিসন্দর্ভের গঠন-শৈলী

বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম-দর্শনের ভিত্তিতে সংস্কৃত ভাষায় জীবনালেখ্য, কাব্য, নাটক, গল্প, গান প্রভৃতি ছাড়াও ধর্ম, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভুগোল, ভাষাতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক নানা শ্রেণির গ্রন্থ রচিত হয়েছে। মহাকবি অশ্বঘোষ বৈচিত্রময় বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের কোনো কোনো শাখাকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন তা প্রকটিত করার মাধ্যমে বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করার মানসে গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়টি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত পূর্বক অভিসন্দর্ভটি রচনা করা হয়েছে। বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছি তা হচ্ছে তিনি কোন্ পরিবার ও পরিবেশ হতে এসে কীভাবে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তা স্পষ্ট করা। অশ্বঘোষের জীবন-চরিত পর্যালোচনা সাপেক্ষেই তা প্রকটিত করা সম্ভব। তাই প্রথম অধ্যায়ে অশ্বঘোষের জীবন-চরিত আলোচনা করেছি।

অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ করাকে তাঁর অবদান মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছি। কারণ, অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিছু গ্রন্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ করার মাধ্যমে সেই বিতর্ক যেমন নিরসন করা সম্ভব, তেমনি অশ্বঘোষ কি কি ধরণের গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের কোন্ কোন্ শাখাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তাও জানা সম্ভব। তাই, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ করেছি।

সাধারণত একজন লেখকের কৃতিত্ব নির্ভর করে পাঠক সমাজে তাঁর রচিত গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা উপর। কিন্তু গ্রন্থের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে গ্রন্থের গুণগত মান এবং অবলম্বনকৃত বিষয়বস্তুর মহত্ত্বের উপর। বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রন্থের গুণগত মান এবং অবলম্বনকৃত বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব নির্ধারণ করা যায়। এ কারণে তৃতীয় অধ্যায়ে প্রস্তাবিত গবেষণার অপর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস সমীক্ষা করেছি।

রচনাশৈলী, রচনার উদ্দেশ্য এবং স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতিকে অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছি। কারণ, বিষয়বস্তুর মহত্ত্বের পাশাপাশি যদি রচনাশৈলী সৌকর্যমণ্ডিত না হয়, রচনার উদ্দেশ্য মহৎ না হয় এবং রচনায় স্বদেশী উপাদান বা ইতিহাস-ঐতিহ্য নিহিত না থাকে তখন সেই সাহিত্যকর্ম সমাজে সদর্থক ভূমিকাও রাখতে পারে না। মূলত এই তিনটি গুণের উপর একজন লেখকের রচনার সার্থকতা ও সামাজিক অবদান নির্ভর করে। তাই, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের সামাজিক অবদান মূল্যায়নের নিমিত্ত চতুর্থ অধ্যায়ে তাঁর রচনাশৈলী, রচনার উদ্দেশ্য এবং স্বাজাত্যবোধ সমীক্ষা করেছি।

বিভিন্ন পরিচয় থাকলেও অশ্বঘোষ মহাকবি হিসেবেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। তিনি মহাকাব্য রচনা করে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যকে ঋদ্ধ করার কারণে এই খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি 'মহাকবি' অভিধায় ভূষিত হওয়ার যোগ্য কি না এবং সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকাব্য শাখায় তিনি কতটুকু অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তা নির্ণয়ের জন্য পঞ্চম অধ্যায়ে মহাকবি হিসেবে অশ্বঘোষের মূল্যায়ন আলোচনা করেছি।

পরিশেষে, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনপূর্বক প্রস্তাবিত গবেষণাকর্মের উপসংহার টেনেছি এবং সর্বশেষে তথ্যপঞ্জি উপস্থাপনপূর্বক গবেষণার উৎস নির্দেশ করেছি।

৬. গবেষণার উৎস

আমি প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়টি প্রকটিত করার ক্ষেত্রে দু'ধরণের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করেছি। আলোচ্য বিষয়টি মূলত বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য নির্ভর, সেহেতু সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলোকে গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিবেচনা করেছি। বিশেষত, অশ্বঘোষ এবং তৎসমকালে রচিত গ্রন্থগুলোকে গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে অধিক প্রাধান্য দিয়েছি। এরূপ উৎসের মধ্যে অন্যতম হলো : *বুদ্ধচরিতম্, সৌন্দরনন্দম্, শারিপুত্রপ্রকরণম্, বজ্রসূচী, শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র* বা *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith, ললিতবিস্তর, মহাবস্তু, দিব্যাবদান, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মেঘদূতম্, রঘুবংশম্, ভরতনাট্যশাস্ত্রম্, দণ্ডি কাব্যাদর্শঃ, সাহিত্যদর্পণঃ ।*

আলোচ্য বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য দেশ-বিদেশের গবেষকদের প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হতেও তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গণ্য করেছি। এভাবে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক গবেষণার প্রস্তাবিত বিষয়টি প্রকটিত করেছি।

৭. সীমাবদ্ধতা

আমি বিশ্বাস করি, এই গবেষণা কর্মটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করবে। তবে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে প্রস্তাবিত বিষয়টি আমি যথার্থভাবে প্রতিপন্ন করতে পেরেছি বলে মনে করি না। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে কোনো যোগ্য গবেষক আমার গবেষণায় যে অপূর্ণতা রয়েছে তা বিদূরিত করতে সক্ষম হবেন।

৮. কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে আমি বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত ও সুহৃদের সহযোগিতা লাভ করেছি। তন্মধ্যে সর্ব প্রথমে আমার তত্ত্বাবধায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়ার অবদান শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করছি। তিনি গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, তথ্য নির্দেশ

এবং তথ্য বিচার-বিশ্লেষণ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিসন্দর্ভ রচনায় অপরিসীম সহযোগিতা করেছেন।

তৎপর, পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। তিনি সেমিনার আয়োজন এবং অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সহযোগিতা, পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদানপূর্বক গবেষণা সুসম্পন্ন করতে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, বিশেষত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রাণী বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক ড. নীরু বড়ুয়া ও ড. শান্টু বড়ুয়া প্রমুখের সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. ময়না তালুকদারের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নানা পরামর্শ প্রদান করে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করেছেন। অভিসন্দর্ভের তথ্যসংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। সেসব গ্রন্থগারের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সেমিনার কর্মকর্তা ড. মৈত্রী তালুকদার, অফিস কর্মকর্তা বিশ্বজিত বড়ুয়া এবং অঞ্জন বড়ুয়া (বিটু) প্রমুখের সহযোগিতাও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। এছাড়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের আমার দুই প্রিয় ছাত্র হিমেল কর্মকার ও রিকু চৌধুরীর প্রতিও কৃতজ্ঞ। তাঁরা আমার অভিসন্দর্ভ সম্পন্ন করতে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন।

পরিশেষে, বাংলাদেশ জাতীয় প্রাচ্যবিদ্যা প্রচার পরিষদের চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রামস্থ হাটহাজারী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রী মিলন চন্দ্র দেবনাথ এবং আমার স্ত্রী তৃষা নাথ সার্বক্ষণিক উৎসাহ প্রদান ও অনুপ্রাণিত করে অভিসন্দর্ভটি সুসম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাদের অবদানও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

প্রথম অধ্যায়

অশ্বঘোষের জীবন-চরিতঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

১. ভূমিকা

অশ্বঘোষের জীবন-চরিত এখনো গবেষকদের কাছে কুয়াশাচ্ছন্ন। তাঁর জন্মকালীন সময়কে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অন্ধকার যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। উৎসসমূহে অশ্বঘোষের যে জীবন-কথা পাওয়া যায় তা তাঁর মৃত্যুর অনেক পরবর্তীকালে ইতিহাস-জনশ্রুতির সংমিশ্রণে রচিত। তাছাড়া, অশ্বঘোষের জীবনীর অধিকাংশ তথ্য তিব্বতি ও চৈনিক ভাষায় সংরক্ষিত, যা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পর বিরোধী। ফলে এখনো গবেষকগণ তাঁর ইতিহাসস্পর্শী জীবন-চরিতের সন্ধানে গবেষণারত। সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে অশ্বঘোষের অবদান নির্ণয়ে অশ্বঘোষের ইতিহাস সম্মত জীবন-চরিত সম্পর্কে ধারণা অত্যাবশ্যক। কারণ, তিনি কোন্ পরিবার ও পরিবেশ হতে এসে কীভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করেছেন তা স্পষ্ট করা না গেলে সঠিকভাবে অশ্বঘোষের মূল্যায়ন করা যাবে না। তাই এ অধ্যায়ে বিভিন্ন উৎসে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ চিহ্নিত করে অশ্বঘোষের ইতিহাসসম্মত জীবন চরিত সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

২. সময়কাল

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, অশ্বঘোষ বিস্মৃত এক মহৎ চরিত্র, যার সময়কাল বিতর্কিত। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মও এ ব্যাপারে নীরব। বিভিন্ন ঐতিহ্য এবং গবেষকদের গবেষণাকর্মে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে প্রতীতি জন্মে যে, অশ্বঘোষ ছিলেন - আদিকবি বাল্মীকি ও পতঞ্জলির যোগ্য উত্তরসূরি এবং কালিদাস ও ভাসের অনুপ্রেরণা উদ্ভাবী পূর্বসূরি। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে বাল্মীকি-পতঞ্জলির প্রভাব এবং অপরদিকে কালিদাস ও ভাসের সাহিত্যকর্মে অশ্বঘোষের প্রভাব থাকায় এই অভিমতটি সৃষ্টি হয়। এ বিষয়টি পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। তবে বহুল

প্রচলিত অভিমত হচ্ছে, অশ্বঘোষ ছিলেন কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক। চৈনিক ঐতিহ্যের তথ্যের ভিত্তিতে এ অভিমতটি সৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন উৎসে অশ্বঘোষের জীবনের নানা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্রাট কণিষ্কের সম্পর্ক দৃষ্ট হওয়ায় এই অভিমতটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। চৈনিক ঐতিহ্যে অশ্বঘোষ, নাগার্জুন এবং বসুবন্ধুর জীবনীর পাশাপাশি বহু ভারতীয় পণ্ডিত এবং প্রতিথযশা বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাওয়া যায়। এতে অশ্বঘোষের যে জীবনী পাওয়া যায় তা কুমারজীব ৩৪৪ খ্রিস্টাব্দ হতে ৪১০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংস্কৃত হতে চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।[১] মূল সংস্কৃত ভার্সনটি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। চৈনিক ভাষায় অনূদিত অশ্বঘোষের জীবনীতে সম্রাট কণিষ্ক ও অশ্বঘোষ সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় :

"অশ্বঘোষ বৌদ্ধ এবং অবৌদ্ধ বিদ্যায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বিতর্কে অসাধারণ যুক্তি প্রদর্শনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারঙ্গম। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, গৃহী উপাসক এবং উপাসিকাগণ তাঁকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতের রাজাগণও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। একদা উত্তর ভারতের রাজা কণিষ্ক মধ্যভারত তথা মগধ আক্রমণ করেন এবং মগধের কিছু অংশ দীর্ঘদিন ধরে অধিগত করে রাখেন। তখন মগধরাজ অর্থের বিনিময়ে সম্রাট কণিষ্কের সঙ্গে সন্ধি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বিনিময়ে সম্রাট কণিষ্ক তিনকোটি স্বর্ণমুদ্রা দাবী করেন। উত্তরে মগধরাজ বলেন, 'আমার নিকট এককোটি স্বর্ণ মুদ্রাও নেই। কিভাবে আমি তিন কোটি স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করব।' সম্রাট কণিষ্ক পুনরায় বলেন, 'আপনার রাজ্যে দু'টি মহামূল্যবান জিনিস আছে। একটি মহাকারুণিক বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র, অপরটি মহান পণ্ডিত ভিক্ষু অশ্বঘোষ। এদের মূল্য দুই কোটি স্বর্ণ মুদ্রার সমান। আমাকে এই দু'টি জিনিস প্রদান করুন।' উত্তরে মগধরাজ বলেন, 'আমার কাছে এই দু'টি জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'টি জিনিস প্রদান করা সম্ভব নয়।' এতে যুদ্ধের আশঙ্কা সৃষ্টি হলে অশ্বঘোষ মগধরাজকে ধর্মোপদেশ দানের মাধ্যমে শান্ত করেন এবং পরিশেষে মগধরাজ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র, পণ্ডিত অশ্বঘোষ এবং এক কোটি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে স্বীয় রাজ্য রক্ষা করেন।"[২]

যদিও উক্ত জীবনীর সংস্কৃত ভার্সন পাওয়া যায় নি, তথাপি চৈনিক ভাষায় অনূদিত উক্ত জীবনী হতে ধারণা জন্মায় যে, মহাকবি অশ্বঘোষ এবং সম্রাট কণিষ্ক সমকালীন ছিলেন।

অপর চৈনিক ঐতিহ্যের[৩] তথ্যও সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা কনিষ্কের সভা অলংকৃত করতেন তিনজন জ্ঞানী ব্যক্তি, যাঁরা হলেন : অশ্বঘোষ নামে একজন বোধিসত্ত্ব, মো-চা-লা (মাঠর) নামে একজন মন্ত্রী, এবং চরক নামের একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক, যিনি 'চরক সংহিতা' নামক বিখ্যাত চিকিৎসা বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থের রচয়িতা।

The Records of the Patriarchs[৪] মতেও অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন।

চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর যে জীবনী পাওয়া যায় তাতেও কাশ্মীর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত এক বৌদ্ধ সঙ্গীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। বসুবন্ধুর জীবনী পাঠে জানা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পাঁচশত বছর পর কাত্যায়নীপুত্র নামে এক অর্হৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বে কাশ্মীর অঞ্চলে এক সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু, পাঁচশত বোধিসত্ত্ব এবং পাঁচশত গৃহী (পণ্ডিত) উপস্থিত ছিলেন। অশ্বঘোষ উক্ত সঙ্গীতিতে সহ-সভাপতিত্ব করেন। তাঁরা (কাত্যায়নীপুত্র এবং অশ্বঘোষ) অভিধর্ম শাস্ত্র সংকলন করেন এবং বিভাষাশাস্ত্র নামে অভিধর্মশাস্ত্রের অট্ঠকথা রচনা করেন। বিভাষাশাস্ত্র রচনা করতে দশ বছর সময় লাগে এবং এতে দশ লক্ষ গাথা ছিল। রচনার পর অশ্বঘোষ সমগ্র বিভাষাশাস্ত্র পাথরে খোদাই করেন।[৫]

চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং[৬] এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তেও কাশ্মীর অঞ্চলে সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত সঙ্গীতির কথা উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাং এর মতে, সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীতিতে পার্শ্ব সভাপতিত্ব করেন এবং পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে উক্ত সঙ্গীতিতে মহাবিভাষাশাস্ত্র সংকলিত হয়েছিল। তিব্বতি ঐতিহাসিক ঐতিহ্যেও অভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।[৭] হিউয়েন সাং এর বর্ণনায় এবং তিব্বতি ঐতিহ্যে সম্রাট কণিষ্ক ও পার্শ্ব এর নামোল্লেখ থাকলেও অশ্বঘোষের নামোল্লেখ নেই। তবে

জানা যায় যে, অশ্বঘোষের দীক্ষাগুরু ছিলেন পার্শ্ব। যদি পার্শ্ব অশ্বঘোষকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দিয়ে থাকেন তাহলে অশ্বঘোষও যে সম্রাট কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন তা প্রতীয়মান হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যের তথ্যও অশ্বঘোষ ও সম্রাট কণিষ্ক যে সমসাময়িক ছিলেন তা প্রতিপন্ন করে। সম্রাট কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন তা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত এবং সর্বজন স্বীকৃত। মহাযানী বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরুষ্পুরে (পেশোয়ার) [মতান্তরে জলন্ধরে] চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে সভাপতিত্ব করেছিলেন আচার্য বসুবন্ধু। সহসভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন আচার্য অশ্বঘোষ। এই সঙ্গীতি সাত মাসকাল স্থায়ী হয়েছিলো এবং অশ্বঘোষের নেতৃত্বে এই সঙ্গীতিতে প্রসিদ্ধ মহাযানী গ্রন্থ 'বিভাষাশাস্ত্র' সংকলিত হয়েছিল।[৮]

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে ধারণা করা যায় যে, সম্রাট কণিষ্ক এবং অশ্বঘোষ সমসাময়িক ছিলেন। ফলে সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল নির্ণয়ের মাধ্যমে অশ্বঘোষের সময়কাল নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল নিয়েও ঐতিহ্যের তথ্যের মধ্যে যেমন ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় তেমনি পণ্ডিতদের মধ্যেও মতভেদ দেখা যায়। নিম্নে সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

জে. এফ. ফ্লিট[৯] (J. F. Fleet) ঐতিহ্যে বর্ণিত সকল তথ্য পর্যালোচনা করে সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল সম্পর্কে The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1906 সালে প্রকাশিত সংখ্যায় 'The Traditional Date of Kanishka' শিরোনামে এক চমৎকার প্রবন্ধ লিখেন, যা সম্রাট কণিষ্কের সঠিক সময়কাল নির্ণয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে উক্ত প্রবন্ধের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো :

গান্ধার এবং কাশ্মীর ঐতিহ্যের ভিত্তিতে হিউয়েন সাং অভিমত পোষণ করেছেন যে, সম্রাট কণিষ্ক বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ তথা মৃত্যুর চারশত (৪০০) বছর পর জন্মগ্রহণ করেন।

অপর চৈনিক ঐতিহ্য মতে, সম্রাট কণিষ্ক বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের চারশত (৪০০) বছর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

কাশ্মীর এবং ভারতীয় ঐতিহ্য মতে, সম্রাট অশোক বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত (১০০) বছর জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়কাল মূলত অশোকাবদান গ্রন্থের (পৃ. ৮৮৩) বর্ণনার আলোকে নির্ধারিত। ঐতিহ্যে বর্ণিত সম্রাট অশোক এবং সম্রাট কণিষ্কের দু'টি সময়কাল পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সম্রাট অশোক এবং সম্রাট কর্ণিষ্কের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে তিনশত (৩০০) বছরের। গ্রিক গবেষকের মতে, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ এবং ৩১২ অব্দের মধ্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিভিন্ন গবেষকের ভিন্ন ভিন্ন সময়কাল নির্দেশ করলেও তা গ্রিক গবেষকের নির্দেশিত সময়কালের মধ্যে পড়ে। যেমন, অন্যান্য নির্দেশিত সময়কাল গুলো হলো : খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫, ৩২১, ৩১৬ এবং ৩১২ অব্দ। ভি. এ. স্মিথ (Vincent Smith, Early History of India, p. 173) নতুন অভিমত হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ অব্দ। তিনি চন্দ্রগুপ্ত এবং সম্রাট অশোকের রাজত্বের মধ্যে অশোকাবদানের তথ্যের আলোকে ৫৬ বছর পার্থক্য গণ্য করে সম্রাট অশোকের সময়কাল নির্দেশ করেছেন। কিন্তু আমি (J. F. Fleet) মনে করি, চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণের সময়কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দ। ভারতীয় ঐতিহ্য (অশোবকাবদান) মতে, সম্রাট অশোক চন্দ্রগুপ্তের ৫৬ বছর পর সিংহাসনে আরোহণ করলে অশোকের অভিষেক কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব ২৬৪ অব্দ (৩২০-৫৬)। অশোকাবদান এবং মহাবংশ মতে, সম্রাট অশোকের অভিষেকের ২১৮ বছর পূর্বে বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ফলে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব (২৬৪+২১৮) = ৪৮২ অব্দ। চৈনিক ঐতিহ্য মতে, সম্রাট অশোক বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ১০০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। ফলে সম্রাট অশোকের সময়কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব (৪৮২-১০০)=৩৮২ অব্দ। চৈনিক ঐতিহ্য মতে, সম্রাট কণিষ্ক বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৪০০ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। ফলে সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব (৪৮২-৪০০) = ৮২ অব্দ। চৈনিক ও ভারতীয় ঐতিহ্য মতে, সম্রাট অশোক ও সম্রাট

কণিষ্কের মধ্যে ব্যবধান হচ্ছে ৩০০ বছরের। সে হিসেবেও সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল দাঁড়ায় খ্রিস্টপূর্ব (৩৮২-৩০০) = ৮২ অব্দ।

কিন্তু ঐতিহ্য মতে, সিংহাসনে আরোহণের পর সম্রাট অশোক ৩৭ বছর রাজত্ব করেন। ফলে সম্রাট কণিষ্ক এবং সম্রাট অশোকের মধ্যে ৩০০ বছরের যে ব্যবধান ছিল তার সঙ্গে আরো ৩৭ বছর যোগ হবে। অর্থাৎ সেই ব্যবধান বেড়ে হবে (৩০০+৩৭) বছর=৩৩৭ বছর। অর্থাৎ সম্রাট অশোকের অভিষেকের ৩৩৭ বছর পর সম্রাট কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্রাট অশোকের সিংহাসন আরোহণ কাল যদি খ্রিস্টপূর্ব ২৬৪ অব্দ হয়, তাহলে সম্রাট কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণকাল দাঁড়ায় (৩৩৭-২৬৪)=৭৩ খ্রিস্টাব্দ।

যেহেতু সম্রাট কণিষ্ক ও অশ্বঘোষ সমসাময়িক ছিলেন সেহেতু উক্ত সময়কালকে অশ্বঘোষের সময়কাল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। অর্থাৎ অশ্বঘোষও খ্রিস্টীয় ৭৩ অব্দে অব্দে বর্তমান ছিলেন।

কিন্তু চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর যে জীবনী পাওয়া যায়, তাতে কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত সঙ্গীতিটি বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৫০০ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। ঐতিহ্যের আলোকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৪৮২ অব্দ ধরলে সঙ্গীতিটি অনুষ্ঠানের সময়কাল দাঁড়ায় (৫০০-৪৮২)=১৮ খ্রিস্টাব্দ।[১০] যেহেতু সঙ্গীতিটি সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেহেতু উক্ত সময়কালকে কণিষ্কের সময়কাল হিসেবে চিন্তা করা যায়।

জে. এইচ. মার্শাল[১১] (J. H. Marshall) সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল সম্পর্কে *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, 1915 সালে প্রকাশিত সংখ্যায় The Date of Kanishka' শিরোনামে অপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেন। তিনি মূলত জে. এফ. ফ্লিট (J. F. Fleet) এর প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধটি রচনা করেন। তিনি উক্ত প্রবন্ধে সম্রাট কণিষ্কের সুনির্দিষ্ট কোনো সময়কাল উল্লেখ করেন নি। তবে তিনি বলেন, আবিষ্কৃত রাজকীয় মুদ্রার প্রমাণ উপস্থাপন

করতে পারলে জে. এফ. ফ্লিট-এর অভিমত অধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতো। তিনি আরো আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, পাকিস্তানের সিরকাপ প্রত্নস্থল হতে একদিন এমন প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন আবিষ্কৃত হবে যা সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল সম্পর্কে সকল সন্দেহ দূরীভূত করতে সক্ষম হবে।

প্রফেসর প্রিজিলুস্কি (Professor Przyluski) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ '*La Legende de l'*Empereur Acoka', (p. 166) লিখেছেন যে, অশোকাবদানের প্রাচীন অংশ খ্রিস্টপূর্ব ১৫০ হতে ১০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল এবং গ্রন্থটি অশ্বঘোষের পরিচিত ছিল। প্রিজিলুস্কির অভিমতকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ই. এইচ. জনস্টন অশ্বঘোষের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দ হতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যবর্তী সময় নির্ধারণ করেন। অবশ্য পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন খ্রিস্টপূর্ব ৫০ অব্দ বলে মত দিয়েছেন।[১২]

এম. উন্টারনীর্টস[১৩] (M. Winternitz, p. 257) চৈনিক ও তিব্বতি ঐতিহ্যের তথ্যের আলোকে সম্রাট কণিষ্ক এবং অশ্বঘোষ সমসাময়িক ছিলেন বলে মত প্রকাশ করেছেন এবং উভয়ের সময়কাল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি অশ্বঘোষকে কালিদাসের পূর্ববর্তী হিসেবেও অভিহিত করেছেন।

থমাস ওয়াট্টাস[১৪] (Thomas Watters) অশ্বঘোষের সময়কাল নির্ধারণ করেছেন খ্রিস্টীয় প্রথম শতক।

স্যামুয়েল বিল[১৫] (Samuel Beal) এর মতে, অশ্বঘোষের রাজত্ব আরম্ভ হয়েছিল খ্রিস্টীয় ৭৮ অব্দে।

কে. ভেন্‌কট রমনন [১৬] (K. Venkata Ramanan) এর মতে, কণিষ্কের সময়কাল খ্রিস্টীয় ৭৮ অব্দ।

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য [১৭]এর মতে, অশ্বঘোষকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের প্রান্তরেখার বাইরে বহিষ্কৃত করা যায় না।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতে, কুষাণ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি কণিষ্কের রাজত্বকাল খ্রিষ্টীয় ৭৮ হতে ১০১ অব্দ পর্যন্ত ব্যস্ত ছিল। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্বঘোষ ধর্মীয় ও সাহিত্য জগতে বহু ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদন করেছিলেন।[১৮]

বিমল চন্দ্র দত্ত[১৯] এর মতে, প্রাচীন ভারতবর্ষে কুষাণ-যুগের সূত্রপাত হয় ইন্দু-ব্যাক্ট্রিয়ান ও সিথো-পার্থিয়ান যুগের পর। এই ব্যাকট্রিয়ান গ্রিক রাজাগণ প্রায় খ্রিষ্টীয় ২৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই রাজত্বের অবসানের মধ্য দিয়েই কুষাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিস্তার লাভ করে। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কুজুল কদফিসেস। তিনি খ্রি. ২৫-৬৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর তাঁর পুত্র বিম কদফিসেস খ্রি. ৬৫-৭৫ অব্দে রাজত্ব করেন। কণিষ্ক হলেন বিম কদফিসেস এর পুত্র। উত্তরাধিকার সূত্রে বিম কদফিসেস এর পরেই কণিষ্কের রাজত্বের সূচনা হয়। কিন্তু বেশির ভাগ ঐতিহাসিকদের মতে, কণিষ্কের রাজত্বকালের সূচনা হয় খ্রি. ৭৮ অব্দ হতে। এই ক্ষেত্রে এটিই অনুমান করা যায় যে, পূর্বের দুই বছর কণিষ্ক হয়ত অস্থায়ী রাজা ছিলেন এবং খ্রি. ৭৮ এ তাঁর অভিষেক হয়েছিল।

সুমন কান্তি বড়ুয়া[২০] তাঁর 'মহাকবি অশ্বঘোষ' শীর্ষক প্রবন্ধে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত সমর্থন করেছেন।

উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অশ্বঘোষ ও সম্রাট কণিষ্কের সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহ্যে বর্ণিত তথ্য এবং গবেষকদের মতামতের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই। ফলে বলা যায় যে, সম্রাট কণিষ্ক ও অশ্বঘোষ সমসায়িক ছিলেন এবং উভয়ের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক হতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

এখন "অশ্বঘোষ ছিলেন - আদিকবি বাল্মীকি ও পতঞ্জলির যোগ্য উত্তরসূরি এবং কালিদাস ও ভাসের অনুপ্রেরণা উদ্ভাবী পূর্বসূরি" - এই অভিমতটি পর্যালোচনা করব। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম, বিশেষত বুদ্ধচরিতে অশ্বঘোষ বাল্মীকিকে আদি কবি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং রামায়ণ ও মহাভারত হতে অশ্বঘোষকে ভাব গ্রহণ করতে দেখা যায়। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের ৪৩ নং শ্লোকে বাল্মীকির কথা নিম্নরূপভাবে স্মরণ করেন :

বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ।

চিকিৎসিতং যচ্চ চকার নাত্রিঃ পশ্চাত্তদাত্রেয় ঋষির্জগাদ।। (বু. চ. ১:৪৩)

অর্থাৎ, বাল্মীকি প্রথম পদ্য রচনা করলেন, মহর্ষি চ্যবন তা গ্রথিত করতে পারেন নি। অত্রি যে চিকিৎসাশাস্ত্র প্রণয়ন করেন নি, পরবর্তীকালে ঋষি আত্রেয় তা প্রকাশ করেন।

তাছাড়া, বুদ্ধচরিতের অষ্টম সর্গের একাশিতম গাথায় রাম ও দশরথের কথাও উল্লেখ করেছেন। অধিকন্তু অশ্বঘোষ মহাভারতের গাথার অনুকরণেও *বুদ্ধচরিতে* বহু গাথা রচনা করেছেন। যেমন : মহাভারতে শুকদেবের জবাবে ব্যাসদেব বলেছেন,

প্রোক্তং তদ্ ব্যক্তমিত্যেব জায়তে বর্ধতে চ যৎ

জীর্যতে ম্রিয়তে চৈব চতুর্ভিলক্ষণৈর্যুতম্।

বিপরীতমতো যত্তু তদব্যক্তমুদাহৃতম্। (ম.ভ ১২.২৩৫.৩০-৩১)

অর্থাৎ, যা জন্মায়, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জীর্ণ হয়, মারা যায় - এই চার লক্ষণযুক্ত যা তাই ব্যক্ত বলে কথিত।

অপরদিকে বুদ্ধচরিতে অরাড় বলছেন :

জায়তে জীর্যতে চৈব বাধ্যতে শ্রিয়তে চ যৎ ।

তদ্ ব্যক্তমিতি বিজ্ঞেয়মব্যক্তং তু বিপর্যয়াৎ ।। (বু. চ. ১২.২২)

অর্থাৎ যা জন্মায়, জীর্ণ হয়, পীড়া প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং মারা যায়, তাকেই 'ব্যক্ত' বলে জানবে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অশ্বঘোষ *রামায়ণ-মহাভারতের* পরবর্তীকালের কবি।

অশ্বঘোষের পরবর্তীকালের কবিগণও অশ্বঘোষ হতে ভাব গ্রহণ করতে দেখা যায়। বিশেষ করে মহাকবি কালিদাস এবং ভাস অশ্বঘোষের কাব্য হতে ভাব গ্রহণ করেছেন বলে পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত হরপ্রসাদশাস্ত্রী[২১] চমৎকার উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন, যা প্রণিধানযোগ্য :

ত্বং গৌরবং বুদ্ধগতং চকর্ষ

ভার্য্যানুরাগঃ পুনরাচর্ষ।

সোহনিশ্চয়ান্নাপি যযৌ ন তস্থৌ

তরংস্তররঙ্গেষ্বিব রাজহংসঃ।।

অর্থাৎ, বুদ্ধের প্রতি অনুরাগ সামনে আকর্ষণ করছে, পিছনে টানছে প্রিয়ানুরাগ। ভালো মন্দ বিচার করতে না পেরে এগোতে বা পিছোতে পারলেন না, ঠিক তরঙ্গের বুকে রাজহংসের মতো।

অপরদিকে কালিদাস লিখেছেন :

মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ।

শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।

অর্থাৎ, পথে পর্বত কর্তৃক গতিরুদ্ধ হলে নদী যেমন আকুলিত হয় তেমনি গতিরোধ হওয়ায় শৈলাধিরাজ তনয়া গৌরী এগোতেও পারলেন না, ফিরতেও পারলেন না।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অশ্বঘোষ ছিলেন - আদিকবি বাল্মীকি ও পতঞ্জলির যোগ্য উত্তরসূরি এবং কালিদাস ও ভাসের অনুপ্রেরণা উদ্ভাবী পূর্বসূরি।

৩. জন্ম ও বংশ পরিচয়

অশ্বঘোষের '*সৌন্দরনন্দ*' কাব্যে কেবল তাঁর জন্মস্থান এবং মাতার নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, তাঁর জীবন-চরিত সম্পর্কে আর কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। *সৌন্দরনন্দ* কাব্যের আবিষ্কৃত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির কবিকথা অংশে বা Colophon -এ নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় :

"আর্যসুবর্ণাক্ষীপুত্রসাকেতস্য ভিক্ষোরাচার্যভদন্তাশ্বঘোষস্য মহাকবের্মহাবাদিনঃ কৃতিরিয়ম্" ।[২২] অর্থাৎ, মহাকবি, মহাবাগ্মী, ভিক্ষু আচার্য, ভদন্ত, সাকেতের সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ এ কাব্য রচনা করেন।

উপরোক্ত তথ্য হতে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষের জন্মস্থান সাকেত এবং তাঁর মাতার নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী।[২৩]

অশ্বঘোষের অপর মহান গ্রন্থ বুদ্ধচরিতের যে তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া যায় তার Colophon-এও অশ্বঘোষকে সাকেতের সুবর্ণাক্ষী পুত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে, মাতার নাম উল্লেখ থাকলেও পিতার নামোল্লেখ নেই।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কুমারজীব অনূদিত চৈনিক ভাষায় অশ্বঘোষের যে জীবনী পাওয়া যায় তাতে অশ্বঘোষের দীক্ষা কাহিনি ও প্রচার জীবন সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গেলেও জন্মস্থান ও পিতা-মাতা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে তিনি যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পালন করতেন সে সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[২৪]

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে পরমার্থ চৈনিক ভাষায় বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর যে জীবনী অনুবাদ করেন তাতে অশ্বঘোষকে শ্রাবস্তীর অন্তর্গত সাকেতের অধিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তাতে পিতৃ-মাতৃ বা বংশ পরিচয় উল্লেখ নেই। তবে উক্ত জীবনীতে বর্ণিত আছে যে, অশ্বঘোষ বেদে পারঙ্গম ছিলেন, যা অশ্বঘোষ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ইঙ্গিত বহন করেন।[২৫]

চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্যে স্বনামধন্য গবেষক হচ্ছেন এস. বিল (স্যামুয়েল বিল)। তিনি বহু চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্যের ইংরেজি অনুবাদ করে গবেষকদের গবেষণার পথ সুগম করেছেন। তিনি চৈনিক ভাষায় অনূদিত *Lai-tai-san-paou-ki* (vol. I, p. 13) গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, অশ্বঘোষ পশ্চিম ভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং জাতিতে ছিলেন ব্রাহ্মণ।[২৬]

তিব্বতি ঐতিহ্যের আলোকে তারানাথ ভারতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তিনি কাল, মাতৃচেট এবং অশ্বঘোষ অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন কাল সংঘগুহ্য নামক এক ধনী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার কারণে যিনি পরবর্তীতে মাতৃচেট এবং পিতৃচেট নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২৭] তিনি বেদ মন্ত্রে খুবই পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতগণ অশ্বঘোষ এবং মাতৃচেট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলে মত প্রকাশ করেছেন।

রাহুল সাংকৃত্যায়নও অশ্বঘোষকে ব্রাহ্মণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করেন নি।[২৮]

উপরে বর্ণিত তথ্য ছাড়া অশ্বঘোষের জন্ম ও বংশ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। সাধারণত গ্রন্থে লেখক পরিচিতি অংশটি গ্রন্থ রচনাকালে বা প্রকাশকালে রচিত বা সংযোজিত হয়। এ কারণে লেখক পরিচিতি অংশের তথ্য সত্যস্পর্শী বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। ফলে *সৌন্দরনন্দ* কাব্যের কবিকথা অংশে বা Colophon-এ বর্ণিত তথ্য তথা অশ্বঘোষের জন্মস্থান 'সাকেত' এবং মাতার নাম ছিল 'সুবর্ণাক্ষী' তা সঠিক বলে গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া, *বুদ্ধচরিত* কাব্যের তিব্বতি অনুবাদের Colophon-এবং অন্যান্য চৈনিক উৎসেও এই তথ্যটি পাওয়া যায়। অধিকন্তু এ বিষয়ে গবেষকদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য নেই।

কিন্তু 'সাকেত' ছিল প্রাচীন ভারতের একটি স্থানের নাম, এ নামে বতর্মানে কোনো স্থান নেই। ফলে স্থানটি বর্তমান ভৌগোলিক সংস্থান নির্ণয় করা আবশ্যক। পালি সাহিত্য[২৯] সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধের সময় প্রাচীন ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বা রাজ্য ছিল কোসল, যা সরয়ূ নদী দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত ছিল : উত্তর কোসল এবং দক্ষিণ কোসল। পালি সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, কোসল রাজ্যের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী । 'সাকেত' শ্রাবস্তী হতে ৬ লিগ দূরে অবস্থিত ছিল।[৩০] শ্রাবস্তীর পরে সাকেতই ছিল কোসল রাজ্যের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নগরী। মহাভারত সাক্ষ্য দেয়, কোসলের প্রথম রাজধানী ছিল

Dhaka University Institutional Repository

'অযোধ্যা। তৎপর ছিল সাকেত। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম 'সাহেত-মাহেত' যা বর্তমান ভারতের গোণ্ডা জেলায় অবস্থিত। ফলে বলা যায় যে, অশ্বঘোষের জন্মস্থান 'সাকেত' বর্তমান ভারতের গোণ্ডা জেলায় বা অযোধ্যা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

এখন অশ্বঘোষের বংশ পরিচয় সমীক্ষা করবো। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে প্রত্যক্ষভাবে এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু *সৌন্দরনন্দ* কাব্যে একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উক্ত কাব্যে অশ্বঘোষের মাতাকে 'আর্য সুবর্ণাক্ষী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। 'আর্য' শব্দটি কুলীন, ব্রাহ্মণ বা সদ্বংশ প্রভৃতি নির্দেশ করে।[৩১] ফলে এর থেকে প্রতীতি জন্মে যে, অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ ধারণাটি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের তথ্য পর্যালোচনায়ও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যে *বেদ*, *পুরাণ*, *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *সাংখ্য দর্শন*, *কামশাস্ত্র* প্রভৃতি হতে বহু উদাহরণ ও উপমা প্রয়োগ করতে দেখা যায়, যা ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে। বিশেষ করে, বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের ৪৩ সংখ্যক গাথায় অশ্বঘোষ বাল্মীকিকে 'আদিকবি' হিসেবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন; চতুর্থ সর্গের ৭৪ সংখ্যক গাথায় ঋগ্বেদের 'মমতার' চরিত্রের উপমা প্রদান করেছেন; সপ্তম সর্গের ২০ সংখ্যক গাথায় উপনিষদের বাণী এবং অষ্টম সর্গের ৮১ সংখ্যক গাথায় *রামায়ণের* দশরথের কথা বলেছেন; দ্বাদশ সর্গে ২২ এবং ২৩ সংখ্যক গাথায় *মহাভারতের* বনাগমনে উদ্যত যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করে সাংখ্য ও যোগদর্শন কুশল শৌণক এর উক্তির প্রতিধ্বণি করেছেন। তাছাড়া, চতুর্থ সর্গে নারীর কলা-কৌশলের ও শরীরের বিস্ময়কর বর্ণনা পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় পারদর্শিতা না থাকলে তা সম্ভব হতো না। এ প্রসঙ্গে শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য:

"বুদ্ধচরিত পড়লে বিস্মিত হতে হয় কবির জ্ঞানভাণ্ডার দেখে। তাঁকে বুঝতে হলে বেদ খুলতে হয়, রামায়ণ-মহাভারতের তো কথাই নেই। পুরাণ, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্য-দর্শন, কামশাস্ত্র, বিবিধছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কারে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ।"[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

এম. উন্টারনীট্স (M. Winternitz) বলেন, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম সমীক্ষার আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পূর্ব তিনি ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।'[৩৩]

সার্লা খোসলার (Sarla Khosla) নিম্নোক্ত অভিমতও অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে সাক্ষ্য দেয় :

"Asvaghosa's intimate knowledge of the four Vedas, six treatises on Vedanga, Epics, and Darsana all clearly indicate that he had enjoyed throughly Brahmanical education before his conversion to Buddhism. He was also well-versed in Grammar. His works are a testimony to these fatcs." [৩৪]

উপরের তথ্য পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, যা তিনি যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন তা প্রমাণ করে। কিন্তু তিনি কোথায় এবং কাঁর নিকট ব্রাহ্মণ্যবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন সে বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

৪. নামকরণ

অশ্বঘোষ কি পিতৃ প্রদত্ত নাম নাকি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পর প্রদত্ত নাম - এ বিষয়ে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোল্গা থেকে গঙ্গা*[৩৫] গ্রন্থে অশ্বঘোষ ও প্রভার প্রেম কাহিনির এক চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। সে বিবরণ পড়লে মনে হয়, অশ্বঘোষ নামটি তাঁর পিতা-মাতা কর্তৃক প্রদত্ত ছিল। কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়ন কোন উৎসের আলোকে সে কাহিনি বর্ণনা করেছেন তা জানা যায় না। কুমারজীব অনূদিত চৈনিক ভাষায় অশ্বঘোষর যে জীবনী পাওয়া যায় তাতে উল্লেখ আছে, তাঁর ধর্মদেশনা অশ্বও বুঝতে পারতেন বলে তাঁকে অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়।[৩৬] থমাস ওয়াট্টার্স তাঁর On Yuan Chwang's Travels in

Dhaka University Institutional Repository

India গ্রন্থে চৈনিক উৎসের উদ্ধৃতি দিয়ে অশ্বঘোষের নামকরণ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য দিয়েছেন যা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

" তাঁর জন্মের সময় ঘোড়ার হ্রেষা ধ্বনি করেছিল বিধায় তাঁর নাম রাখা হয় অশ্বঘোষ। অথবা একদা তিনি ধর্ম দেশনা করার সময় এক ক্ষুধার্ত ঘোড়া খাবার কথা ভুলে যায় এবং ধর্ম দেশনা শুনে আনন্দ সহকারে হ্রেষা ধ্বনি দিতে থাকেন, তাই তাঁকে অশ্বঘোষ বলা হতো। আরো প্রচলিত আছে যে, বীণা বাজিয়ে তিনি ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, তাই তাঁকে অশ্বঘোষ নামে অভিহিত করা হয়।"[৩৭]

চৈনিক উৎসে অশ্বঘোষকে পুণ্যাদিত্য (কুং-তে-জিহ) এবং পুণ্যশ্রী (কুং-চাং) প্রভৃতি নামেও সম্বোদিত করা হয়েছে। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথ অশ্বঘোষের আরো আটটি উপাধির উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো : কাল, দূরদর্শ, মাতৃচেট, পিতৃচেট, শূর, ধার্মিক সুভূতি, মতিচিত্র।[৩৮]

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে এসব তথ্য উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে উপরোক্ত তথ্য কতটুকু ইতিহাস সম্মত তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে হিউয়েন সাং অশ্বঘোষের প্রকৃত নাম অজানা বলে মত দিয়েছেন।[৩৯]

৫. অশ্বঘোষের বাল্য ও যৌবনকাল

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে এবং তিব্বতি-চৈনিক উৎসে অশ্বঘোষের বাল্যকাল ও যৌবনকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোল্গা থেকে গঙ্গা* গ্রন্থে অশ্বঘোষের যৌবনকালের কিছু ধারণা পাওয়া যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বর্ণিত কাহিনির সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো[৪০] :

একদা সাকেতের সরযূ নদীতে বসন্ত-উৎসব পালনকালে সাঁতার প্রতিযোগিতার অয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় বহু নর-নারী অংশ গ্রহণ করে। তন্মধ্যে বহুসংখ্যক যবনী, বৈশ্য তরুণী এবং ব্রাহ্মণকুমারীও অংশ গ্রহণ করেন। তরুণ-তরুণীদের সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য এই উৎসব

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হতো এবং এই উৎসবে অনেকেই স্বয়ম্বরা হয়ে উঠতো। এই প্রতিযোগিতায় অশ্বঘোষ এবং বৈশ্য তরুণী প্রভা যুগ্মভাবে বিজয়ী হয়েছিল।

রাজা পুষ্যমিত্রের শাসনের স্মারক হিসেবে সাকেতে এক পুষ্পোদ্যান ছিল। এক অপরাহ্নে সেই পুষ্পোদ্যানের লতাগুল্মের কাছে অশ্বঘোষ বীণা বাজিয়ে সংস্কৃত ভাষায় স্বরচিত গান পরিবেশন করছিলেন। তাঁর দেহে ছিল মসৃন কাপড়ের পোশাক, দীর্ঘ পিঙ্গল কেশরাশি মাথায় জটার আকারে বাধা। তাঁর চারিদিকে তরুণ-তরুণীর ভিড়। সংস্কৃত ভাষায় গান পরিবেশনের পর প্রাকৃত ভাষায় স্বরচিত 'উর্বশী-বিয়োগ' পরিবেশন করে শোনাল। গান শেষে একজন তরুণ এগিয়ে এসে বলল, "মহাকবি!"। তৎপর তরুণ-তরুণীরা তাঁকে সাকেতের নাট্যশালার মঞ্চে এক বিয়োগান্ত নাটক উপভোগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। অশ্বঘোষ নাট্যশালায় উপস্থিত হন। নাটকে অশ্বঘোষের সঙ্গে যুগ্মভাবে বিজয়ী হওয়া 'প্রভা' নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছিল। অশ্বঘোষ প্রভার অভিনয় কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। অভিনয়ের মাঝে বিরতির সময় পূর্বপরিচিত যুবক অশ্বঘোষকে 'উর্বশী-বিয়োগ' গানের অনুরোধ জানাল। তিনি কোনো রকম আপত্তি না করে বীণা হাতে রঙ্গমঞ্চে স্বরচিত গানের গভীরতায় নিজেও কাঁদলেন এবং অপরকেও কাঁদাল।

পরবর্তীতে তিনি যবন-তরুণ বুদ্ধপ্রিয়ের সঙ্গে কয়েকটি যবন নাটকের প্রাকৃত রূপান্তর পড়লেন। রচনা করলেন 'উর্বশী-বিয়োগ' নাটক। রঙ্গমঞ্চ তৈরির সময়, অভিনয় অভ্যাসকালে খাওয়া-দাওয়ার কথাও মনে থাকত না তরুণ কবির। এই সময়গুলো তিনি জীবনের সুন্দরতম সময় বলে মনে করতেন। 'উর্বশী-বিয়োগ' একাধিকবার অতি চমৎকারভাবে অভিনীত হলো। সাকেতের সমস্ত সম্ভ্রান্ত নর-নারী এই নাটকের অভিনয় দেখল। এর আগে তারা কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যে, নাট্যকলা এত পূর্ণ, অভিনয় এত উচ্চশ্রেণির হতে পারে। শেষ দৃশ্যে যবনিকা পতনের পর কয়েকবার অশ্বঘোষ মঞ্চে উঠে বলেছেন, আমি এই নাটকের সবকিছুই যবন রঙ্গমঞ্চ থেকে সংগ্রহ করেছি; কিন্তু তাঁর নাটক এতটা

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশী প্রভাবাপন্ন যে, কেউই তার কোনোখানে বিদেশীয়ানার এতটুকুও গন্ধ পায়নি। রঙ্গমঞ্চেই অশ্বঘোষ প্রভার সঙ্গে প্রেমে জড়িয়ে পড়েন।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন উপরোক্ত তথ্য কোন্ উৎস থেকে সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করেননি। তাছাড়া, অন্য কোনো উৎসে অশ্বঘোষের বাল্য জীবন ও যৌবনকাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে রাহুল সাংকৃত্যায়নের বর্ণিত তথ্য কতটুকু ইতিহাসস্পর্শী তা নির্ণয় করা দুষ্কর।

৬. বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে তাঁর বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু বিভিন্ন ঐতিহ্যে অশ্বঘোষের দীক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। এই অনুচ্ছেদে বিভিন্ন ঐতিহ্যে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক অশ্বঘোষ কেন এবং কাঁর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন তা স্পষ্ট করা হবে। চৈনিক ভাষায় কুমারজীব অনূদিত অশ্বঘোষের যে জীবনী পাওয়া যায় তাতে অশ্বঘোষের দীক্ষা সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। তাই প্রথমে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে [৪১] :

একদা থের পার্শ্ব গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে চিন্তা করছিলেন, ভবিষ্যতে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম এরূপ ব্যক্তি এই পৃথিবীতে কে আছেন? তখন তিনি দিব্য দৃষ্টিতে মধ্য ভারতের অশ্বঘোষ নামক এক তীর্থিককে দেখতে পেলেন, যিনি পার্থিব জ্ঞানে ঋদ্ধ, বিতর্ক এবং যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। থের পার্শ্ব উত্তর ভারত হতে মধ্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন এবং আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তিনি মধ্য ভারতে পৌঁছলেন। পৌঁছে তিনি ভিক্ষুদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কেন ধর্মের নিয়ম অনুসারে ঘণ্টা বাজাচ্ছেন না?" ভিক্ষুগণ উত্তরে বললেন, "থের ! ঘণ্টা না বাজানোর কারণ আছে।" থের পার্শ্ব কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভিক্ষুগণ উত্তরে বললেন, "এখানে একজন তীর্থিক আছেন, যিনি বিতর্কে অত্যন্ত পারদর্শী। তিনি ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে অক্ষম কোনো বৌদ্ধ ভিক্ষু দানীয়বস্তু গ্রহণের জন্য এই ঘণ্টা বাজাতে পারবেন না।" থের পার্শ্ব ভিক্ষুদের

Dhaka University Institutional Repository

বললেন, "ঘণ্টা বাজান। তিনি আসলে আমি বিষয়টি দেখব।" এরূপ শুনে ভিক্ষুগণ বিস্মিত এবং দ্বিধাগ্রস্থ হলেন। অবশেষে ভিক্ষুগণ একত্রিত হয়ে ঘণ্টা বাজানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ঘণ্টা বাজান। ঘণ্টার আওয়াজ শুনে তীর্থিক উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুদের ঘণ্টা বাজানোর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ভিক্ষুগণ বললেন, "আমরা ঘণ্টা বাজাইনি। উত্তর হতে একজন থের এসেছেন তিনি ঘণ্টা বাজিয়েছেন।" তীর্থিক তাঁকে নিয়ে আসার জন্য বললেন। তিনি আসলে তীর্থিক বললেন, "আপনি কি আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হতে চান?" থের পার্শ্ব 'হ্যাঁ' সূচক সম্মতি দিলে সম্মতির প্রদানের সপ্তম দিবসে মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করা হয়। ষষ্ঠতম দিবসে থের পার্শ্ব গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন এবং করণীয় সম্পর্কে চিন্তা করলেন। সপ্তম দিবসে পার্শ্ব সম্মেলন স্থলে হাসি-খুশী মনে উপস্থিত হন এবং সর্বোত্তম আসনটি গ্রহণ করেন। তীর্থিক পার্শ্ব থেরর পরে উপস্থিত হয়ে মুখামুখি আসন গ্রহণ করেন এবং পার্শ্ব থেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, "শান্ত হাস্যোজ্জ্বল এবং বিতার্কিকের বৈশিষ্টসম্পন্ন সুদর্শন চেহারার এই ভিক্ষু সাধারণ কোনো ভিক্ষু নন। আজকে আনন্দময়, সারময় এবং জাঁকজমকপূর্ণ বিতর্ক হবে।" দু'জনের মধ্যে প্রথমে পরাজিত ব্যক্তির শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা হলো। তীর্থিক বললেন, 'পরাজিত ব্যক্তির জিহ্বা কেটে নেয়া হবে।' উত্তরে পার্শ্ব থের বললেন, 'আমরা তা করতে পারি না। বরং পরাজিত ব্যক্তি বিজয়ীর ধর্ম গ্রহণ করাই হবে উত্তম সিদ্ধান্ত।" তীর্থিক রাজী হলেন এবং পার্শ্ব থেরকে 'প্রথমে কে প্রশ্ন করবেন' জিজ্ঞাসা করলে পার্শ্ব থের বললেন, 'যেহেতু আমি বয়স্ক সেহেতু আমিই প্রথম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব।' তীর্থিক রাজী হলে পার্শ্ব থের বলেন, "আমরা অবশ্যই দেশকে শান্তিময় করব, মহান রাজা দীর্ঘজীবন লাভ করেন এবং কোনো দুর্যোগ ব্যতীত দেশ সমৃদ্ধ ও সুখী হয়।"

পার্শ্ব থেরর কথার উত্তরে কী বলতে হবে বুঝতে না পেরে তীর্থিক নীরব রইলেন। নিয়মানুসারে যিনি উত্তর দিতে পারেন না তাঁর পরাজয় ঘটে। অতপর, তীর্থিক পার্শ্ব থেরর শিষ্যত্ব এবং ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করলেন।

একদিন তীর্থিক একা বসে ভাবছিলেন, 'আমার অসাধারণ মেধা এবং প্রজ্ঞা আমাকে বিশ্বব্যাপী যশ-খ্যাতি দিয়েছে। সামান্য কথায় কীভাবে পরাজিত হয়ে আমি শিষ্যত্ব বরণ করলাম?' এরূপ ভেবে তিনি অসুখী হলেন। পার্শ্ব থের তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন এবং ঘরে ডেকে নিয়ে ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। ঋদ্ধি দর্শন করে তিনি (তীর্থিক) উপলব্ধি করলেন তাঁর শিক্ষক সাধারণ ব্যক্তি নন এবং তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে সুখী মনে ভাবলেন, 'তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করে আমি অনেক উপকৃত হবো।'

উপরোক্ত দীক্ষা কাহিনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অন্যান্য খ্যাতিমান প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক ও সাহিত্যিকের দীক্ষা কাহিনির সঙ্গে অশ্বঘোষের দীক্ষা কাহিনির প্রায় মিল রয়েছে। বলা যায়, প্রাচীনকালের সকল বৌদ্ধ কীর্তিমানদের দীক্ষা কাহিনি একই কায়দায় (প্যার্টান) রচিত। যেমন, তাঁরা প্রথমে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, ব্রাহ্মণ্য-বিদ্যায় পারদর্শিতার অর্জন করেন এবং বিতর্ক করে প্রভূত যশ-খ্যাতির অধিকারী হন। তৎপর বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিকট বিতর্কে পরাজিত হয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, বুদ্ধঘোষ, ধর্মকীতি প্রমুখ কীর্তিমানদের দীক্ষা কাহিনিতেও একই রচনাশৈলী অনুসৃত হয়েছে।[৪২]

থমাস ওয়াট্টার্স হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, চৈনিক উৎসে অশ্বঘোষের দীক্ষাগুরু হিসেবে দু'জনের নামোল্লেখ আছে। তাঁর মতে, দীক্ষা গুরু হিসেবে চৈনিক ঐতিহ্য Fu-fa-tsang-yiu-yuan এর পঞ্চম অধ্যায়ে পূণ্যযশ এবং Ma-ming-p'u-sa-chuan (No. 1460) এ পার্শ্ব এর নামোল্লেখ আছে। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, Ma-ming-p'u-sa-chuan (No. 1460) এ বর্ণিত আছে যে, অশ্বঘোষ বিতর্কে পার্শ্বের নিকট পরাজিত হয়ে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তিব্বতি ঐতিহ্য মতে, অশ্বঘোষ পার্শ্বের শিষ্য পূণ্যযশের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৪৩]

রাহুল সাংকৃত্যায়ন *ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা*[৪৪] গ্রন্থে ভিন্ন আঙ্গিকের অশ্বঘোষের এক চমকপদ দীক্ষা কাহিনি বর্ণনা করেছেন। উক্ত দীক্ষাকাহিনি সংক্ষেপে সহজ ভাষায় নিম্নরূপ :

অশ্বঘোষ ছিলেন ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। রঙ্গেমঞ্চে অভিনয় করার সময় তিনি বৈশ্য তরুণী প্রভার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। অশ্বঘোষ পিতা-মাতার নিকট প্রভাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। মাতা কিছুটা নমনীয় হলেও পিতা কুল ধর্ম রক্ষার জন্য উক্ত প্রস্তাবে রাজী হননি এবং কঠোর বিরোধিতা করেন। অশ্বঘোষের পিতা রাজী না হলে প্রভা সরযূ নদীতে জীবন বিসর্জন দেন। ইতঃপূর্বে মাও মৃত্যুবরণ করেন। শোকে মূহ্যমান অশ্বঘোষ ভিক্ষু ধর্মরক্ষিতের নিকট গেলেন এবং ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। ধর্মরক্ষিত তাঁকে পিতা-মাতার অনুমতি আনতে বললেন। বাড়ি গিয়ে তিনি পিতার কাছে অনুমতি চাইলেন। পিতা রাজী না হলে, অশ্বঘোষ পিতাকে বললেন, "মা আর প্রভার শোকে অস্থির হয়ে আমি ওপথ গ্রহণ করতে যাচ্ছি না। নিজের জীবনে আমি যে কর্মধারা গ্রহণ করেছি, এটাই তার রাস্তা। তুমি দেখছ না আমার কণ্ঠস্বরে, আমার আচরণে কোথাও চিত্তবিকারের এতটুকু লক্ষণ নেই। আমি আর একটি কথাই শুধু বলব, যদি আমাকে জীবিত দেখতে চাও তবে সম্মতি দাও পিতা।" অতঃপর, চোখের জলে ভেসে অশ্বঘোষকে ভিক্ষু হবার সম্মতি দিলেন তিনি। সাকেতের আর্য সর্বাস্তিবাদ সংঘ অশ্বঘোষকে ভিক্ষুরূপে গ্রহণ করলেন। মহাস্থবির ধর্মসেন হলেন অশ্বঘোষের উপাধ্যায় এবং ভদন্ত ধর্মরক্ষিত হলেন তাঁর আচার্য।

উপরোক্ত তথ্য রাহুল সাংকৃত্যায়ন কোথা হতে পেয়েছেন তা উল্লেখ করেননি। ফলে এ বিষয়ে মন্তব্য করা কঠিন। স্যামুয়েল বিল[৪৫] (Samuel Beal) অভিমত পোষণ করেছেন যে, মহাযানীদের মতে অশ্বঘোষ আর্যদেবের শিষ্য ছিলেন।

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে দীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ না থাকায় তিনি কার নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। তবে সকল ঐতিহ্য একমত যে, তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। প্রাচীন ঐতিহ্য বিবেচনায় ধারণা করা যায় যে, তিনি পার্শ্ব বা তাঁর শিষ্য পূণ্যযশের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। কারণ প্রাচীন চৈনিক ঐতিহ্যে অশ্বঘোষকে পার্শ্ব ও পূণ্যযশের পরে, নাগার্জুন ও আর্যদেবের আগে স্থান দেওয়া হয়েছে।

৭. নিকায় (Sect)

বৌদ্ধসংঘ নানা নিকায়ে বিভক্ত। অশ্বঘোষ কোন নিকায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা তাঁর সাহিত্যকর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তবে পণ্ডিতগণ তাঁর সাহিত্যকর্ম ও জীবনী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করে তাঁর নিকায় নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। ফলে গবেষকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে মহাযানের উদ্ভব এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যদিও উদ্ভবকাল অস্পষ্ট। অশ্বঘোষ এমন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন যখন বৌদ্ধধর্ম হীনযান থেকে মহাযানে বিবর্তিত হচ্ছিল এবং অশ্বঘোষ এই বিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। চৈনিক ভাষায় পরমার্থ কর্তৃক অনূদিত অশ্বঘোষের জীবনীতে উল্লেখ আছে যে, অশ্বঘোষের শিক্ষা গুরু কাত্যায়নীপুত্র ছিলেন সর্বস্তাবাদী। কণিষ্কের আমলে অনুষ্ঠিত সঙ্গীতিতে অশ্বঘোষ সর্বাস্তিবাদী গ্রন্থ মহাবিভাষাশাস্ত্র রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।[৪৬] তিব্বতি ঐতিহ্য মতে, অশ্বঘোষের দীক্ষাগুরু পূণ্যযশ ছিলেন সর্বাস্তিবাদী নিকায় ভুক্ত। এ কারণে অশ্বঘোষও সর্বাস্তীবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়ে থাকে।[৪৭] অপর মহাযানী ঐতিহ্য মতে, অশ্বঘোষের দীক্ষাগুরু আর্যদেব ছিলেন যোগাচারবাদী। ফলে অশ্বঘোষকে যোগাচারবাদী হিসেবেও গণ্য করা হয়। সিলভ্যা লেভী (Selvian Levi) এর মতে, অশ্বঘোষের যে তিনজন ধর্মগুরুর উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা সকলে সর্বাস্তিবাদী ছিলেন। অশ্বঘোষও সেই নিকায়ের অনুসারী হয়ে থাকবেন।[৪৮] এ. ই. এইচ. জনস্টন[৪৯] অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যের তথ্য পর্যালোচনা করে বলেন, সর্বাস্তিবাদের গুরুত্বপূর্ণ চারটি বিষয় অনিত্য, দুঃখ, শূন্য এবং নিরাত্মা সৌন্দরনন্দ কাব্যে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বহুশ্রুতিক নিকায়ের বহু তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত অনিত্য, দুঃখ, শূন্য, অনাত্মা এবং শান্ত (নির্বাণ)। কৌকুলিক নিকায়ে বীর্য সাধনার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। সৌন্দরানন্দ কাব্যের ১৬ তম অধ্যায়ে বীর্য সাধনার গুরুত্ব দৃষ্ট হয়। এ যুক্তি প্রদর্শন করে ই. এইচ. জনস্টন অশ্বঘোষ কৌকুলিক নিকায় ভুক্ত ছিলেন বলে মনে করেন। ল বল্লি পৌস্‌সিন (La Vallee Poussin)[৫০] এর মতে, মহাসাঙ্ঘিক নিকায়ের অধিভুক্ত

বহুশ্রুতিকরা মহাদেবের পাঁচটি বিষয় গ্রহণ করেছেন, যা অশ্বঘোষের *সৌন্দরনন্দকাব্যে* পাওয়া যায়। এ কারণে তিনি অশ্বঘোষ বহুশ্রুতিক নিকায়ের অনুসারী ছিলেন বলে দাবী করেন।

অশ্বঘোষ মূলত কবি। কবির লেখায় নানা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং দর্শনের কথা থাকতে পারে। তা দিয়ে কবির পরিচয় নির্ধারণ করা যথার্থ নয়। অশ্বঘোষের দু'টি প্রধান গ্রন্থ *বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ* কাব্যে মূলত হীনযানী ভাবধারায় রচিত। তবে তাতে ভক্তিবাদও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তা ব্যাপকভাবে নয়। তাছাড়া, অশ্বঘোষের সময়কালে মহাযানী ভাবধারা ব্যাপকভাবে বিকশিত হয়নি। অধিকন্তু অশ্বঘোষের দীক্ষাগুরু পার্শ্ব এবং পূণ্যযশ সর্বাস্তিবাদী ছিলেন বলে ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয়। অতএব, বলা যায় অশ্বঘোষ সর্বাস্তিবাদ নিকায়ের অনুসারী ছিলেন।

৮. দীক্ষা-উত্তর জীবন

অশ্বঘোষের দীক্ষা-উত্তর জীবনও অস্পষ্ট এবং এ বিষয়ে তাঁর সাহিত্যকর্মে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহ্যে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে পর্যালোচনার জন্য বিভিন্ন ঐতিহ্যের আলোকে প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

চৈনিক ভাষায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কুমারজীব অনূদিত অশ্বঘোষের জীবন চরিতে[৫১] তাঁর দীক্ষা-উত্তর জীবন সর্ম্পকে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় :

দীক্ষার পর অশ্বঘোষ তাঁর গুরুর ঋদ্ধিশক্তি ও প্রজ্ঞার প্রশংসা করলে তিনি অশ্বঘোষকে বলেন, "তোমার পক্ষে এরূপ প্রজ্ঞা আয়ত্ব করা সম্ভব নয়, যদি তুমি আমি যে ধর্ম শিক্ষা করেছি তা শিক্ষা না কর। তুমি যদি পঞ্চেন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ এবং বৌদ্ধ তত্ত্বসমূহ ভালোভাবে অধ্যয়ন ও হৃদয়াঙ্গম করতে পারো তাহলেই তুমি সর্বলোকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে।"

এরূপ বলার পর পার্শ্ব থের তাঁর নিজ দেশে চলে যান। অশ্বঘোষ মধ্যভারতে অবস্থান করে সকল বৌদ্ধ সূত্রে আয়ত্ব করেন এবং বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিতর্কে

অতুলনীয় যুক্তি প্রদর্শন এবং অপরিসীম প্রজ্ঞার কারণে তিনি ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা - এই চারি গ্রুপের নিকট পূজিত হতেন এবং শ্রদ্ধা লাভ করতেন। বিতর্কে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কারণে ভারতবর্ষের রাজাগণও তাঁকে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন।

উক্ত জীবনীতে আরো উল্লেখ আছে যে, মগধরাজ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র এবং অশ্বঘোষকে অতি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি উত্তর ভারতে সর্ব প্রাণীর মঙ্গলের জন্য বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও শিক্ষা দান করতেন। তাঁর ধর্ম দেশনা শুনে উত্তর ভারতের প্রত্যেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, তিনি এক অসাধারণ মানুষ।

চৈনিক ভাষায় খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে পরমার্থ অনূদিত বসুবন্ধুর জীবনীতে[৫২] অশ্বঘোষের দীক্ষা-উত্তর জীবন সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় :

সম্রাট কণিষ্কের আমলে কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত মহাসঙ্গীতিতে মহাবিভাষাশাস্ত্র রচনার নিমিত্ত অর্হৎ কাত্যায়নীপুত্র শ্রাবস্তী হতে বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষকে আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করেন। তাঁর আহ্বানে অশ্বঘোষ কাশ্মীর উপস্থিত হন। অতঃপর, কাত্যায়নীপুত্র অশ্বঘোষসহ সঙ্গীতিতে যোগদানকারী সকল অর্হৎ এবং বোধিসত্ত্বগণের নিকট অভিধর্ম বিষয়ে সংকলিত আটটি গ্রন্থ ক্রমান্বয়ে পাঠ করে শুনান। উপস্থিত অর্হৎ এবং বোধিসত্ত্বগণ তা সুক্ষ্মভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং বর্ণিত তথ্যের সঠিক অর্থ নির্ধারণ করেন। অর্থ নির্ধারিত হলে অশ্বঘোষ তা লিখে রাখেন। এভাবে সম্পূর্ণ বিভাষাশাস্ত্র রচনা করতে ১২ বছর সময় লেগেছিল, যাতে দশ লক্ষ গাথা ছিল।

তিব্বতি[৫৩] ঐতিহ্য মতে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর অশ্বঘোষ কেবল ধর্মপ্রচারক হিসেবে নয়, কবি এবং সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে কুসুমপুর নামক স্থানে (বর্তমান পাটনা) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন।

এস. বিল এর Buddhsit Literature in China শিরোনাম শীর্ষক গ্রন্থে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়:

অশ্বঘোষ পার্শ্ব থেরর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি একজন মহান কবি এবং সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন, এর মাধ্যমে তিনি বহু রাজপুত্র এবং ব্যক্তিকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন এবং পরিশেষে তিনি কাশ্মীরে অবস্থান করেন।[৫৪]

রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভোলগা থেকে গঙ্গা[৫৫] গ্রন্থে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায়:

দীক্ষার পর অশ্বঘোষ সাকেত হতে গুরু ধর্মরক্ষিতের সঙ্গে পাটলিপুত্র গমন করেন। সেখানে অশোকারামে দশ বছর অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম-দর্শন ও যবন দর্শন সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। মগধের মহাসংঘের বিদ্বান্‌মণ্ডলীতে অশ্বঘোষের স্থান ছিল অনেক উঁচুতে। এই সময় পশ্চিম শক সম্রাট কণিষ্ক গান্ধারে নিয়ে যাবার জন্য মগধের ভিক্ষুসংঘ থেকে একজন বিদ্বান্ ব্যক্তিকে চেয়ে পাঠাল। সংঘ অশ্বঘোষকে পাঠিয়ে দিল। রাজধানী পুরুষপুরে গিয়ে অশ্বঘোষ দেখেন, সেখানে শক, যবন, তুরস্ক, পারশী তথা ভারতীয় সংস্কৃতির একত্র সমাবেশ। যবন নাট্যকলাকে অশ্বঘোষ অনেক আগেই ভারতীয় সাহিত্যে স্থান দিয়েছিল। যবন-দর্শনের গভীর অনুশীলনের পর, তার বহু বিশেষত্ব, বিশ্লেষণ-শৈলী এবং অনুকূল তত্ত্বসমূহকে ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে বৌদ্ধদর্শনকে সে সমৃদ্ধ করে তোলে। বৌদ্ধদের যবন-দর্শন গ্রহণ করবার পথও প্রশস্ত করে দেয় অশ্বঘোষ।

সারলা খোসলা[৫৬] তাঁর Asvaghosa and His Times গ্রন্থে চৈনিক উৎসের আলোকে অশ্বঘোষের দীক্ষা-উত্তর জীবন সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করেছেন :

চৈনিক গ্রন্থ ‘ Fou-fa-Tsang-in-iuen-tch’oen বা শ্রী-ধর্ম-পিটক-সম্প্রদায় নিদান’ মতে অশ্বঘোষ এমন একজন মহান শিল্পী ছিলেন, যিনি তাঁর দর্শন এবং গানে পাটলিপুত্রের ৫০০ রাজপুত্রকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেছিলেন। এতে রাজা ভীত হয়ে সমগ্র রাজ্যে সকল প্রকার গান-বাজনা বন্ধ করার আদেশ প্রদান করেন। অপর চৈনিক উৎসে উল্লেখ আছে যে, অশ্বঘোষ গানকে ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতেন, যা খুবই কার্যকর একটি পদ্ধতি ছিল। তিনি গানের মাধ্যমে সংসার জীবনের অসারত্ব প্রতিপন্ন করতেন। রাষ্ট্রপাল নাটক প্রসঙ্গে চৈনিক উৎসে আরো উল্লেখ আছে

যে, পাটলিপুত্রে এক শিল্পী সমাগমে অশ্বঘোষ ঝাঁঝ-করতাল, ঢাক-ঢোল, বাঁশি এবং গিটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পরিবেশন করেন।

সুমন কান্তি বড়ুয়া[৫৭] অশ্বঘোষের দীক্ষা-উত্তর জীবন সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করেছেন :

উপসম্পদা গ্রহণের পর অশ্বঘোষের জীবনে উন্মোচিত হলো এক নতুন দিক। ধার্মিক জীবন-যাপনের চেয়ে ধর্মের সারার্থকে আত্মস্থ করাই তিনি মূখ্য কাজ বলে মনে করলেন। তাই আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে সাথে অধ্যয়ন তাঁর নিয়মিত কার্যক্রমে অঙ্গীভূত হলো। সাকেতের ''আর্য সর্বাস্থিবাদ সংঘের'' প্রধান বিহার বলাকারামে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে, উচ্চতর বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞান লাভের জন্যে মগধের পাটলিপুত্রের যেতে মনস্থ করলেন। সে সময় পাটলিপুত্রে প্রাকৃত ও পালি ভাষার পরিবর্তে নব সংস্কার প্রাপ্ত 'সংস্কৃত' ভাষারই প্রাধান্য ছিলো বেশি। সে সাথে চলছিলো থেরবাদ (হীনযান) বৌদ্ধ ধর্মদর্শনের চেয়ে মহাযান ধর্মদর্শন চর্চার প্রবল জোয়ার ছিল। শিক্ষানুরাগী অশ্বঘোষ অনুশীলনের বিষয় হিসেবে মহাযান বৌদ্ধধর্ম এবং সংস্কৃত ভাষা এই উভয়টিকেই গ্রহণ করেছিলেন।

মগধে (পাটলিপুত্রে) আসার পর অশ্বঘোষের চৈতন্যে ধর্মেও দর্শনতাত্ত্বিক বিষয়ে জ্ঞানলাভের অভীপ্সা আরো গভীরভাবে রেখাপাত করলো। এ সময় তিনি বৌদ্ধ দর্শন ও সমসাময়িক ভারতীয় দর্শনতাত্ত্বিক বিনয়সমূহকে হৃদয়ঙ্গম করে, পরিবেশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যথাসাধ্য সহজ ভাষায় এবং উপমা ও উৎপ্রেক্ষা যোগে বিশ্লেষণাত্মক সাহিত্য সৃষ্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন। তিনি শুধু গ্রন্থনা ও রচনা নিয়ে স্থবির হয়ে থাকেন নি, আলোচনায়, দেশনায়, বাগ্মীতায়, যুক্তি প্রায়োগিকতায় তাঁর দক্ষতা ও জ্ঞানের গভীরতার স্বাক্ষর রাখলেন। এ সময় অশ্বঘোষের ব্যক্তিত্বেও ব্যাপ্তি ও খ্যাতির প্রসার ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লো। মূলত তাঁর সাহিত্যের জন্যই তাঁর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করেছিলো। এখানে দশ বছর অতিক্রান্ত করার পর তাঁকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে চিরদিনের জন্য চলে যেতে হলো কুশান সাম্রাজ্যে। কুশান সম্রাট কণিষ্ক তাঁকে রাজকবি পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। সাকেত ও পাটলিপুত্রে নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা ও অধ্যয়নের ফলে যে অমিত

জ্ঞান তিনি সঞ্চয় করেছিলেন তা নানাভাবে বিকশিত হয়েছিলো কুশান সাম্রাজ্যে। তিনি বেশির ভাগ গ্রন্থই রচনা করেছিলেন এখানে বসে।

উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অশ্বঘোষের দীক্ষা-উত্তর জীবন সম্পর্কে তথ্যসমূহের মধ্যে মিল-অমিল উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে এ সম্পর্কে নীরব থাকায় ঐতিহ্যের তথ্যসমূহ কতটুকু সত্য স্পর্শী তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার পর অশ্বঘোষ যে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন, প্রচার এবং সাহিত্য চর্চা করেছিলেন তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কারণ, তাঁর রচিত সবগুলো গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ক এবং গ্রন্থগুলো তাঁর দীক্ষার পরে রচিত। বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে তাঁর গভীর প্রজ্ঞা না থাকলে এরূপ গ্রন্থ রচনা সম্ভব হতো না। ফলে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার পর তিনি যে বৌদ্ধধর্ম অধ্যয়ন করেছিলেন এবং গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা অনুমেয়। তাঁর রচিত নাটকের সন্ধানও পাওয়া গেছে। ফলে ধারণা করা যায় যে, তিনি নাট্যজগতের সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন। নাট্যজগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তির দ্বারা গান রচনা ও সুর করা অস্বাভাবিক নয়। এ প্রসঙ্গে টি সুজুকি[৫৮] (T. Suzuki) বলেছেন, চৈনিক উৎসে 'Lai-cha-huo-lo' নামক একটি আধ্যাত্মিক গানের সুরকার হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে। তবে গানটির সংস্কৃত ভার্সন এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বি. সি. ল্য[৫৯] (B. C. Law) গানটির ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা নিম্নরূপ :

" Its classical, mournful and melodious music, we are told, induced the citizens of Pataliputra to ponder on the misery and emptiness of life."

৯. পাণ্ডিত্য ও অভিধা

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি বড় মাপের পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে তিনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তা অস্পষ্ট। নিম্নে প্রথমে বিভিন্ন ঐতিহ্যে অশ্বঘোষের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে যেসেব তথ্য পাওয়া যায় তা তুলে ধরা হবে, তৎপর অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম সমীক্ষায় তার

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থ প্রতিপন্ন করা হবে। চৈনিক ভাষায় অনূদিত অশ্বঘোষের জীবনীতে উল্লেখ আছে যে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার পূর্বে তিনি পার্থিব জ্ঞানে ঋদ্ধ, বিতর্কে বাকপটু এবং যুক্তিতে পারদর্শী ছিলেন। দীক্ষার পর তিনি বৌদ্ধ সূত্রাদি অধ্যয়ন পূর্বক বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ বিদ্যায় পারঙ্গমতা অর্জন করেন। বিতর্কে অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রদর্শনের কারণে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী এবং রাজার নিকট খুবই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।[৬০] চৈনিক ভাষায় অনূদিত বসুবন্ধুর জীবনীতে অশ্বঘোষের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে এরূপ তথ্য পাওয়া যায় : "অশ্বঘোষ অষ্টাঙ্গ ব্যাকরণে, চারি বেদে, ষড় দর্শনে এবং ১৮ নিকায়ের ত্রিপিটকে পারদর্শী ছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম সকল বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল।"[৬১]

এখন চৈনিক ঐতিহ্যের তথ্য অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের আলোকে সমীক্ষা করবো। ইতিপূর্বে ৩নং অনুচ্ছেদের (জন্ম ও বংশ পরিচয়) বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষ *বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদে* সুপণ্ডিত ছিলেন। বেদ এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা বুদ্ধচরিত কাব্যে যথেষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এবং প্রাচীন মুনি-ঋষির কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম জ্ঞানের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ কামশাস্ত্রের সঙ্গেও পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয়। বুদ্ধচরিতে তিনি যোগ পদ্ধতিগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। 'উত্তরমীমাংসা' (বেদান্ত দর্শন) ও বৈশেষিক দর্শন তাঁর জানা ছিল বলে মনে হয়। 'পূর্বমীমাংসা-সূত্রাবলী'র নাম অশ্বঘোষের লেখায় সরাসরি উল্লিখিত না-হলেও, 'বিধি' হিসেবে যা বলা হয়েছে, তা এই দার্শনিক পদ্ধতিরই প্রতিধ্বনি। বর্তমানে 'ন্যায়-সূত্রাবলী' বলতে আমরা যা পাই, অন্ততঃপক্ষে তার প্রথমাংশের সঙ্গে হলেও অশ্বঘোষের পরিচয় ছিল, এ-কথা ভাবার সপক্ষে অনেক যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। বুদ্ধচরিত কাব্যের চতুর্থ সর্গের ২৯ সংখ্যক শ্লোক হতে ৪১ সংখ্যক গাথায় (যা তৃতীয় অধ্যায়ে শৃঙ্গারসের বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে) অশ্বঘোষ নারীর শারীরিক ও কলা-কৌশলের যে বর্ণনা প্রদান করেছেনে তা তাঁর কামশাস্ত্র জ্ঞান প্রকটিত করে। বুদ্ধচরিতে নারীর শারীরিক কলাকৌশলের বর্ণনা পর্যালোচনা করে শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য অশ্বঘোষকে 'রতিপণ্ডিত'[৬২] হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

অভিহিত করেছে। বুদ্ধচরিতের তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ সংখ্যক শ্লোকে অশ্বঘোষ রোগের যে বিবরণ দিয়েছেন তা আয়ুর্বেদ জ্ঞান ব্যতীত সম্ভব নয়। শ্লোকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ততোহব্রবীৎ সারথিরস্য সৌম্য **ধাতুপ্রকোপপ্রভবঃ** প্রবৃদ্ধঃ।

রোগাভিধানঃ সুমহাননর্থঃ শক্তোহপি যেনৈষ কৃতোহস্বতন্ত্রঃ।। বু. চ ৩/৪২

অর্থাৎ, তখন সারথি বললেন, হে সৌম্য, ধাতুর প্রকোপ থেকে উৎপন্ন এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই গুরুতর অনর্থের নাম রোগ, যা শক্তিমান এই ব্যক্তিকেও পরাধীন করেছে।

অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থের জন্মক্ষণ প্রসঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের যে বর্ণনা প্রদান করেছেন তাতে তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গাথাটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ততঃ প্রসন্নশ্চ বভূব **পুষ্যস্তস্যাশ্চ** দেব্যা ব্রতসংকৃতায়াঃ।

পার্শ্বৎ সুতো লোকহিতায় জজ্ঞে নির্বেদনং চৈব নিরাময়ং চ।। বু. চ. ১/৯

অর্থাৎ, তৎপর পুষ্যানক্ষত্র প্রসন্ন হলো; ব্রতশুদ্ধ সেই দেবীর পার্শ্বদেশ থেকে - তাঁর বেদনা বা পীড়া সঞ্চার না করে লোকহিতের জন্য পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন।

তিনি পুনরায় লিখেছেন,

তং ভাসুরং **চাঙ্গিরসাধিদেবং** যথাবদানর্চ তদায়ুষে সঃ।

জুহাব হব্যান্যকৃশে কৃশানৌ দদৌ দ্বিজেভ্যঃ কৃশনং চ গাশ্চ।। বু. চ. ২/৩৬

অর্থাৎ, পুত্রের দীর্ঘায়ুর জন্য তিনি 'আঙ্গিরস' অধিদেবতাযুক্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের অর্চনা করলেন, পরিপুষ্ট অগ্নিতে আহুতি দিলেন এবং ব্রাহ্মণদের মুক্তা ও ধেনু দান করলেন।

অমরকোষ নামক গ্রন্থে নক্ষত্রবাচক শব্দের পূর্বে 'ভ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'ভ' শব্দটি জ্যোতিষশাস্ত্রে বহুল প্রচলিত। ফলে অশ্বঘোষ যে জ্যোতিষশাস্ত্রও অধ্যয়ন করেছিলেন তা ধারণা করা যায়।

অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত কাব্যে বহু দুরূহ ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছেন (বু.চ. ৮/২৫)। তাছাড়া, বিভক্তির প্রয়োগ, প্রত্যয়বাচক পদ ব্যবহার, অব্যয়ের (ব. চ. ২/৪৮) যথাযথ প্রয়োগ, শব্দচয়ন, বাক্যশৈলী এবং ভাব ও ভাষার মিল অশ্বঘোষের ব্যাকরণে পারদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে অশ্বঘোষ যে অব্যয় পদ ব্যবহার করেছেন তা ব্যাকরণে সম্যক জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। শ্লোকটি নিম্নে তুলে ধরা হলো :

পুত্রস্য মে পুত্রগত মমেব স্নেহঃ **কথং** স্যাদিতি জাতহর্ষঃ।

কালে স তং তং বিধিমাললম্বে পুত্রপ্রিয়ঃ স্বর্গমিবারুরুক্ষন্।। (বু. চ. ২/৪৮)

অর্থাৎ, 'সম্ভবত পুত্রবিষয়ে আমার পুত্রেরই আমার মতো স্নেহ হবে' - এই ভেবে পুলকিত সেই পুত্রপ্রিয় রাজা যেন স্বর্গে আরোহণের অভিলাষেই যথাকালে নানা আচারের অনুষ্ঠান করলেন।

ব্যাকরণে অশ্বঘোষের জ্ঞানভাণ্ডার যে সমৃদ্ধ তা ই. এইচ. জনস্টনের (E. H. jonstone) অভিমত হতেও প্রতীয়মান হয়। তাঁর মতে,

" It is worth drawing attention to this kind of thing in order to show how the finer points of Sanskrit grammatical analysis inspired Asvaghhosa to some humourous linguistic games." [৬৩]

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যে বহু ছন্দের ব্যহার করেছেন। বিশেষত তিনি গ্রন্থদ্বয়ে বিপুলা, অনুষ্টুভ্, উপজাতি, বংশস্থ, রুচিরা, বসন্ততিলকা, শরভা, মালিনী, শিখারিনী, কুসুমলতাবেল্লিতা, সুবদনা, বিয়োগিনী বা সুন্দরী, বৈতালীয়, পুষ্পিতাগ্রা, উদগতা প্রভৃতি ছন্দের[৬৪] উল্লেখ পাওয়া যায়, যা অশ্বঘোষের ছন্দবিষয়ক জ্ঞান প্রকটিত করে। তাছাড়া, *বুদ্ধচরিত* ও *সৌন্দরানন্দ* গ্রন্থে যুক্তির যে সমারোহ তা তাঁর যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে।

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দরনন্দ কাব্যের কবিকথা অংশে বা Colophon -এ অশ্বঘোষকে ভিক্ষোরাচার্য, ভদন্ত, মহাকবি মহাবাদী প্রভৃতি অভিধায় ভূষিত করা হয়েছে (যা ইতিপূর্বে ৩নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে)। অর্থাৎ অশ্বঘোষ ভিক্ষু আচার্য, ভদন্ত, মহাকবি, মহাবাগ্মী ছিলেন।

উপরোক্ত তথ্য বিচার-বিশ্লেষণে বলা যায়, অশ্বঘোষের মনোজগত জ্ঞানের নানা শাখায় পূর্ণ ছিল এবং তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

১০. উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার উপসংহার স্বরূপ বলা যায়, অশ্বঘোষ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক হতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের দিকে সাকেত নামক স্থানে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। সাকেত বর্তমান ভারতের গোণ্ডা জেলায় অবস্থিত ছিল। তাঁর মায়ের নাম ছিল সুবর্ণাক্ষী, কিন্তু পিতার নাম এবং বাল্য জীবন অজানা। তিনি অপরিসীম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। পার্থিব জ্ঞানে তাঁর মনোজগত ছিল ঋদ্ধ। *বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্য-দর্শন, কামশাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, ছন্দ-অলঙ্কার* প্রভৃতি বিষয়ে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, শিল্পী এবং বিতার্কিক হিসেবে তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি বিতর্ক করে বেড়াতেন। তিনি পার্শ্ব থের বা পূর্ণযশ থেরর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার পর তিনি বৌদ্ধধর্ম দর্শন অধ্যয়ন করে তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বৌদ্ধধর্ম-দর্শনকে উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তিনি নানা আঙ্গিকের সাহিত্যকর্ম রচনা করেন। তিনি সম্রাট কণিষ্কের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং তাঁর আমলে অনুষ্ঠিত মহাসঙ্গীতিতে সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন পূর্বক মহাবিভাষাশাস্ত্র সংকলন করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ভিক্ষু আচার্য, ভদন্ত, মহাকবি, মহাবাগ্মী প্রভৃতি অভিধা লাভ করেন। তবে মহাকবি হিসেবে তিনি সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. দিলীপ কুমার বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৫২-৫৪, ৫৭, ৫৯, ৬৬, ৮৩।

২. Li Longxi, *'The Life of Asvaghosa Bodhisattva'*, Translated from Sanskrit into Chinese by Kumarajiva, Taisho Volume 50, No. 2046, BDK English Tripitaka 76-III, IV, V, VI, VII, Numata Center for Buddhist Translation and Reserach, California, 2002, p. 12.

৩. সত্যজিত চৌধুরী ও নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৫৫৯।

৪. cf. D. Chattopadhyaya (ed.), *Taranatha's History of Buddhism in India*, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi 1990, p. 391.

৫. Albert A. Dalia, *'Biography of Dharma Master Vasubandhu'*, Translated from Sanskrit into Chinese by Paramartha, Taisho Volume 50, No. 2049, BDK English Tripitaka 76-III, IV, V, VI, VII, Numata Center for Buddhist Translation and Reserach, California, 2002, p. 42.

৬. Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1996, Vol. 1, pp. 270-272.

Dhaka University Institutional Repository

৭. *Taranatha's History of Buddhism in India*, op. cit., p. 93.

৮. Dr. Sumangal Barua, *Buddhist Councils and Development of Buddhism*, Atisha Memorial Publishing Society, Calcutta 1997, pp. 105-117.

৯. J. F. Fleet, 'The Traditional Date of Kanishka',*The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, London, 1906, pp. 979-992.

১০. *'Biography of Dharma Master Vasubandhu'*, op. cit., p. 40.

১১. J. H. Marshall, 'The Date of Kanishka', *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, London, 1915, pp. 192-196.

১২. E. H. Johnston, *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi 1995 (rep.), p. xvii.; রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *ভোল্গা থেকে গঙ্গা*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০৭ (নবম মুদ্রন), পৃ. ১৩২।

১৩. M. Winternitz, *History of Indian Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1991, Vol. II, p. 257.

১৪. *On Yuan Chwang's Travels in India*, op. cit., vol. I., p. 209.

১৫. K. Venkata Ramanan, *Nagarjuna's Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi 1983, p. 27.

Dhaka University Institutional Repository

১৬. Samuel Beal, *Buiddhist Literature in China*, Asian Educational Services, New Delhi, 1999, p. 95.

১৭. প্রসূন বসু (নির্বাহী সম্পাদক), *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, ভূমিকা (শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য), নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১১।

১৮. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৩৮।

১৯. বিমল চন্দ্র দত্ত, *বৌদ্ধ ভারত*, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এণ্ড কালচার, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৪।

২০. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১.

২১. *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬২-৫৬৩।

২২. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৮৫।

২৩. গবেষকদের ধারণা, অশ্বঘোষের মায়ের অক্ষি বা চোখ স্বর্ণোজ্জ্বল ছিল বলে তিনি সুবর্ণাক্ষী নামে পরিচিত হন।

২৪. *The Life of Asvaghosa Bodhisattva*, op. cit., pp. 9-11.

২৫. *Biography of Dharma Master Vasubandhu*, op. cit., p. 42.

২৬. *Buddhist Literature in China*, op. cit., p. 95.

২৭. *Taranatha's History of Buddhism in India*,op. cit., p. 132.

২৮. *ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১।

২৯. T. W. Rhys Davids and I. Estin Carpenter (ed.), *Digha Nikaya*, P.T.S. London, 1962, vol. I., p. 49.

৩০. প্রজ্ঞানন্দ স্থবির (অনু.), *মহাবর্গ*, কলিকাতা, ১৯৩৭, পৃ. ২৩৩।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

৩২. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ২১।

৩৩. *History of Indian Literature*, op. cit., Vol. II, 257.

৩৪. Sarla Khosla, *Asvaghosa and His Times*, Intelectual Publishing House, New Delhi, 1986, p. 4.

৩৫. *ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৩৬. *The Life of Asvaghosa Bodhisattva*, op. cit., pp. 13.

৩৭. *On Yuan Chwang's Travels in India*, op. cit., p. 104; থমাস ওয়াট্টার্স তথ্যগুলো চৈনিক ভাষায় রচিত Fu-fa-tsang-yiu-yuan, Chap. 5 এবং Ma-ming-p'u-sa-chuan (No. 1460) গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করেছেন বলে তথ্যনির্দেশে উল্লেখ করেছেন।

৩৮. *Taranatha's History of Buddhism in India*, op. cit., p. 134.

৩৯. *On Yuan Chwang's Travels in India*, op. cit., p. 104.

৪০. *ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২-১৪১।

৪১. *The Life of Asvaghosa Bodhisattva*, op. cit., pp. 9-11.

৪২. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-১২০।

৪৩. [cf.]T. Suzuki (trans.), *Asvaghosa's Discourses on the Awakening of Faith*, Chicago, 1900, pp. 36.

৪৪. *ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫২।

৪৫. *Buddhist Literature in China*, op. cit., p. 95.

৪৬. *Biography of Dharma Master Vasubandhu*, op. cit., p. 42.

৪৭. *Asvaghosa and His Times*, op. cit. p. 5.

৪৮. cf. *Asvaghosa's Discourses on the Awakening of Faith*, op. cit. p. 37.

৪৯. cf. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op. cit., p. xxxiv.

৫০. ibid.

৫১. *The Life of Asvaghosa Bodhisattva*, op. cit., pp. 11-12.

৫২. *Biography of Dharma Master Vasubandhu*, op. cit., p. 41-43.

৫৩. *Taranatha's History of Buddhism in India*, op. cit., p. 391.

৫৪. *Buddhist Literature in China*, op. cit., p. 97.

৫৫. *ভোল্‌গা থেকে গঙ্গা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২।

৫৬. *Asvaghosa and His Times*,op. cit. p. 6.

৫৭. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪।

৫৮. *Asvaghosa's Discourses on the Awakening of Faith*, গড়. হেট., 0.35.

৫৯. B. C. Law, 'Asvaghosa', *Encyclopedia of Buddhism*, Ceylon, Government Press, 1967, p. 295.

৬০. *The Life of Asvaghosa Bodhisattva*, op. cit., pp. 11-12.

৬১. *Biography of Dharma Master Vasubandhu*, op. cit., p. 42.

৬২. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৬৩. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op. cit., p. lxii.

৬৪. ibid, p. lxiii-lxv.

দ্বিতীয় অধ্যায়

অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ

১. ভূমিকা

বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে বহু গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতিহ্যে বর্ণিত সকল গ্রন্থ পণ্ডিতগণ নির্বিচারে অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করেন। এর কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষযসমূহ চিহ্নিত করা যায় :

ক. অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে ঐতিহ্যে উল্লেখিত অধিকাংশ গ্রন্থেরই মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না।

খ. ঐতিহ্যে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে তিব্বতি ও চৈনিক ভাষায় অনূদিত অধিকাংশ গ্রন্থেরই সংস্কৃত, ইংরেজি বা বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায় না।

গ. অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে দাবীকৃত সাহিত্যকর্মের মধ্যে হীনযানী এবং মহাযানী উভয় ভাবধারার গ্রন্থ রয়েছে।

ঘ. বিষয়বস্তুর এবং সাহিত্যকর্মের ধরণ বা প্রকৃতির মধ্যে যেমন ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি, রচনাশৈলী বিশেষত বিষয়বস্তুর গঠন-বিন্যাস, বাক্য-বিন্যাস, শব্দ চয়ন এবং ভাবগত পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়।

ঙ. অশ্বঘোষ নামে বহু লেখকের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। আবার, অশ্বঘোষের নানা নামও পাওয়া যায়, যা প্রাচীন কালের অনেক প্রখ্যাত লেখকের নামের সঙ্গে মিল রয়েছে। তাছাড়া, অনেক হীন প্রতিভার কবিও নিজের লেখাকে অশ্বঘোষের লেখা বলে প্রচার করে এসেছেন।

চ. অধিকন্তু, অশ্বঘোষের খ্যাতি এতই প্রসার লাভ করেছিল যে, যে কোনো ভালো রচনাকে টীকাকারেরা বা পণ্ডিতেরা অশ্বঘোষের রচনা মনে করতেন। এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে বহু গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

উপরে বর্ণিত কারণে অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। এ অধ্যায়ে পণ্ডিতদের অভিমত এবং ঐতিহ্যে বর্ণিত গ্রন্থসমূহ সমীক্ষাপূর্বক অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা নির্ধারণ করা হবে। কারণ সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান নির্ণয়ের জন্য তাঁর প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ একান্ত আবশ্যক।

২. প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ পদ্ধতি

নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্বক অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ করা হবে।

ক. প্রথমে বিভিন্ন ঐতিহ্য বা উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে দাবীকৃত গ্রন্থগুলো উৎস অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হবে।

খ. দ্বিতীয়ত, যেসব সাহিত্যকর্মের মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এবং লেখক পরিচিতি অংশে অর্থাৎ গ্রন্থের ভূমিকা, প্রসঙ্গকথা, অবতরণিকা বা শেষকথা (Colophon, Epilogue, Prologue) প্রভৃতিতে রচয়িতা হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে সেসব গ্রন্থ অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে গণ্য করা হবে। কারণ, এ অংশটি গ্রন্থ রচনাকালে রচিত বা সংযোজিত, ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমকালীন তথ্য ধারণ করে আছে।

গ. তৃতীয়ত, যেসব গ্রন্থ বিতর্কহীন অর্থাৎ পণ্ডিত বা গবেষকগণ কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত সেসব গ্রন্থও প্রকৃত রচনা হিসেবে গণ্য করা হবে।

ঘ. চতুর্থত, যেসব সাহিত্যকর্মের মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু ভারতীয় একাধিক ভাষায় এবং অন্যান্য বিদেশী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সঙ্গে মিল পাওয়া যাবে সেগুলোও অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

ঙ. রচনাশৈলী, বিষয়-বিন্যাস এবং ভাব বিচারে যেসব সাহিত্যকর্ম অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে সেগুলোও অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে গণ্য করা হবে।

চ. উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন গ্রন্থগুলো অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে গণ্য করা হবে না।

৩. ঐতিহ্য বা উৎস অনুসারে অশ্বঘোষের রচনা তালিকা উপস্থাপন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ঐতিহ্যে বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এই অনুচ্ছেদে উৎস অনুযায়ী সেসব গ্রন্থের তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক) ভারতীয় উৎস[১] **:** ভারতীয় উৎসে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়:

১) বুদ্ধচরিতম্ ২) সৌন্দরনন্দম্ ৩) শারিপুত্রপ্রকরণম্ ৪) রাষ্ট্রপাল ৫) কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ৬) খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর ৭) নাম বিহীন প্রতীকী নাটক[২]

খ) তিব্বতি উৎস[৩] **:** তিব্বতি উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে **১৩**টি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, যা *Taranath's History of Buddhism in India* গ্রন্থের আলোকে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১) শত-পঞ্চশতক-নাম-স্তোত্র ২) গণ্ডি-স্তোত্র-গাথা ৩) মহাকাল-কন্ত্র-রুদ্র-কল্প-মহাশ্মশান-নাম-টীকা ৪) বজ্রযান-মূলাপত্তি-সংগ্রহ ৫) স্থূলাপত্তি ৬) মণিদ্বীপ-মহাকারুণিক-পঞ্চ-দেব-স্তোত্র ৭) গুরু-পঞ্চাশিকা ৮) দশ-অকুশল-কর্ম-পথ-নির্দেশ ৯) শোক-বিনোদন ১০) অষ্টাক্ষণ-কথা ১১) পরিণামসা-সংগ্রহ ১২) বুদ্ধচরিত-নাম-মহাকাব্য ১৩) বজ্র-সত্ত্ব-প্রশ্নোত্তর

তিব্বতি ঐতিহ্যে আর্যশূর বা শূর, অশ্বঘোষ, মাতৃচেট, পিতৃচেট, দুরদর্শ, ধার্মিক সুভূতি, মাতৃচিত্র প্রমুখ অভিন্ন বা একই ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।[৪] এ কারণে তিব্বতি ঐতিহ্যে উপর্যুক্ত ব্যক্তিগণ কর্তৃক রচিত গ্রন্থও কখনো কখনো অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দিতে দেখা যায়।[৫]

গ) চৈনিক উৎস[৬] **:** চৈনিক উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে **১৩**টি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু চৈনিক উৎসে উল্লেখিত গ্রন্থের মধ্যে কিছু গ্রন্থের সংস্কৃত নামোল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সেসব গ্রন্থের চৈনিক নামকরণ উল্লেখ আছে। প্রখ্যাত অশ্বঘোষ গবেষক টি. সুজুকি[৭] (T. Suzuki) সেসব গ্রন্থের চৈনিক নামকরণের ইংরেজি ও সংস্কৃত পাঠোদ্ধার করেছেন। নিম্নে চৈনিক উৎসের আলোকে অশ্বঘোষের রচনাবলী তুলে ধরা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

১) বুদ্ধচরিতকাব্য ২) সূত্রালংকারশাস্ত্র ৩) শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র ৪) বজ্রসূচি ৫) গণ্ডীস্তোত্রগাথা (Chien-ch'-ui-fan-tsan) ৬) ষড়গতিকারিকাহ্ বা Lu-tao-lun-hui-ching [৮] ৭) দশদুষ্টকর্মমার্গসূত্র ৮) মহাযান ভূমিগুহ্যবাচামূলশাস্ত্র ৯) Lai-cha-huo-lo (A song) ১০) Ni-kan-tzu-wen-wi-i-ching (A sutra on a Jaina's asking about the theory of non-ego) ১১) Shi-shih-fa-wu-shin-sung (Fifty verses on the rules of serving a teacher) ১২) Ta-sung-ti-hsuan-wen-pen-lun (A fundamental treatise on the spiritual States fr Reaching final deliverance) ১৩) Shih-pu-shan-yeh-tao-ching (A sutra on the ten no good deeds)

জানা যায় যে, উপরে বর্ণিত গ্রন্থ ছাড়াও অশ্বঘোষ মহাবিভাষাশাস্ত্র[৯] সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। *শারিপুত্রপ্রকরণ* (*শারিপুত্রপ্রকরণম্*) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক (সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১১তম খণ্ডে) রত্না বসু[১০] এবং বিশিষ্ট গবেষক সুমন কান্তি বড়ুয়া[১১] অভিমত পোষণ করেছেন যে, অশ্বঘোষ *খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর* নামক নাট্যগ্রন্থটিও রচনা করেন এবং *উর্বশী বিয়োগ* নামক একটি নাটকও পরিচালনা করেন।

৪. ঐতিহ্যে বর্ণিত অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম সমীক্ষা

এ অনুচ্ছেদে যেসব গ্রন্থের লেখক প্রাসঙ্গিক অংশে (Colophon, Epilogue, Prologue) অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদকর্ম রয়েছে, প্রথমে সেগুলো আলোচনা করা হবে। তৎপর ক্রম অনুসারে কম থেকে বেশি বিতর্কিত গ্রন্থগুলো আলোচানা করা হবে।

৪.১. বুদ্ধচরিত (বুদ্ধচরিতম্)

উপরে বর্ণিত অশ্বঘোষের রচনা তালিকা সমীক্ষা করলে দেখা যায়, তিব্বত, চৈনিক এবং ভারতীয়- তিনটি উৎসেই বুদ্ধচরিতকে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। এটি কাব্য আকারে রচিত। বুদ্ধের

Dhaka University Institutional Repository

মহাজীবন এ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থটির সম্পূর্ণ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি অবিষ্কৃত হয়নি, ১৭টি সর্গ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, যা প্রসূন বসুর সম্পাদনায় ১৯৭৮ সালে কলিকাতার নবপত্র প্রকাশন হতে 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' সিরিজের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আবিষ্কৃত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতে লেখক পরিচিতি তথা রচয়িতার পরিচয় অংশটি পাওয়া যায় নি। তবে বুদ্ধচরিতের যে তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া যায় তাতে কবিকথা অংশে বা Colophon -এ গ্রন্থটি 'সাকেতের সুবর্ণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ রচনা করেন' এরূপ উল্লেখ আছে।[১২] বুদ্ধচরিতের চৈনিক অনুবাদেও গ্রন্থটির লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নাম আছে।[১৩] এছাড়া, প্রাচীন ঐতিহাসিক আকর গ্রন্থে, বিশেষত প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর জীবনী এবং চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিনের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বুদ্ধচরিত সাকেতের অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলে সাক্ষ্য পাওয়া যায়।[১৪] ই. বি, কাওয়েল (E. B. Cowell), ফ্রাইডরিচ্ ওয়েল্লার (Friedrich Weller) এবং ই, এইচ, জনস্টন (E. H. Johnston) গ্রন্থটি পৃথক্ পৃথক্ভাবে সম্পাদনাপূর্বক ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও, গ্রন্থটির Taisho Issaikyo Edition নামে চৈনিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মুনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯৬৩ সালে ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি হতে বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। উপর্যুক্ত অনুবাদকগণ অশ্বঘোষের রচনাশৈলী, ভাষা এবং ভাব বিবেচনায় গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসাবে স্বীকার করেছেন।[১৫] ই. এইচ. জনস্টন শুধু ভাষা, রচনাশৈলী, বিষয় এবং ভাবগত বিচারেই নয়, অক্ষর তত্ত্বের বিচারেও বুদ্ধচরিত গ্রন্থটি অশ্বঘোষের সময়কালে তথা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের রচনা বলে মত প্রকাশ করেছেন।[১৬] সংস্কৃত সাহিত্য গবেষক এ. বি. কীথ (A.B. Keith), এম. উন্টারনীট্স (M. Winternitz), জি. কে. নরিমন (G. K. Nariman) এবং পেট্রিক ওলিভেল্লে (Patrick Olivelle) প্রমুখ পণ্ডিতগণও রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তুর ভাবধারা বিশ্লেষণ করে বুদ্ধচরিতকে অশ্বঘোষের অনবদ্য রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন।[১৭] এস. বিল (S. Beal)[১৮] চৈনিক ভাষায় পারদর্শী এবং চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্যের এক অনন্য গবেষক। চৈনিক ভাষায় অনূদিত বুদ্ধচরিতের বিষয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। তাঁর মতে, বুদ্ধচরিত গ্রন্থটি চৈনিক ভাষায় 'Fo-sho-hing-

Dhaka University Institutional Repository

tasan' শিরোনামে অনুবাদ করা হয়েছে। গ্রন্থটির চৈনিক অনুবাদক Tan-mo-tsich নামক একজন উত্তর ভারতীয় পণ্ডিত কর্তৃক অনূদিত, যিনি ত্রিপিটকে পারদর্শী ছিলেন। অনুবাদক গ্রন্থটি বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেন, চৈনিক ভাষায় বুদ্ধের জীবন চরিত নিয়ে পদ্যে রচিত আরো একটি গ্রন্থ আছে, যা 'Fo-pen-hing-king' নামে পরিচিত। তিনি গ্রন্থটি বুদ্ধচরিতের অপর একটি ভার্সন (verson) বলে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার সিরিজে প্রকাশিত বুদ্ধচরিতের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, দিলীপ কুমার বড়ুয়া, জি. কে. নরিমন এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া বুদ্ধচরিত অবিসংবাদিতভাবে অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলে দাবী করেছেন।[১৯] তাছাড়া, 'বুদ্ধচরিত অশ্বঘোষের রচনা নয়' - এমন কোনো অভিমত পাওয়া যায় না। অশ্বঘোষ সংক্রান্ত সকল গবেষকই গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন। অতএব, *বুদ্ধচরিত* গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করা যায়।

৪.২. সৌন্দরনন্দ (সৌন্দরনন্দম্)

উপরে বর্ণিত অশ্বঘোষের রচনা তালিকা সমীক্ষা করলে দেখা যায়, কেবল ভারতীয় উৎসেই সৌন্দরনন্দ কাব্যকে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হয়েছে। তিব্বত এবং চৈনিক উৎসে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্থান দেওয়া হয়নি। এ গ্রন্থটিও কাব্য আকারে রচিত। বুদ্ধ কর্তৃক সৎ ভাই নন্দকে দীক্ষা দানের বিষয়টি এ গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয়। গ্রন্থটির সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কলিকাতা নবপত্র প্রকাশন হতে প্রসূন বসুর সম্পাদনায় বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে। আবিষ্কৃত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির কবিকথা অংশে বা Colophon -এ গ্রন্থটির রচয়িতা সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে : "আর্যসুবর্ণাক্ষীপুত্র সাকেতস্য ভিক্ষোরাচার্যভদন্তাশ্বঘোষস্য মহাকবের্মহাবাদিনঃ কৃতিরিয়ম্"[২০] অর্থাৎ মহাকবি, মহাবাগ্মী, ভিক্ষু আচার্য, ভদন্ত, সাকেতের সুর্বণাক্ষীপুত্র অশ্বঘোষ এ কাব্য রচনা করেন। সাধারণত গ্রন্থে লেখক পরিচিতি অংশটি গ্রন্থ রচনাকালে বা প্রকাশকালে রচিত বা সংযোজিত হয়। এ কারণে লেখক পরিচিতি অংশের তথ্য সত্যস্পর্শী বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধচরিতের তিব্বতি অনুবাদেও অশ্বঘোষকে সাকেতের সুবর্ণাক্ষীপুত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে *বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ* কাব্য রচয়িতা অশ্বঘোষ যে একই ব্যক্তি তা মেনে নেওয়া যায়। কেবল কবিকথা অংশে বা Colophon-এর দাবীর প্রেক্ষিতেই নয়, ই, এইচ, জনস্টন, এ. বি. কীথ, এম. উন্টারনীট্স, পেট্রিক ওলিভেল্লে, জি. কে. নরিমন এবং শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য প্রমুখ গবেষকগণ রচনাশৈলী, শব্দ চয়ন, ভাব-ভাষা, ছন্দ, অলংকার এবং বিষয়বস্তু প্রভৃতি বিচারেও সৌন্দরনন্দ কাব্যটি অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন, তবে এ. বি,. কীথ সৌন্দরনন্দ কাব্যটি বুদ্ধচরিতের পূর্বে রচিত বলে মনে করেন।[২১] চৈনিক এবং তিব্বতি উৎসে উল্লেখ না থাকলেও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্য এবং রচনাশৈলী বিচারে সৌন্দরনন্দ কাব্যটি পণ্ডিতগণ অশ্বঘোষের অমর সৃষ্টি হিসেবে স্বীকার করেছেন এবং আলোচ্য বিষয়ে কোনো দ্বিমতও পাওয়া যায় না। অতএব, উপর্যুক্ত বিষয় বিবেচনায় সৌন্দরনন্দ কাব্যটিও নিঃসন্দেহে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করা যায়।

৪.৩. শারিপুত্রপ্রকরণ (শারিপুত্রপ্রকরণম্) ও নাম বিহীন প্রতীকী নাটক

একমাত্র ভারতীয় উৎসেই নাটকদ্বয় অশ্বঘোষের রচনা হিসবে উল্লেখ আছে, চৈনিক এবং তিব্বতি উৎসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। নাটকদ্বয়ের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এবং তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায় নি। এইচ. লুডার্স (H. Luders) শারিপুত্রপ্রকরণ এবং প্রতীকী নাটকের তুখারীয় লিপিতে লেখা পুথির খণ্ডাংশ মধ্য এশিয়ার তুরফান অঞ্চল হতে আবিষ্কার করেছে। বর্তমানে নাটকদ্বয় কলিকাতাস্থ নবপত্র প্রকাশন কর্তৃক সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার সিরিজের ১১নং খণ্ডে বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হয়েছে। শারিপুত্রপ্রকরণের কয়েকটি অঙ্ক মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়নের দীক্ষা শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকের মূল আলোচ্য বিষয়। অপরদিকে প্রতীকী নাটকটির কয়েকটি সংলাপ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মানুষের মনোজগতের মনোবৃত্তিগুলো প্রতীকী নাটকটিতে পাত্র-পাত্রী হিসেবে উপস্থাপন করে বৌদ্ধে ধর্ম-দর্শনের নৈতিক শিক্ষা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মানব চরিত্র হিসেবে এ নাটকে একমাত্র বুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে। শারিপুত্রপ্রকরণে লেখক পরিচিতি অংশে

Dhaka University Institutional Repository

(Colophon) রচয়িতা হিসেবে 'সাকেতের অশ্বঘোষ রচিত' এরূপ উল্লেখ আছে। বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যও সাকেতের অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ কারণে বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্রপ্রকরণ - এ তিনটি গ্রন্থ একই লেখক তথা আলোচ্য অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। লেখতত্ত্বের বিচারে এইচ. লুডার্স[২২] শারিপুত্রপ্রকরণ এবং প্রতীকী নাটকের পুথির রচনাকাল কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক বা হুবিষ্কের সমকালীন মনে করেন। নাটকদ্বয় একই সময়ে এবং অভিন্ন লিপিতে লিখিত হওয়ায় নাটকদ্বয়ের লেখকও একই ব্যক্তি বা অশ্বঘোষ বলে ধারণা করা হয়। ই. এইচ. জনস্টন শারিপুত্রপকরণ এবং প্রতীকী নাটকে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যের গাথার স্টাইল বা রচনাশৈলী অনুসৃত হয়েছে বলে অভিমত পোষণ করেছেন। তিনি সামঞ্জস্যপূর্ণ গাথাগুলো উপস্থাপন করে মিল প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, 'শ্লোকগুলোতে শব্দ চয়ন, ভাষা, ছন্দ, অলংকার এবং ভাবাদর্শে এত সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে যে একই লেখক ব্যতীত কোনো সুদক্ষ অনুকরণবিদের পক্ষেও তা সম্ভব নয়।' এ যুক্তিতে ই. এইচ. জনস্টন শারিপুত্রপ্রকরণ এবং প্রতীকী নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। রচনাশৈলী বিচারে এম. উন্টারনীট্স এবং পেট্রিক ওলিভেল্লে শারিপুত্রপ্রকরণ অশ্বঘোষের অনবদ্য রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন।[২৩] প্রতীকী নাটকের আবিষ্কৃত পুথিতে লেখক পরিচিতি অংশটি পাওয়া যায় নি। শারিপুত্রপকরণের ন্যায় এই নাটকের পুথিও তুখারীয় লিপিতে লিখিত হওয়ায় এবং রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু এবং ভাব-ভাষা ও শব্দ চয়নে অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর সঙ্গে মিল থাকায় উভয় গ্রন্থ একই ব্যক্তি তথা অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে রত্না বসুর অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

"লিপির অভিন্নতাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেই গ্রন্থ দু'টির রচয়িতারও অভিন্নতা অনুমান করা হয়েছে। এ ছাড়া বিষয়গত, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও দীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত সাদৃশ্যও এই প্রমাণের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।"[২৪]

বিষয়বস্তুতে হীনযানী মতাদর্শ লক্ষ্য করে এবং ভাষাশৈলী ও বিষয়-বিন্যাসের ধরণ পর্যালোচনা করে দিলীপ

কুমার বড়ুয়া এবং সুমন কান্তি বড়ুয়াও শারিপুত্রপ্রকরণ এবং প্রতীকী নাটকটি অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৫] শারিপুত্রপ্রকরণের লেখক পরিচিতি অংশে গ্রন্থটি সাকেতের অশ্বঘোষ রচিত বলে উল্লেখ আছে। ফলে গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া যায় এবং উপরে বর্ণিত বিষয় পর্যালোচনায় প্রতীকী নাটকটিও অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দিলে অত্যুক্তি হবে না।

৪.৪. অন্যান্য নাটক

রত্না বসু এবং সুমন কান্তি বড়ুয়া অভিমত পোষণ করেছেন যে, অশ্বঘোষ 'খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর' নাটকটিও রচনা করেন। এছাড়া, অশ্বঘোষ 'উর্বশী বিয়োগ' নামে একটি নাটক পরিচালনার কথাও উক্ত গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন।[২৬] উক্ত দু'টি নাটকের কথা তিব্বতি ও চৈনিক উৎসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সংস্কৃত পুথিও আবিষ্কৃত হয়নি। বর্ণিত গবেষকগণ কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা উল্লেখ করেন নি। তবে *ভোলগা থেকে গঙ্গা* গ্রন্থেও *উর্বশী-বিয়োগ* নাটকের কথা উল্লেখ আছে। ফলে বিচার-বিশ্লেষণপূর্বক বর্ণিত নাটকটি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন।

৪.৫. রাষ্ট্রপাল

এটি একটি নাটক। কেবল ভারতীয় উৎসেই নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিব্বতি এবং চৈনিক উৎসে উল্লেখ পাওয়া যায় না। নাটকটির সংস্কৃত পুথি যেমন আবিষ্কৃত হয়নি. তেমনি এর কোনো অনুবাদও পাওয়া যায় না। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি রচিত *'বাদন্যায়'* গ্রন্থে নাটকটি অশ্বঘোষে রচনা হিসেবে বর্ণিত আছে। রত্না বসুর মতে, বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনীই এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়।[২৭] মূল পাঠের অভাবে নাটকটির প্রকৃত বিষয়বস্তু কী ছিল তা বলা কঠিন। তবে, নামকরণের দিকে থেকে বিচার করলে রত্না বসুর অভিমত সঠিক বলে মনে হয়। কারণ অশ্বঘোষ রচিত শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকটিও বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়নের দীক্ষা নিয়ে রচিত। রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনি ত্রিপিটকের অন্তর্গত মজ্ঝিমনিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়। বুদ্ধের ধর্ম, দর্শন ও হীনযানী ভাবাদর্শ লক্ষ্য করে এ. কে. ওয়ার্ডার এবং বি. সি. ল্য (B. C. Law) নাটকটি

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন সপ্তম শতকের দিকে নাটকটি ভারতবর্ষে খুবই জনপ্রিয় ছিল।[২৮] বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনা করে সুমন কান্তি বড়ুয়াও নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দিয়েছেন।[২৯] এ প্রসঙ্গে দিলীপ কুমার বড়ুয়া[৩০] বলেন, 'ধর্মকীর্তি একজন কীর্তিমান দার্শনিক। বাদন্যায় তাঁর অমর সৃষ্টি দাশনিক গ্রন্থ। মূল পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই কালজয়ী দার্শনিকের স্বীকারোক্তি তথা নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা তা বিশ্বাস করা উচিত।' পেট্রিক ওলিভেল্লি (Patrick Olivelle), এ. বি. কীথ, এম. উন্টানীট্স, ই. এইচ. জনস্টন প্রমুখ গবেষকের গবেষণাকর্মে নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে গণ্য হয়নি।[৩১] পুথি বা কোনো অনুবাদকর্ম আবিষ্কৃত না হওয়ায় নাটকটি অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা কি না তা নির্ধারণ করা কঠিন। তবে নাটকটি বিষয়বস্তু শারিপুত্রপ্রকরণের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং শারিপুত্রের ন্যায় বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনি বর্ণিত এ নাটকের আলোচ্য বিষয়। এ যুক্তিতে রাষ্ট্রপাল নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করা যেতে পারে।

৪.৬. সূত্রালংকার

চৈনিক উৎসে আলোচ্য গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ আছে। কিন্তু তিব্বতি ও ভারতীয় উৎসে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্থান লাভ করেনি ।[৩২] চৈনিক উৎসে উল্লেখ আছে যে, কুমারজীব সূত্রালংকার গ্রন্থটি ৪০৫ খ্রিস্টাব্দে সংস্কৃত থেকে চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থটির সম্পূর্ণ সংস্কৃত পুথি বা পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নি। এইচ. লুডার্স চৈনিক ভাষায় অনূদিত সূত্রালংকার গ্রন্থটির সংস্কৃত পুথির খণ্ডাংশ তুরফান অঞ্চল হতে আবিষ্কার করেছেন। উক্ত পুথির লেখক পরিচিতি অংশে (Colophon) গ্রন্থটির রচয়িতা হিসেবে কুমারলতা'র নাম এবং গ্রন্থটি 'সূত্রালংকার' এর পরিবর্তে 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা' নামে উল্লেখ আছে। আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুথি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দীর্ঘ নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, জাতক, ধর্মপদ, থেরগাথা, বিনয় পিটক এবং অবদান গ্রন্থ হতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে গ্রন্থটি রচিত হয়। বিশেষত,

জাতক এবং অবদান গ্রন্থের রচনাশৈলীর অনুকরণে গ্রন্থটি গদ্যে ও সুবিন্যস্ত অলংকার সমৃদ্ধ পদ্যে রচিত।[৩৩] নৈতিক কাহিনি বা গল্পই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। রাজকুমার দীর্ঘায়ু কাহিনি, শিবি জাতকের রাজা শিবির কাহিনি, সুত্ত পিটকে বর্ণিত শারিপুত্র কর্তৃক অকুশলকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষা দানে অসম্মতি এবং পরবর্তীতে বুদ্ধ কর্তৃক দীক্ষা দান বিষয়ক কাহিনি, কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের অন্তিমকালের বর্ণনা, নির্বাণ লাভের জন্য গৌতমী কর্তৃক বুদ্ধকে পূজা দান, বুদ্ধের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শনের নানা কাহিনি এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সূত্রালংকার গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদেও অভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু লেখতত্ত্বের বিচারে তুরফান অঞ্চল হতে আবিষ্কৃত পুথিটি অশ্বঘোষের অনেক পরে রচিত বলে ধারণা করা হয়। উপরে বর্ণিত কারণে গ্রন্থটির লেখক সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়।

সপ্তম শতকের চৈনিক পারিব্রাজক ইৎ-সিং (I-Tsing)[৩৪] তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সূত্রালংকার গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সময়কালে গ্রন্থটি ভারতবর্ষে গীত আকারে বহুল পাঠ করা হত। এম. আনেসাকি (M. Anesaki) মতে, সূত্রালংকার গ্রন্থটি বিভিন্ন নৈতিক কাহিনি বা গল্প সংকলনে রচিত। এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আবেদন অশ্বঘোষের অন্যান্য রচনাবলী তথা বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্রপ্রকরণ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ যুক্তিতে তিনি গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে অভিহিত করেন।[৩৫] কোনো যুক্তি উপস্থাপন না করলেও এবি. কীথ এবং এস. লেভি (Sylvian Levi) বলেন, এখনো সূত্রালংকার গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে চিন্তা করা যায়।[৩৬] কিন্তু আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুথির রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু বিচারে এইচ. জনস্টনও সূত্রালংকার গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেন না।[৩৭]

এম. উইন্টানীট্স আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুথি পর্যবেক্ষণ করে বলেন, 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা' শিরোনামদ্বয় একই অর্থবোধক। তিনি উক্ত শিরোনামের সম্ভাব্য ইংরেজি অর্থ করেছেন : 'A Series of

Examples adorned by Poetic Invention।' তিনি আরো বলেন, চৈনিক অনুবাদক 'কল্পনামণ্ডিতিকা' এবং 'কল্পনালংকৃতিকা' নামের অর্থ সঠিকভাবে হৃদয়াঙ্গম করতে পারেন নি। তিনি 'অলংকার' শব্দটির কারণে 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা'কে সূত্রালংকার নামে অভিহিত করেছেন। মূলত 'সূত্রালংকার গ্রন্থটি অশ্বঘোষের পরবর্তীকালে কুমারলতা রচনা করেন এবং সূত্রালংকার গ্রন্থটির মূলত 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা' নামেই অভিহিত ছিল।"[৩৮]

এইচ. লুডার্স আবিষ্কৃত পুথির খণ্ডাংশ সমীক্ষাপূর্বক বলেন, অশ্বঘোষ প্রকৃতপক্ষে 'সূত্রালংকার' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, যা চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়নি। গ্রন্থটি রচনার অনতি বিলম্বে হারিয়ে যায়। 'অলংকার' শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকার কারণে 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা'-কে ভুল করে চৈনিক অনুবাদক অশ্বঘোষের সূত্রালংকার নামে অভিহিত করেছে।[৩৯]

কিন্তু এইচ. লুডার্সের অভিমত এম. উইন্টারনীট্স গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। কারণ এইচ. লুডার্সের উক্ত অভিমত সূত্রালংকার গ্রন্থের রচয়িতা সম্পর্কে বিরাজমান সমস্যার সমাধান প্রদান করে না।' তিনি পুনরায় বলেন, গ্রন্থটি মূলতঃ 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা' শিরোনামে অভিহিত ছিল, যা অশ্বঘোষের পরবর্তীকালে কুমারলতা কর্তৃক রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত ভাষার ব্যাকরণ এবং ছন্দ-অলংকার বিচার করে এবং সম্রাট কণিষ্কের অন্তিমকালের বর্ণনা বিশ্লেষণপূর্বক এম. উইন্টানীট্স গ্রন্থটি সম্রাট কণিষ্কের পরবর্তীকালে রচিত বলে ধারণা করেন এবং গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৪০]

হুবার (Huber) [৪১] ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সূত্রালংকার গ্রন্থটি চৈনিক ভাষা হতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদপূর্বক প্রকাশ করেন। তিনি আলোচ্য গ্রন্থের তিনটি গল্প দিব্যাবদান গ্রন্থে আবিষ্কার করেন এবং বলেন, 'এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল আছে। তাছাড়া, এ গ্রন্থে সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে।' এ কারণে তিনি গ্রন্থটি সর্বাস্তিবাদ

সম্প্রদায়ের বলে দাবী করেন। হিউয়েন সাং- এর মতে, কুমারলতা সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তক্ষশিলায় জন্মগ্রহণ করেন।[৪২] সৌত্রান্তিক মতবাদের অনুসারীরা সর্বাস্তিদবাদের অন্তর্গত। এ কারণে সূত্রালংকার গ্রন্থটি কুমারলতা কর্তৃক 'কল্পনামণ্ডিতিকা' বা 'কল্পনালংকৃতিকা' নামে রচিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। কুমারলতা'র সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক। বিশিষ্ট ভারতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য গবেষক জি. কে. নরিমন[৪৩] এর মতে, সূত্রালংকার গ্রন্থে মহাযানী ভাবাদর্শ এতই প্রকট যে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের অনেক পরবর্তীকালে রচিত বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি আরো বলেন, সূত্রালংকার গ্রন্থে সম্রাট কণিষ্কের অন্তিমকালের বর্ণনা রয়েছে। অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের ধর্মীয় গুরু বা উপদেষ্টা ছিলেন। সমাট কণিষ্কের অন্তিমকালে অশ্বঘোষ বেঁচে ছিলেন কি না জানা যায় না, থাকলেও তিনি খুবই বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে থাকবেন এবং সে বয়সে গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সূত্রালংকার গ্রন্থে বুদ্ধচরিত গ্রন্থের উল্লেখ আছে, যা গ্রন্থটি বুদ্ধচরিতের পরে রচিত বলে সাক্ষ্য দেয়। বজ্রসূচীর গ্রন্থের ন্যায় এ গ্রন্থেও সাংখ্য, ব্রাহ্মণ্য এবং বৈশেষিক মতাদর্শ এতই প্রকট যে, গ্রন্থটি ব্রাহ্মণ্য ভাব-ধারায় রচিত বলে প্রতীতি জন্মে। এরূপ ভাব-ধারা বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। এসব কারণে তিনি সূত্রালংকার গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে গণ্য করেন না। তোমোমাৎসু (Tomomatsu) সূত্রালংকার গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন, যা ভারতীয় পণ্ডিত শাক্যসিংহ তিব্বতি অনুবাদকের সহায়তায় তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন।[৪৪] কিন্তু তিব্বতি অনুবাদে লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ নেই। তাছাড়া, তিব্বতি অনুবাদের তথ্য 'সূত্রালংকার গ্রন্থটি কুমারজীব কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল' এ বিষয়টি সমর্থন করে না।[৪৫] বাংলাদেশী গবেষক দিলীপ কুমার বড়ুয়াও রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তু বিচারে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে গণ্য করেন না।[৪৬] যাহোক, সূত্রালংকার গ্রন্থের আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুথির লেখক পরিচিতি অংশে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ নেই। তাছাড়া, এ গ্রন্থে মহাযানী ভাব ধারা এতই প্রকট আকারে প্রস্ফুটিত হয়েছে যে অশ্বঘোষের সময়কালে মহাযানী ভাবাদর্শ সেভাবে বিকশিত হয়নি। অধিকন্তু, আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির

লেখক পরিচিতি অংশে গ্রন্থটির লেখক হিসেবে কুমারলতা'র নামোল্লেখ আছে। ফলে সূত্রালংকার গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে গণ্য করতে কষ্ট হয়।

৪.৭. বজ্রসূচী

চৈনিক ঐতিহ্যে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে দাবী করা হয়েছে। গ্রন্থটির চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গেলেও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এখনো আবিষ্কৃত হয়। তাছাড়া, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে ভারত ভ্রমণে আসা চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং এর বর্ণনায় এবং তিব্বতি উৎসে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্থান লাভ করেনি। চৈনিক অনুবাদ হতে গ্রন্থটি বি. এইচ. হডগসন (B. H. Hodgson) ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন, যা লেনচেলোট উইলকিনসন (Lancelot Wilkinson) সম্পাদনাপূর্বক ১৮২০ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় (Vol. III.) প্রকাশ করেন। চৈনিক অনুবাদ হতে এ. এফ. ওয়েসারও (A. F. Weser) Die-vajra-suci-des Acvaghosa নামে ফরাসী ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশ করেন। এটি যুক্তিবিদ্যা জাতীয় দার্শনিক গ্রন্থ। বজ্রসূচী শব্দের 'বজ্র' অর্থ হচ্ছে কঠিন, কঠোর, দৃঢ় প্রভৃতি। আর 'সূচী' শব্দের অর্থ হচ্ছে সূচ। এ গ্রন্থে *লেখক বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, মনুসংহিতা* প্রভৃতি গ্রন্থ হতে তথ্য সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণিক দর্শন বা মতাদর্শকে থেকে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে যুক্তি-তর্ক দ্বারা দৃঢ় সূচালো সূচের মতো আঘাত করেছেন এবং ব্রাহ্মণ্য বজ্রকঠোর যুক্তিতে ব্রাহ্মণ্য জাতিভেদ প্রথার অসারতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া, দুঃখ-বেদনা, জীবন চর্যা, বিচার-বুদ্ধি, পেশা, জন্ম-মৃত্যু, ভয়-ভালবাসা, যৌনতা প্রভৃতিতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের তথা তথাকথিত চতুবর্ণের সাম্য অবস্থা প্রতিপন্ন করেছেন। এটি একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। সুমন কান্তি বড়ুয়া[৪৭] গ্রন্থটি অশ্বঘোষের দর্শনতাত্ত্বিক রচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। ই. বি. কাওয়েল এবং নেইল গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর উৎস নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁরা গবেষণায় প্রমাণ করেছেন যে, গ্রন্থটি বজ্রসূচি উপনিষদ এবং দিব্যাবদান গ্রন্থের 'মৈত্রকন্যাবদান' অনুচ্ছেদ হতে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে রচিত হয়েছে।[৪৮] গ্রন্থটি ৯৭৩-৯৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চৈনিক

ভাষায় অনূদিত হয় বলে ধারণা করা হয়। এম. উইন্টারনীট্স গ্রন্থটির রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু সমীক্ষার আলোকে বলেন, বজ্রসূচি অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হয়। রচয়িতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও এম. উইন্টারনীট্স মনে করেন, ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক যুক্তি উপস্থাপনের জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থটির গুরুত্বপূর্ণ অপরিসীম।[৪৯] ই. এইচ. জনস্টন গ্রন্থটিকে বুদ্ধিদীপ্ত তর্কমূলক রচনা (clever piece of polemics) হিসেবে অভিহিত করে বলেন, গ্রন্থটিতে অশ্বঘোষের রচনাশৈলী এবং মননশীলতা অনুপস্থিত।' তিনি আরো বলেন, চৈনিক অনুবাদে গ্রন্থটি ধর্মকীর্তি কর্তৃক রচিত বলে উল্লেখ আছে, যিনি একজন ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ ছিলেন।[৫০] জি. কে. নরিমনও চৈনিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থটি ধর্মকীর্তির রচনা হিসেবে দাবী করেছেন।[৫১] এ কারণে উক্ত গবেষকদ্বয় (এইচ. জনস্টন এবং জি. কে. নরিমন) বজ্রসূচি গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেননি। এম. আনেসাকির (M. Anesaki)[৫২] মতে, চৈনিক ভাষায় বজ্রসূচির অপর একটি অনুবাদকর্ম পাওয়া যায়, যাতে লেখক হিসেবে ফা-হিয়েন (Fa-hien) এর নামোল্লেখ আছে। 'ফা-হিয়েন' এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ধর্মযশ বা ধার্মিক সুভূতি (Law-famed)। রত্নাবসু এবং ই. এইচ. জনস্টন[৫৩] 'ফা-হিয়েন' শব্দের অর্থ করেছেন ধর্মকীর্তি। তিব্বতি বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে ধার্মিক সুভূতি নামে একজন লেখকের নাম ও তাঁর রচিত সাহিত্যকর্মের উল্লেখ আছে এবং তিব্বতি ঐতিহাসিক তারানাথ অশ্বঘোষ, ধার্মিক সুভূতি এবং মাতৃচেট একই ব্যক্তি হিসেবেও অভিহিত করেছেন। এ কারণেও বজ্রসূচি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে দাবী করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু অশ্বঘোষ, ধার্মিক সুভূতি এবং মাতৃচেট সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং এদেঁর স্বতন্ত্র সাহিত্যকর্মও আবিষ্কার হয়েছে (তথ্যনির্দেশ দ্রষ্টব্য.)। দিলীপ কুমার বড়ুয়ার[৫৪] মতে, সপ্তম শতকের দার্শনিক ধর্মকীর্তির রচনায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে বৌদ্ধ-ধর্ম-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বজ্রসূচি গ্রন্থেও একই প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এ কারণে তিনিও গ্রন্থটি ধর্মকীর্তি রচনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মূলত, অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকৃত বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং

শারিপুত্রপ্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থ সমীক্ষায় দেখা যায়, এসব গ্রন্থে ব্রাহ্মণ্যবাদের নানা বিষয় আলোচিত হলেও সমালোচনার চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বুদ্ধের জীবনে সংঘটিত নানা ঘটনা তাঁর সাহিত্যকর্মের ছত্রে ছত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়, যা বজ্রসূচি গ্রন্থে অনুপস্থিত। এ কারণে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে মেনে নিতে দ্বিধা হয়।

৪.৮. গণ্ডীস্তোত্রগাথা

গ্রন্থটির চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গেলেও সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় নি। তিব্বতি উৎসেও গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ আছে। বেরন এ ভন স্টেল-হোলস্টেইন (Baron A von Stael-Holstein)[৫৫] চৈনিক অনুবাদ হতে পাঠোদ্ধার করে গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রূপ দান করেন, যা ১৯১৩ সালে Bibliothca Buddhica সিরিজের পনেরতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চৈনিক অনুবাদে গ্রন্থটি Chien-ch'-ui-fan-tsan' নামে অভিহিত। গ্রন্থটি ২৯টি গাথায় স্রগ্ধরা ছন্দে রচিত। বুদ্ধের গুণাবলী, বিহারে গমন ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণের সুফল প্রভৃতি এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। চীন, জপান, কোরিয়ায় ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সূত্র আবৃতি করতে দেখা যায়। চৈনিক ঐতিহ্যে গ্রন্থটি ঘণ্টিকা সূত্র নামেও অভিহিত করতে দেখা যায়। এ কারণে দিলীপ কুমার বড়ুয়া[৫৬] মনে করেন, উক্ত গ্রন্থের গাথাগুলো ঘণ্টাধ্বনির তাল-লয়ের সঙ্গে লয় মিলিয়ে আবৃতি করা হত। এ গ্রন্থের ২০ নং গাথায় কাশ্মীরে দুঃশাসনের বর্ণনা আছে। এ কারণে ই. এইচ. জনস্টন[৫৭] গ্রন্থটি কাশ্মীরে রচিত বলে ধারণা করেন। তবে তিনি বলেন, বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যের লেখক অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর সঙ্গে গ্রন্থটির রচনাশৈলীর কোন মিল নেই। গ্রন্থটি অশ্বঘোষের কয়েকশত বছর পরে রচিত। এ যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেন নি। এম. উইন্টরনীট্স গ্রন্থটিকে অনুপম কাব্য হিসেবে অভিহিত করে বলেন, রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু বিবেচনায় গ্রন্থটি অশ্বঘোষের অপূর্ব রচনা হিসেবে অভিহিত করা যায়।[৫৮] এবি কীথও[৫৯] গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে দাবী করে বলেন, গ্রন্থটির লেখক অশ্বঘোষ এবং বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যের রচয়িতা অশ্বঘোষ একই ব্যক্তি। কিন্তু

তিনি তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি প্রদর্শন করেন নি। গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থেও বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করে দিলীপ কুমার বড়ুয়া বলেন, "অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্রপ্রকরণ গ্রন্থে কর্মবাদ স্থান পেয়েছে এবং কার্যকারণ তত্ত্বের আলোকে বৌদ্ধধর্মের মহিমা প্রদর্শিত হয়েছে। অপরদিকে গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থে ভক্তিবাদ স্থান পেয়েছে। এ যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি 'গ্রন্থটি অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত' - এ অভিমত প্রত্যাখ্যান করেন।[৬০] কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে বুদ্ধের গুণকীর্তনে ও মহিমা প্রদর্শনে ভক্তিবাদের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। তাছাড়া, সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের ধর্মীয় উপদেষ্টা ছিলেন এবং অশ্বঘোষ দীর্ঘদিন কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থে কাশ্মীরের কথা লিপিবদ্ধ থাকায় এবং বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে মতো বুদ্ধের গুণকীর্তন ও মহিমা প্রদর্শিত হওয়ায় গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া যায়।

৪.৯. শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র

গ্রন্থটি মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র নামেও অভিহিত। একমাত্র চৈনিক উৎসেই গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ আছে, বিশেষত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের জীবনীতে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার গ্রন্থটি ফা-হিয়েন সংস্কৃত হতে চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এরূপ অভিমতও পাওয়া যায়। কিন্তু তিব্বতি ও ভারতীয় উৎসে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান লাভ করেনি। গ্রন্থটির সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। উক্ত গ্রন্থের দু'টি চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায়, যাতে লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে। একটি ৫৩৪ খ্রিস্টাব্দে পরমার্থ কর্তৃক, অপরটি ৭১০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষানন্দ কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনুবাদকৃত। টি. সুজুকি (T. Suzuki) ৭১০ খ্রিস্টাব্দে অনূদিত গ্রন্থেটি *Discourse of the Awakening of Faith* শিরোনামে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। মহাযানী ধর্ম-দর্শন, বিশেষত বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ দর্শন এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথমে গ্রন্থটি রচনার আটটি উদ্দেশ্য বা কারণ ব্যাখ্যা করা হয়, যা চতুর্থ অধ্যায়ে

গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে। তৎপর গ্রন্থটিতে পর্যায়ক্রমে মহাযানের মৌলিক দর্শন, মহাযান দর্শনের ব্যাখ্যা, মহাযান চর্চা এবং মহাযান চর্চার ফল বর্ণনা করা হয়।

আলোচ্য গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকায় টি. সুজুকি গ্রন্থটির লেখক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষত, তিনি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম ও জীবন-দর্শনের নানাদিক আলোচনা করেন এবং বলেন, অশ্বঘোষের সময়কালে মহাযান ধর্ম-দর্শন যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। অশ্বঘোষও মহাবিভাষাশাস্ত্র সংকলনে এবং মহাযান ধর্ম-দর্শনের সমৃদ্ধি ও প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ কারণে তিনি মনে করেন গ্রন্থটি অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত।[৬১] সুমন কান্তি বড়ুয়া[৬২] গ্রন্থটি অশ্বঘোষের দর্শনতাত্ত্বিক রচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। এস. লেভির[৬৩] মতে, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত গ্রন্থে অধিবিদ্যার আলোচনা নেই, কিন্তু শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রে অধিবিদ্যার ব্যাপক আলোচনা রয়েছে, যা আলোচ্য গ্রন্থের লেখক অশ্বঘোষকে অধিবিদ্যা দর্শনের পারঙ্গম বলে প্রতীয়মান হয়। বিজ্ঞানবাদ অশ্বঘোষের পরে উদ্ভব হওয়ায় তিনি আলোচ্য গ্রন্থটি অশ্বঘোষের পরে রচিত বলে ধারণা করেন। মূলত, বিজ্ঞানবাদ অশ্বঘোষের পরে অসঙ্গের সময়কালে বা দ্বিতীয় শতকের দিকে উদ্ভব-বিকাশ লাভ করেছিল। জি. কে. নরিমন[৬৪] এর মতে, 'গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া গেলেও গ্রন্থটিতে বর্ণিত বিষয়বস্তু অশ্বঘোষের পরবর্তীকালীন। ফলে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া যায় না।' চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্য গবেষক জে. তাকাকুসুও (J. Takakusu) গ্রন্থটি আলোচ্য অশ্বঘোষের রচনা নয় বলে মনে করেন। তিনি গ্রন্থটির লেখক সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত পোষণ করেন :

"Either the poet Asvaghosa is different from the philosopher Asvaghosa (for Buddhists generally believe there were more than one Asvaghosa) or that Sastra of a different origin has been attributed to him simply because great renown. I think the later is the case, for an earlier Catalogue of Chinese texts omits the name of Asvaghosa. In any case the

Mahayana-Sraddhotpada does not belong to him. Noe do the contents show any probality of his authorship. It is later than Lankavatara in which Nagarjuna's appearance is prophesied by Buddha, and onlt a step earlier tha Vijnamatravada.''[৬৫]

জে. তাকাকুসুর অভিমত সমর্থন করে এম. উন্টারনীট্স[৬৬] বিষয়বস্তু এবং রচনাশৈলীর ধরণ বিবেচনা করে বলেন, গ্রন্থটি বুদ্ধচরিতের লেখক অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত বলে মনে হয় না, হয়তো অন্য কোনো অশ্বঘোষ (দ্বিতীয় অশ্বঘোষ) তা রচনা করে থাকতে পারেন। হয়তো নাম-যশের কারণে গ্রন্থটিতে তাঁর নাম যুক্ত করা হয়েছে। নতুবা পঞ্চম শতকে অশ্বঘোষ নামক কোনো দার্শনিক গ্রন্থটি রচনা করে থাকতে পারেন, যাতে মহাযানী দর্শনের সমৃদ্ধ রূপের সন্ধান লাভ করা যায়।

অপর মহাযানী সাহিত্য গবেষক আর. কিমুরা (R. Kimura)[৬৭] বিষয়বস্তু বিচারে গ্রন্থটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে রচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। এস. এন. দাসগুপ্ত (S. N. dasgupta), ওয়াই. সোগেন (Y. Sogen), কে. জে সৌণ্ডার্স (K. J. Sauders) প্রমুখ গবেষকগণ মনে করেন এ গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে বিজ্ঞানবাদ এবং মাধ্যমিক শূন্যবাদের সংমিশ্রণে যে দার্শনিক মতাদর্শ ফুটে উঠেছে তা অশ্বঘোষের পরবর্তীকালেই উদ্ভব-বিকাশ ঘটেছিল।[৬৮] এ কারণে তাঁরা শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থটি অশ্বঘোষের পরবর্তীতে রচিত বলে মনে করেন।

মূলত, টি. সুজুকি[৬৯] কর্তৃক অনুবাদকৃত শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো ধারণা করা যায় :

ক) এ গ্রন্থে মাধ্যমিক শূন্যবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ দর্শনের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়।

খ) এতে মহাযানী ধর্ম-দর্শনের বিকশিত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় এবং

গ) মহাযানী বোধিসত্ত্ববাদেও ধারণা এতে স্পষ্ট প্রকটিত।

সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রথমত, মাধ্যমিক শূন্যবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ অশ্বঘোষের পরবর্তীকালে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের দিকে নাগার্জুন এবং অসঙ্গের মাধ্যমে উদ্ভব-বিকাশ লাভ করেছিল। দ্বিতীয়ত, মহাযানী দর্শন ও বোধিসত্ত্ববাদের ধারণা গ্রন্থটিতে যেভাবে আলোচিত হয়েছে, অশ্বঘোষের সময়কালে তেমন একটা সমৃদ্ধি লাভ করেনি। তৃতীয়ত, এ গ্রন্থে মহাযানী দর্শনের ধারাবাহিক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়, যা অশ্বঘোষের পরবর্তীকালে বিকশিত হয়েছিল। তাছাড়া, কোনো মহাযানী দার্শনিক বা ভাষ্যকারের লেখায় এবং ভারতীয় আকর গ্রন্থে শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ নেই। এসব কারণে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা বলে প্রতীয়মান হয় না।

৪.১০. কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

এটি গীতিকাব্যমূলক গ্রন্থ। এর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি (খণ্ডাংশ) আবিষ্কৃত হয়েছে। ভারতীয় উৎসে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ করা হলেও চৈনিক উৎসে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া হয়নি। তারানাথ অশ্বঘোষের যে গ্রন্থ তালিকা উপস্থাপন করেছেন তাতে আলোচ্য গ্রন্থটির উল্লেখ নেই।[৭০] ই. এইচ. জনস্টন আলোচ্য গ্রন্থটি অশ্বঘোষের দু'টি অমর কাব্য (বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্য) এবং গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থের সঙ্গে তুলনামূলক সমীক্ষা করে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে অস্বীকার করেন। নিম্নে তাঁর অভিমত তুলে ধরা হলো :

"The Kavindravacanasamuccaya is certainly not by him but shows some likeness to the Gandistotra, though more elaborate than anything found there. Of the fivein teh Subhasitavali none definitely bear his sign manual or need even be by a Buddhist; but, if the atribution is improbable, it cannot be pronounced absolutely impossible."[৭১]

মূলত কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় গ্রন্থের গাথাগুলোর ভাব-ভাষা, রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তুর ধরণ বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যের সঙ্গে সঙ্গতিহীন। এ গ্রন্থের পাঁচটি গাথা *সুভাষিতাবলী* গ্রন্থে পাওয়া যায়।

গাথাগুলো পর্যালোচনা করে দিলীপ কুমার বড়ুয়া বলেন, 'গাথাগুলোতে বৌদ্ধ ভাবধারা এবং অশ্বঘোষের রচনাশৈলী উভয়ই অনুপস্থিত। এ কারণে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে মেনে নিতে কষ্ট হয়।'[৭২] সমীক্ষায় দেখা যায়, আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন গাথা বিভিন্ন প্রখ্যাত লেখকের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া, গ্রন্থটির নামকরণ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ কবিদের (কবি + ইন্দ্র =কবীন্দ্র) বচন বা বাণী সংকলিত করা হয়েছে বিধায় গ্রন্থ *কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়* নামে অভিহিত করা হয়েছে। ফলে গ্রন্থটি যে বিভিন্ন কবিদের রচনা সংকলন তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় গীতিকাব্য সংকলনগণ সম্ভবত বিভিন্ন কাব্য হতে গাথা সংগ্রহ করে গ্রন্থটি সংকলন করেছিলেন - এরূপ ধারণা অযৌক্তিক নয়।

৪.১১. ষড়গতিকারিকাহ্

Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka - এ গ্রন্থটি *Lu-tao-lun-hui-ching* নামে এবং অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ আছে।[৭৩] প্রখ্যাত অশ্বঘোষ গবেষক টি. সুজুকি গ্রন্থটির ইংরেজি নামকরণ করেছেন : *A sutra on the transmigration through the six states of existance নামে।*[৭৪] বর্তমানে গ্রন্থটির সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে গ্রন্থে লেখক পরিচিতি অংশ পাওয়া যায় নি। ফলে রচয়িতা কে তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। এ গ্রন্থের একটি গাথা বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু রচিত অভিধর্মকোষ গ্রন্থে পাওয়া যায়, বসুবন্ধু গাথাটি ধার্মিক সুভুতি কর্তৃক রচিত বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। ষড়গতিকারিকাহ্ গ্রন্থের পালি ভার্সন হচ্ছে পঞ্চগতিদীপনি। পঞ্চগতিদীপনি হীনযানী ভাবাদর্শে রচিত এবং বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম বিষয় পঞ্চগতি এ গ্রন্থের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। বিশেষত, ক্ষুদ্র-বৃহৎ নরক, বিভিন্ন অপায় ভূমি এবং কর্মফলের কারণে মানুষ পঞ্চগতির যে কোনো একটি গতি প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। চৌদ্দশ শতকের বার্মার থেরবাদী পণ্ডিত মেধাঙ্কর রচিত 'লোকদীপসার' নামক গ্রন্থেও পঞ্চগতির বর্ণনা পাওয়া যায়।[৭৫] হীনযানী দর্শনে ষড়গতির ধারণা অনুপস্থিত। ষড়গতি মহাযানী দর্শনের অন্তর্গত। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যে পঞ্চগতি সম্পর্কে বর্ণনা

পাওয়া গেলেও ষড়গতি সম্পর্কে কোনো বর্ণনা নেই। ফলে, অশ্বঘোষ পঞ্চগতির সম্পর্কে আলোচনা করার পর ষড়গতির আলোচনার জন্য পুনরায় গ্রন্থ রচনা করবেন এরূপ চিন্তা করা যায় না। দিলীপ কুমার বড়ুয়ার মতে,

"বৌদ্ধসংঘ বিভিন্ন সেক্টে বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক সেক্টের ভিক্খুরা স্বীয় সেক্টের ধর্ম-দর্শন অনুসরণ ও প্রচার-প্রসারে সচেষ্ট থাকতেন, যা অশ্বঘোষের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। এ যুক্তিতে এবং অশ্বঘোষ হীনযানী সেক্টের অনুসারী ছিলেন বিবেচনা করে ষড়গতিকারিকাহ গ্রন্থটির রচয়িতা অশ্বঘোষ এবং বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্য রচয়িতা অশ্বঘোষ পৃথক্ ব্যক্তি বলে মনে হয়।"[৭৬]

পূর্বেই বলেছি, তিব্বতি ঐতিহ্যে 'ধার্মিক সুভূতি' অশ্বঘোষের অপর নাম হিসেবে উল্লেখ আছে। এস, লেভি প্রথমে ধার্মিক সুভূতি এবং অশ্বঘোষ এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে দাবী করলেও পরবর্তীতে তিনি তাঁর অভিমত সংশোধন করেন এবং বলেন দু'জন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি।[৭৭] সম্ভবত, ধার্মিক সুভূতি এবং অশ্বঘোষ একই ব্যক্তি মনে করে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা যায়। তবে ধার্মিক সুভূতি ভিন্ন একজন ব্যক্তি, যিনি বহু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : বোধিসত্ত্ব-চর্যা (সংগ্রহ), প্রদীপ-রত্নমালা-নাম, সদ্ধর্ম-স্মৃতি-উপসথান-কারিকা, দশকুশল-কর্ম-পথ-নির্দেশ।[৭৮] ষড়গতিকারিকাহ্ হতে উদ্ধৃত গাথাটি যেহেতু প্রখ্যাত দার্শনিক বসুবন্ধু ধার্মিক সুভুতির রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন সেহেতু ষড়গতিকারিকাহ্ গ্রন্থটিও তাঁর রচনা হিসেবে স্বীকার করা যায়। ফলে, গ্রন্থটি অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাছাড়া, ষড়গতি ও পঞ্চগতি[৭৯] দর্শনের ভিন্নতার কারণেও আলোচ্য গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করা যায় না।

৪.১২. শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র

একমাত্র তিব্বতি উৎসে গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে অর্ন্তভুক্ত দেখা যায়। গ্রন্থটির তিব্বতি অনুবাদের লেখক পরিচিতি অংশে রচয়িতা হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে।[৮০] কিন্তু চৈনিক উৎসে *শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র* এবং *চতুঃশতকস্তোত্র* গ্রন্থ দু'টি মাতৃচেট এর রচনা হিসেবে উল্লেখ

আছে। শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র এর অর্থ হচ্ছে একশত পঞ্চাশটি স্তুতি গাথা। গাথাগুলোর মাধ্যমে বুদ্ধস্তুতি করা হয়েছে। অপরদিকে চতুঃশতকস্তোত্র অর্থ হচ্ছে চারিশত স্তুতি গাথা, যা দ্বারা বুদ্ধস্তুতি করা হয়েছে।[৮১] চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র গ্রন্থটি সংস্কৃত হতে চৈনিক ভাষায় অনুবাদ করে চীনে নিয়ে যান। তিনি গ্রন্থটি মাতৃচেট এর রচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে আরো উল্লেখ করেছেন যে, শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র এবং চতুঃশতকস্তোত্র রচনা করে মাতৃচেট খুবই খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। সপ্তম শতকের দিকেও ভারতবর্ষে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বি। হীনযানী এবং মহাযানী উভয় নিকায়ের ভিক্ষুরা গ্রন্থদ্বয়ের গাথাগুলো মুখস্থ করতেন এবং সংঘ সম্মেলনে শ্রদ্ধা সহকারে সঙ্গে পাঠ করতেন। তিনি আরো বলেন, তাঁকে 'সাহিত্যের পিতা' হিসেবে গণ্য করা হতো এবং ভারতীয় কবিরা তাঁর রচনাশৈলী অনুসরণ করতেন। বসুবন্ধু এবং অসঙ্গের মতো খ্যাতিমান ব্যক্তিরা তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করতেন এবং ভারতের সর্বত্র প্রত্যেক ভিক্ষু পঞ্চশীল ও দশশীল আবৃতি করার পর তাঁর দু'টি গাথা আবৃত্তি করতেন। হীনযান এবং মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল।[৮২] গ্রন্থদ্বয়ের তুখারয়ী অনুবাদের খণ্ডাংশ মধ্য এশিয়ার তুফান অঞ্চল হতে আবিষ্কৃত হয়েছে। উক্ত খণ্ডাংশে গ্রন্থটির দুই-তৃতীয়াংশের মতো সংরক্ষিত আছে। ডব্লিউ সেইগলিং আবিষ্কৃত খণ্ডাংশ সুসংগঠিত করেন, যা ১৯১০ সালে এশিয়াটিক জার্নালে এস. লেভি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। এম. উন্টারনীট্স গ্রন্থটির গাথাগুলোর রচনাশৈলী পর্যালোচনা করে নিম্নরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন,

"They are poems in slokas, in simple and unadorned, but beautiful language and they evidently impressed the faithful more by their pious thoughts than by their form."[৮৩]

তিব্বতে 'মহারাজ কণিক-লেখ' নামে তিব্বতি ভাষায় একটি চিঠি সংরক্ষিত আছে। চিঠিটি ৮৫টি শ্লোকে রচিত। চিঠির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা, একদা সম্রাট কণিষ্ক প্রথিতযশা কবি

মাতৃচেট-কে তাঁর রাজসভায় সভাকবির পদ অলংকৃত করার জন্য রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানান। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি অপরাগতা প্রকাশ করে সম্রাট কণিষ্ককে চিঠিখানি লিখেছিলেন।[৮৪] তিব্বতি ঐতিহ্যে অশ্বঘোষকে মাতৃচেট, ধার্মিক সুভূতি, পিতৃচেট, সূরসহ নানা নামে অভিহিত করতে দেখা যায়। এ কারণে তিব্বতিরা মাতৃচেট কর্তৃক লিখিত চিঠির লেখকও অশ্বঘোষের লেখা মনে করেন। কিন্তু মাতৃচেট, ধার্মিক সুভূতি, সূর প্রমুখ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রত্যেকে সাহিত্যজগতে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, যাঁদের সাহিত্যকর্ম তথ্যনির্দেশে প্রদর্শন করা হয়েছে। এম. উইন্টারনীট্স এবং জি. কে. নরিমন প্রমুখ গবেষকগণ মনে করেন, উক্ত চিঠির কারণে তিব্বতি ঐতিহ্যে ভুলবশত শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র গ্রন্থেও লেখক মাতৃচেট-এর পরিবর্তে অশ্বঘোষের নাম লেখা হয়েছিল। উক্ত দু'জন গবেষক আলোচ্য গ্রন্থটি অশ্বঘোষ নয়, মাতৃচেট কর্তৃক রচিত বলে মনে করেন।[৮৫]

ইৎ-সিং অশ্বঘোষ এবং মাতৃচেট দু'জন ভিন্ন সত্তা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮৬] 'মহারাজ কণিক-লেখ' নামক চিঠির বিষয়বস্তু হতেও ইৎ-সিং এর অভিমত সত্য প্রতীয়মান হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের রাজসভার উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি অশ্বঘোষের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মহাবিভাষাশাস্ত্র' সম্পাদনা করেছিলেন।[৮৭] অপরদিকে, 'মহারাজ কণিক-লেখ' নামক চিঠির লেখক বার্ধক্যজনিত কারণে সম্রাট কণিষ্কের রাজসভার পদ অলংকৃত করতে অপরাগতা জ্ঞাপন করেন। ফলে বয়সের দিক থেকেও দু'জনের মধ্যে তফাৎ পরিলক্ষিত হয়। এতে বোঝা যায়, চিঠির লেখক অশ্বঘোষ অপেক্ষা বয়সে বড়। এ কারণে এম. উইন্টারনীট্স চিঠিটি অশ্বঘোষের পূর্বে রচিত বলে ধারণা করেন। ই. এইচ. জনস্টন শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র গ্রন্থের গাথাগুলোর সঙ্গে অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যের গাথাগুলোর রচনাশৈলীর তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি রচনাশৈলী বিচারে শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র গ্রন্থের গাথাগুলো অশ্বঘোষের পরবর্তীকালে রচিত বলে অভিমত পোষণ করেছেন।[৮৮] এ.বি. কীথ রচনাশৈলী অপেক্ষা দর্শনের বিচারে তুলনা করা উচিত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র নামক গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শনের ষড় পারমিতার বর্ণনা পাওয়া

যায়। অপরদিকে অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত গ্রন্থে দশ পারমিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে দর্শনের বিচারেও গ্রন্থ দু'টি দু'জন ভিন্ন লেখকের রচনা বলে প্রতীতি জন্মে। এ কারণে তিনি অভিমত প্রদান করেছেন যে, শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র গ্রন্থটি অশ্বঘোষের কর্তৃক রচিত নয়।[৮৮] মূলত, ষড় পারমিতা দর্শন দশ পারমিতা দর্শনের পরবর্তীকালে উদ্ভব হয়। তাই শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র গ্রন্থটি অশ্বঘোষের পরবর্তীকালে রচিত বলে মনে হয়।

৪.১৩. বিভিন্ন উৎসে বর্ণিত অন্যান্য গ্রন্থ

অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে বিভিন্ন উৎসে বর্ণিত অন্যান্য গ্রন্থগুলোর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি যেমন আবিষ্কৃত হয়নি, তেমনি ইংরেজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া, গ্রন্থগুলো যেমন দুর্লভ, তেমনি সেগুলো সম্পর্কে গবেষণাকর্মও অপ্রতুল। ফলে, সেসব গ্রন্থ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রদান করা তথা সেগুলো অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা কিনা নির্ণয় করা কঠিন।

৫. উপসংহার

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐতিহ্যে বর্ণিত অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় : ক) বিতর্কমুক্ত খ) আংশিক বিতর্কিত গ) বিতর্কিত এবং ঘ) অমীমাংসিত।

ক) বিতর্কমুক্ত গ্রন্থ : বিতর্কমুক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, শারিপুত্রপ্রকরণ এবং নাম বিহীন প্রতীকী নাটক। বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্রপ্রকরণ - এ তিনটি গ্রন্থের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের ভাষায় সংরক্ষিত অনুবাদকর্মেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তিনটি গ্রন্থের লেখক প্রাসঙ্গিক অংশে বা Colophon-এ লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নাম উল্লেখ আছে। তাছাড়া, পণ্ডিতগণও এ তিনটি গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন। ফলে এ তিনটি গ্রন্থকে অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। প্রতীকী নাটকের লেখক পরিচিতি অংশটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু শারিপুত্রপ্রকরণের ন্যায় এই নাটকের তুখারীয় লিপিতে অনূদিত পাণ্ডুলিপির

সন্ধান পাওয়া গেছে। লেখতত্ত্বের বিচারে প্রতীকী নাটকটি শারিপুত্রপ্রকরণ পুথির রচনাকালে তথা কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক বা হুবিষ্কের রাজত্বকালে রচিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া, রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু এবং ভাব-ভাষা ও শব্দ চয়নে অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর সঙ্গে নাটকটির যথেষ্ট মিল রয়েছে। ফলে প্রতীকী নাটকটিও অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করা যায়।

খ) আংশিক বিতর্কিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : রাষ্ট্রপাল নাটক এবং গণ্ডীস্তোত্রগাথা। রাষ্ট্রপাল নাটকের সংস্কৃত পুথি যেমন আবিষ্কৃত হয়নি, তেমনি অন্য ভাষায় এর অনুবাদকর্মও পাওয়া যায়নি। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি রচিত *বাদন্যায়* গ্রন্থে নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে বর্ণিত আছে। তাছাড়া, নাটকটির বিষয়বস্তু শারিপুত্রপ্রকরণের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বুদ্ধশিষ্য শারীপুত্রের ন্যায় এ নাটকে বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ফলে, বিতর্ক থাকলেও এবং পুথি আবিষ্কৃত না হলেও এ নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া যেতে পারে। গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গেছে এবং তাতে লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে। বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ের ন্যায় এ গ্রন্থে বুদ্ধের গুণকীর্তন ও মহিমা প্রদর্শনপূর্বক ভক্তিবাদের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। তাছাড়া, অশ্বঘোষ সম্রাট কণিষ্কের ধর্মীয় উপদেষ্টা ছিলেন এবং দীর্ঘদিন কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থান করেছিলেন। অশ্বঘোষ কাশ্মীরে অবস্থান করেছিলেন বলেই গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থে কাশ্মীরের কথা লিপিবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এ কারণে বিতর্ক থাকলেও গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া যায়।

গ) বিতর্কিত গ্রন্থ : সূত্রালংকার, বজ্রসূচী, শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ষড়্গতিকারিকাহ্ এবং শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র প্রভৃতি গ্রন্থ বিভিন্ন উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ থাকলেও রচনাশৈলী, ভাব-ভাষা এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিচারে পণ্ডিতগণ অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করতে চান না।

ঘ) অমীমাংসিত : খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর, মহাকাল-কন্ত্র-রুদ্র-কল্প-মহাশ্মশান-নাম-টীকা,

বজ্রযান-মূলাপত্তি-সংগ্রহ, স্থূলাপত্তি, মণিদ্বীপ-মহাকারুণিক-পঞ্চ-দেব-স্তোত্র, গুরু-পঞ্চাশিকা, দশ-অকুশল-কর্ম-পথ-নির্দেশ, শোক-বিনোদন, অষ্টাক্ষণ-কথা, পরিণামসা-সংগ্রহ এবং বজ্র-সত্ত্ব-প্রশ্নোত্তর, দশদুষ্টকর্মমার্গসূত্র, মহাযান ভূমিগুহ্যবাচামূলশাস্ত্র, Ni-kan-tzu-wen-wi-i-ching (A sutra on a Jaina's asking about the theory of non-ego), Shi-shih-fa-wu-shin-sung (Fifty verses on the rules of serving a teacher), Ta-sung-ti-hsuan-wen-pen-lun (A fundamental treatise on the spiritual States for Reaching final deliverance), Shih-pu-shan-yeh-tao-ching (A sutra on the ten no good deeds) প্রভৃতি গ্রন্থ বিভিন্ন উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া গেলেও গ্রন্থগুলোর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়নি। তাছাড়া, গ্রন্থগুলোর ইংরেজি অনুবাদও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু গ্রন্থগুলো সম্পর্কে গবেষণাকর্মও খুব অপ্রতুল এবং দুর্লভ। ফলে গ্রন্থগুলো অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা কিনা সিদ্ধান্ত প্রদান করা কঠিন।

তথ্যনির্দেশ

১. প্রসূন বসু (নির্বাহী সম্পাদক), *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, ১৯৮৯ (তৃতীয় সংস্করণ), পৃ. ১৫; দিলীপ কুমার বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া (সম্পাদিত), *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০১৮, পৃ. ৩১-৩৯; দিলীপ কুমার বড়ুয়া, '*মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*', বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪৮বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫, পৃ.: ৬৩-৬৪; *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., p. xii-xliv.

২. ভারতীয় উৎসে *সংবৃত্তি-বোধিচিত্ত-ভাবনোপোদেশবর্ণসংগ্রহ এবং পরমার্থ-বোধিচিত্ত-ভাবনাক্রমবর্ণসংগ্রহ* গ্রন্থদ্বয়ও অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

৩. *Taranath's History of Buddhism in India* op.cit., p. 392-393.

৪. *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p.131.

৫. বিশেষত, আর্যশূর বা শূর, মাতৃচেট এবং ধার্মিক সুভূতি রচিত গ্রন্থাবলী কখনো কখনো অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায়। পর্যালোচনার সুবিধার্থে তাঁদের রচিত গ্রন্থ তালিকা উপস্থাপন করা হলো :

ক) আর্যশূর বা শূর রচিত গ্রন্থাবলী : পারমিতা-সমাস, সুভাসিত-রত্ন-করণ্ডক-কথা, জাতকমালা, বোধিসত্ত্ব-জাতক-ধর্ম-গণ্ডি, সুপথ- দেশনা-পরিকথা।

খ) মাতৃচেট রচিত গ্রন্থাবলী : ১) বর্ণনার্থ-বর্ণনে-ভগবতো-বুদ্ধস্য-স্তোত্রে-অশক্য-স্তব-নাম ২) ত্রি-রত্ন-মঙ্গল-স্তোত্র, সম্যক-সম্বুদ্ধ-কেত-স্তোত্র (মহাকবি মাতৃচেট) ৩) একোত্তরিক-স্তোত্র ৪) সুগত-পঞ্চত্রিংশত-স্তোত্র-নাম-রত্নমালা-নাম ৫) ত্রিরত্ন-স্তোত্র ৬) মিশ্রক-স্তোত্র-নাম (মাতৃচেট এবং আচার্য দিঙনাগ) ৭) আর্য-তারা-দেবী-স্তোত্র-সর্বার্থ-সাধনা-নাম-স্তোত্র-রাজ ৮) আর্য-কারা স্তোত্র ৯) মহারাজ-কনিষ্ক-লেখ ১০) চতুহ্-বিপর্য্যয় (পরিহার)-কথা ১১)

কলিযুগ-পরিকথা ১২) অষ্টাঙ্গ-হৃদয়-সংহিতা-নাম (পিতৃচেট) ১৩) অষ্টাঙ্গ হৃদয়-নম-বৈদূর্যক-ভাষ্য (পিতৃচেট) ১৪) স্তোত্র-শত-পঞ্চাশতক।

গ) ধার্মিক সুভূতি রচিত গ্রন্থাবলী : বোধিসত্ত্ব-চর্যা (সংগ্রহ), প্রদীপ-রত্নমালা-নাম, সদ্ধর্ম-স্মৃতি-উপসথান-কারিকা, দশকুশল-কর্ম-পথ-নির্দেশ।

৬. Bunyin Nanjio, *Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka*, Oxford University Press, Oxford, 1833, pp. 44ff.

৭. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith,* op.cit., p. 36.

৮. গ্রন্থের নামগুলো বাংলা অক্ষরে সঠিকভাবে রূপান্তর করা কঠিন, এ কারণে টি. সুজুকি যেভাবে গ্রন্থের নাম লিখেছেন সেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (*Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op.cit., p. 35-37)।

৯. *Taranath's History of Buddhism in India*, op. cit., p. 391.

১০. প্রসূন বসু (নির্বাহী সম্পাদক), *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১পৃ. : ৪; রত্না বসু '*খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর*' অসম্পূর্ণ নাটক হিসেবে অভিহিত করেছেন।

১১. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, পৃ. ৩১-৩২।

১২. *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p.391.

১৩. *Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka*, op. cit., p. 44f.

১৪. J. Takakusu (trans.), *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago by I-Tsing,* Motilal Baranasidass, Delhi, 1966, pp. 152, 165; *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p.391.

১৫. E. B. Cowell, *Asvaghosa's Buddhacarita*, Sacred Books of the East, Vol. XLVI, p. 227; *The Buddhacarita or Act of the Buddha*, op. cit., p. vi; Patrick Olivelle, *Life of The Buddha by Asvaghosa*, New York University Press, JIC Foundation, New York 2008, p. see introduction; মুণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *বুদ্ধচরিত*, ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ভূমিকা।

১৬. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., pp. vi.

১৭. A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Motilal Banarasidass Publishers, Delhi 2001 (reprint), p. 56; M. Winternitz, *History of Indian Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd, Delhi, 1991 (3rd ed.), Vol. ii.,p. 258; G. K. Nariman, *Literary History of Sanskrit Buddhism*, Indological Book House, Varanasi, 1973, p. 30-32; Patrick Olivelle, *Life of the Buddha by Asvaghosa*, New York University Press, 2008, p. introduction.

১৮. S. Beal, *Buddhist Literature in China*, Asian Educational Services, New Delhi, 1999, p. 97-98.

১৯. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, ১৯৮৯ (তৃতীয় সংস্করণ), ভূমিকা (শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য রচিত) পৃ. : ১৫; G. K. Nariman, *Literary History of Sanskrit Buddhism*, Indological Book House, Varanasi, 1973, p. 30; *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৫; *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. : ৬৫-৬৬।

২০. প্রসূন বসু (নির্বাহী সম্পাদক), *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ নং খণ্ড, ১৯৮০, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, পৃ. ১৮৫।

২১. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., pp. xii-xliv; *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., p.56; *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 258; *Life of the Buddha by Asvaghosa*, op. cit., p. introduction; *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, pp. 34-35; *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫।

২২. H. Luders, Bruchstucke buddhistscher Dramen, Berlin : NGGW, 1911, p. 11; cf. *The Buddhacarita of Act of the Buddha*, op.cit., pp. xx-xxi.

২৩. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., pp. xx-xxi.

২৪. *History of Indian Literature*, op. cit., vol. ii., p. 266; *Life of the Buddha by Asvaghosa*, op. cit., p. introduction.

২৫. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, ১পৃ. : ১।

২৬. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. : ৬৬; *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১-৩২।

২৭. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. : ২; *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

২৮. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. : ১-২।

২৯. A. K. Warder, *Indian Kavya Literature*, Motilala Baranasidass, Delhi, 1974, p. 178; B. C. Law, 'Asvaghosa', *Encyclopaedia of Buddhism*, Ceylon : Governor Press, 1967, p. 292-299; foortnote 28.

৩০. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৩১. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. : ৬৭।

৩২. *Life of the Buddha by Asvaghosa*, op. cit., p. introduction; *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., pp. 56ff; *History of Indian Literature*, op. cit., p. 266-267; *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op. cit., pp. xxiiff.

৩৩. সুমন কান্তি বড়ুয়া গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

৩৪. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, pp. 329-332.

৩৫. *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago by I-Tsing*, op. cit., pp. 165-166.

৩৬. M. Anesaki, 'Asvaghosa', *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 2, Charles Scribner's Sons, New York, 1988, p. 159.

৩৭. *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., p. 56; cf. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 267, footnote 2.

৩৮. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op. cit., p. xxiii.

৩৯. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 267.

৪০. H. Luders, *Bruchstucke der Kalpanamanditika des Kumaralata*, Leipzing 1826, pp. 19-20; cf. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 267, footnote 2. এইচ. লুডার্সের অভিমত, *"Asvaghosa did actually write a wok entitled Sutralankara, which was not translated into Chinese, but soon got lost, and was subsequently*

confused with the Kalpanamanditika, which was known by the similar sounding title Chuang-yen-lan=Alamkarasastra."

৪১. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 267.

৪২. cf. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 267, footnote 3.

৪৩. Thomas Watters, *On Yuang Chwang;s Travel in India*, London Royal Asiatic Society, London 1904, vol. ii, p. 302.

৪৪. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, pp. 37-38.

৪৫. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, p. 315.

৪৬. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, p. 330.

৪৭. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

৪৮. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।

৪৯. E. B. Cowel, *Buddhacarita*, SBE Series, 1983, Vol. xliv, p. ix-xiv;

৫০. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., pp. 265-266.

৫১. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, pp. 39.

৫২. 'Asvaghosa', *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, op. cit., Vol. 2, p. 159f.

৫৩. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., pp. xxii.

৫৪. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১; *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op. cit., p. xxii.

৫৫. *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p.132.

৫৬. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

৫৭. *Bibliotheca Buddhica,* vol. xv., St. Petersburg, 1913.

৫৮. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৫৯. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., pp. xxii.

৬০. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 266.

৬১. *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., p. 56-57.

৬২. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৬৩. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op. cit., p. 33f.

৬৪. *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

৬৫. S. Levi, *JA*, 1908, vol. vii, p. 70f.

৬৬. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, p. 40.

৬৭. জে. তাকাকুসু এবং এম. উন্টারনীট্স এর মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি সম্পর্কে মৌখিকভাবে এবং পত্রের মাধ্যমে নানাভাবে আলোচনা হয়। চৈনিক বৌদ্ধ সাহিত্য গবেষক জে. তাকাকুসু উন্টারনীটস্কে পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি জ্ঞাত করেন। বিস্তারিত : *History of Indian Literature,* vol. ii., op.cit., p. 361.

৬৮. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 361.

৬৯. Kimura, *Himayama and Mahayana*, Motilal Baranasidass, Delhi, 1927, p. 41.

৭০. S. N. Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, vol. 1, p. 129; Y. Sogen, System of Buddhistic Thought, p. 252; K. J. Saunders, *Epochs in Buddhist History*, p. 97.

৭১. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op. cit., p. 33f.

৭২. *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p. 392-393.

৭৩. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op. cit., p. xxiiin.

৭৪. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. : ৭১।

৭৫. *Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka*, op. cit., pp. 45f.

৭৬. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op. cit., p. 33.

৭৭. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 222.

৭৮. *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১-৭২।

৭৯. *cf.Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., pp. xxii.

৮০. *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p.132, fn. 15.

৮১. পঞ্চগতি : নিরয়, তির্যকযোনি, প্রেতলোক, মুনষ্যলোক, দেবলোক। এর সাথে অসুরলোক যোগ করলে ষড়গতি হয়।

৮২. *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p.131.

৮৩. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 270-271.

৮৪. *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago by I-Tsing*, op. cit., pp. 156-57.

৮৫. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 271.

৮৬. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 270.

৮৭. *History of Indian Literature*, vol. ii., op.cit., p. 271; *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit, p. 40.

৮৮. *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago by I-Tsing*, op. cit., pp. 157.

৮৯. *Taranath's History of Buddhism in India*, op.cit., p.391.

৯০. *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, op.cit., pp. xiv.

৯১. *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., p. 56-8.

তৃতীয় অধ্যায়

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস অন্বেষণ

১. ভূমিকা

ইতঃপূর্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষ সাহিত্যের নানা অঙ্গনে সদম্ভে বিচরণ করেছেন এবং রচনা করেছেন নানা শ্রেণির কালজয়ী গ্রন্থ। সাধারণত, গ্রন্থের গুণগত মান এবং লেখকের সফলতা নির্ভর করে অবলম্বনকৃত বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার উপর। যে গ্রন্থ যত বড় মহৎ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত হয় সেই গ্রন্থ ততবেশি ঋদ্ধ হয়। মূলত বিষয়বস্তুর কারণেই গ্রন্থ পাঠক সমাজে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে থাকে। এই অধ্যায়ে, বিশেষত অশ্বঘোষের বিতর্কমুক্ত গ্রন্থসমূহ এবং বিতর্কযুক্ত কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস সমীক্ষা করা হবে। কারণ অশ্বঘোষের কৃতিত্ব ও অবদান পরিমাপের জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২. অশ্বঘোষের বিতর্কমুক্ত সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস

দ্বিতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে বহু গ্রন্থের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন উৎসে বর্ণিত সকল গ্রন্থ অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা কি না, তা নিয়ে নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক রয়েছে। গবেষকগণ বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্রপ্রকরণ নাটক অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করছেন। এই গ্রন্থগুলো সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজে কোনো বিতর্ক না থাকলেও অন্যান্য গ্রন্থগুলো নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক পরিলক্ষিত হয়। এই অনুচ্ছেদে পর্যালোচনাপূর্বক অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা তথা বিতর্কমুক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস উন্মোচন করা হবে।

২.১. বুদ্ধচরিত

২.১.১. বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি, বুদ্ধচরিত কাব্যের যে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মাত্র ১৭টি সর্গ রয়েছে। তবে ১৭টি সর্গের মধ্যে গবেষকগণ প্রথম সর্গ থেকে চতুর্দশ সর্গের ৫১ নং শ্লোক পর্যন্ত অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করলেও চতুর্দশ সর্গের ৫২ নং শ্লোক থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেন না। কিন্তু বুদ্ধচরিতের যে তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায় তাতে ২৮ সর্গ রয়েছে এবং জন্ম হতে প্রথম মহাসঙ্গীতি এবং সম্রাট অশোকের সময়কাল পর্যন্ত বুদ্ধের জীবন ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। এ কারণে পণ্ডিতগণ মূল সংস্কৃত গ্রন্থটি ২৮টি সর্গে বিভক্ত ছিল বলে ধারণা করেন। বর্তমানে সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার সিরিজে যে বুদ্ধচরিত কাব্যটি পাওয়া যায় তাতে মাত্র ১৪টি সর্গ প্রকাশ করা হয়েছে। সর্গগুলো হলো : ভগবৎপ্রসূতি, অন্তপুরঃবিহারঃ, সংবেগোৎপত্তিঃ, স্ত্রীবিঘাতনঃ, অভিনিষ্ক্রমণম্, ছন্দকনিবর্ত্তনঃ, তপোবনপ্রবেশঃ, অন্তঃপুরবিলাপঃ, কুমারান্বেষণঃ, শ্রেণ্যাভিগমনঃ, কামবিগর্হণম্, অরাড়দর্শনম্, মারবিজয়ঃ এবং বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিঃ। নিম্নে বুদ্ধচরিত কাব্যের[১] বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হলো :

প্রথম সর্গ : 'ভগবৎপ্রসূতি' নামক প্রথম সর্গে কাব্যের নায়ক সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। কপিলাবস্তু নামক শাক্যদের রাজ্যে ইক্ষ্বাকুবংশের সন্তান রাজা শুদ্ধোদন রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন সর্বগুণের আশ্রয় স্বরূপ এবং প্রজাপ্রিয়। তাঁর মায়া দেবী নামে পৃথিবীর মতো গৌরবময়ী এবং স্বভাবে ও সৌন্দর্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মতো এক মহিষী ছিলেন। গর্ভধারণের পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, মেঘের মধ্যে যেমন চাঁদ প্রবেশ করে তেমনি এক শ্বেতহস্তী তাঁর দেহে প্রবেশ করছে। অত:পর যথাসময়ে তিনি গর্ভধারণ পূর্বক গর্ভপূর্ণতা লাভ করলেন। প্রসবসম্ভবা রানীর দেবকাননতুল্য সুন্দর লুম্বিনী বনে গমনের সাধ জাগে। রানীর ইচ্ছা পূর্ণ এবং মানসিক প্রীতি লাভের জন্য রাজা বন গমনের ব্যবস্থা করলেন। লুম্বিনী বনে রানী এক অত্যন্ত দীপ্ত এবং চাঁদের ন্যায় নয়ন ভোলানো পুত্র সন্তান প্রসব

করলেন। তাঁর জন্মের সময় পৃথিবীতে নানা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হলো। নিমিত্তগুলো বিচারের জন্য রাজ্যের পাণ্ডিত্য, স্বভাব ও বাক্‌পুটতায় বিখ্যাত ব্রাহ্মণদের ডাকা হলো। তাঁরা লক্ষণগুলো বিচার-বিশ্লেষণ করে বললেন, 'এই পুত্র মহাজ্ঞানী ঋষি হবেন নতুবা অতুল ঐশ্বর্য লাভ করে রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন।' কিন্ত মহর্ষি অসিত তপোবলে জানতে পারলেন জগতে জ্ঞানসূর্য উদিত হয়েছে। তিনি রাজপুত্রকে দর্শন করে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ ! এই পুত্র মহাজ্ঞানী ঋষি হবেন।' রাজা শুদ্ধোদন ব্রাহ্মণদের যথাপোযুক্ত সৎকার করলেন। অতঃপর, ইন্দ্র যেমন দেবগণের অর্চিত হয়ে স্বর্গে গমন করেন, তেমনি রাজাও পৌরজনের অভ্যর্থনা লাভ করে পুত্র-স্বজন নিয়ে নগরে প্রবেশ করলেন।

দ্বিতীয় সর্গ : 'অন্তপুরঃবিহারঃ' নামক দ্বিতীয় সর্গে রাজকুমার সিদ্ধার্থের রাজঅন্তঃপুরের জীবন আলোচিত হয়েছে। পুত্রের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে যেন রাজপ্রাসাদে লক্ষ্মীর আগমন ঘটল। রাজা ধন-রত্ন-মিত্রে দিনে দিনে সমৃদ্ধ হতে লাগলেন। রাজা শুদ্ধোদনের সর্ব বিষয়ে সিদ্ধি ঘটল বলে পুত্রের নাম রাখলেন 'সর্বার্থসিদ্ধ'। পুত্রের দেবর্ষির মতো প্রভাব দেখে আনন্দ সংবরণ করতে অক্ষম হয়ে রানী মায়া দেবী স্বর্গারোহণ করলেন। কুমার-বয়স পার হবার পর যথাকালে তাঁর উপনয়ন-সংস্কার হলো। রাজকুমার অল্প দিনের মধ্যে আপন বংশের অনুরূপ বহু বিদ্যার অধিকারী হলেন। কিন্তু তাঁর ভবিষ্যত লক্ষ্য হবে মুক্তি - ঋষি অসিতের এই বাণী রাজার মনকে দুঃখ ভারাক্রান্ত করে রাখলেন। পুত্রকে সংসারী করার নিমিত্ত তিনি নারীজাতির মধ্যে লক্ষ্মীতুল্য যশোধরাকে পুত্রবধূ করলেন। ইন্দ্র যেমন শচীর সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করেন, পরম সৌন্দর্যে ভাস্বর সনৎকুমার-তুল্য রাজকুমার সিদ্ধার্থও বিবাহের পর যশোধরার সঙ্গে সেরকম আনন্দ ভোগ করতে লাগলেন। মনে উদ্বেগ জাগায় এমন বা প্রতিকুল বিষয় যাতে দর্শন না করে, সেজন্য তিনি রাজকুমারকে প্রাসাদে কামকলায় পণ্ডিত, রতিনিপুণ রূপ যৌবন সম্পন্ন সুত-মিত রমণী পরিবেষ্ঠিত করে রাখলেন। রাজা নিজেও সন্তানের ভাবী কল্যাণের কথা চিন্তা করে পাপকর্ম থেকে বিরত রইলেন। পুত্রের দীর্ঘায়ু কামনায় 'আঙ্গিরস'-অধিদেবতাযুক্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রের অর্চনা করলেন। যথাকালে যশোধরা 'রাহুল' নামে এক পুত্র সন্তান প্রসব করলেন।

সন্তানের আকর্ষণে পুত্র বনে গমন করবেন না - এই ভেবে রাজা আশ্বস্ত হয়ে নানা পূণ্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন।

তৃতীয় সর্গ : 'সংবেগোৎপত্তিঃ' নামক তৃতীয় সর্গে সিদ্ধার্থের নগর ভ্রমণ এবং নিমত্তি দর্শনের কথা বর্ণিত হয়েছে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে গিয়ে প্রথম দিন দেখলেন জরা গ্রস্থ ব্যক্তি, দ্বিতীয় দিন দেখলেন ব্যাধি গ্রস্থ ব্যক্তি, তৃতীয় দিন দেখলেন শবদেহ এবং উপলব্ধি করলেন মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দুঃখের আধার জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর কথা। সংবেগ উৎপন্ন হলো সিদ্ধার্থের চিত্তে।

চতুর্থ সর্গ : 'স্ত্রীবিঘাতনঃ' নামক চতুর্থ সর্গে রাজকুমার সিদ্ধার্থের সংবেগ দূরীকরণে প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হয়েছে। জরা, ব্যাধি এবং মৃতদেহ দর্শনের পর সিদ্ধার্থের মন বিষন্নতায় ভরে যায়। ছলা-কলায় পূর্ণ, ভাবগ্রহণে দক্ষ রমণীরা নানা কৌশলে সিদ্ধার্থের সংবেগ দূরীকরণের চেষ্টা করতে লাগলো। কোনো কোনো নারী মদমত্ত হয়ে তাদের কঠিন ও পরিপুষ্ট সংহত ও উন্নত স্তন দিয়ে কুমারকে স্পর্শ করলো। কোনো কোনো মিথ্যে পদস্খলনের অভিনয় করে তাঁকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করল। কেউ কেউ নীল শাড়ী শিথিল করে কোমরের কাঞ্চিমালা ঈষৎ প্রকাশিত করতে লাগল। কেউ কেউ স্বর্ণ কলসের মতো স্তনসমূহ দেখিয়ে আম্রশাখায় ঝুলতে লাগল। কিন্তু কুমারের ইন্দ্রিয়সমূহ ছিল ধৈর্যের আবরণে সুরক্ষিত। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর ভয়ঙ্কর পরিণতি উপলব্ধিকারী দৃঢ় সংকল্পযুক্ত ও কামাশ্রয়-বিনাশক বাক্যে রমণীদের সকল প্রচেষ্টা শীতল হয়ে গেল। ব্যর্থভূষণ ও মাল্যধারিনী রমণীগণ কলা-নৈপুণ্য ও প্রণয় নিষ্ফল হওয়ায় নিজেদের অন্তরেই কামনা-বাসনাকে নিগৃহীত করল। পুরোহিত পুত্র উদায়ী বহু যুক্তি দিয়ে বন্ধু সিদ্ধার্থকে কামের সেবায় প্ররোচিত করলেন। সিদ্ধার্থ কামের অনর্থ উপলব্ধি করে সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং নারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলেন।

পঞ্চম সর্গ : 'অভিনিষ্ক্রমণম্' নামক পঞ্চম সর্গে গৃহত্যাগের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ভাবাবেগে বিষণ্ন সিদ্ধার্থ শান্তির প্রত্যাশায় রাজ-অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিপুত্রদের সঙ্গে বনভূমি দর্শনে গেলেন। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে

নেমে জগতের জন্ম-মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে কাতর হয়ে বললেন, 'এ সংসার প্রকৃতই দুঃখের।' অন্তরে একাগ্রতা লাভের ইচ্ছায় অনুগামী বন্ধুদের নিবৃত্ত করে জম্বু বৃক্ষের মূলে ধ্যানে সমাসীন পূর্বক বিষয়-বাসনা ও মনোবেদনা থেকে মুক্ত হয়ে স্থিরতা লাভ করলেন। সেখানে দেখলেন সন্ন্যাস ব্রতধারী এক শান্ত সৌম্য পুরুষ। রাজকুমার তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন, 'জন্ম-মৃত্যুতে ভীত হয়ে মুক্তির জন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করেছি, আমার-আসক্তি-দোষ দূরীভূত হয়েছে। নশ্বর জগতে মুক্তিকামী হয়ে আমি মঙ্গলময় অক্ষয় পদের সন্ধান করছি।' সন্ন্যাসীর নিকট ধর্মজ্ঞান লাভ করে রাজকুমার গৃহত্যাগের সংকল্প করে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন এবং পিতার নিকট নিবেদন করলেন, 'হে নরদেব ! প্রীতিভরে আমাকে অনুমতি দিন। আমি মোক্ষলাভের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করব। বিচ্ছেদ তো একদিন হবেই।' পিতা শেষ প্রচেষ্টা স্বরূপ উপদেশ দিলেন, 'যৌবনের সুখ উপভোগ করার পরেই মানুষের তপোবনে প্রবেশ রমণীয়।' উত্তরে কুমার বললেন, 'হে রাজন ! যদি চারটি বিষয়ে আপনি আমার রক্ষক হন তবে তপোবনে যাব না। আমার জীবনের মরণ হবে না, রোগ আমার স্বাস্থ্য হরণ করবে না, জরা আমার যৌবন ক্ষয় করবে না এবং বিপদ আমার সম্পত্তি নষ্ট করবে না।' পিতা এই অসম্ভব চাহিদা পূরণে অক্ষম হয়ে শোকে মহলে প্রবেশ করলেন। 'জন্ম-মৃত্যুর পার না দেখে আমি কপিলাবস্তু নগরে প্রবেশ করবো না' - এই সিংহনাদ করে কুমার নি:শঙ্ক চিত্তে সারথী ছন্দককে নিয়ে অশ্ব কন্থকে আরোহণ করে গৃহত্যাগ করলেন।

ষষ্ঠ সর্গ : 'ছন্দকনিবর্ত্তনঃ' নামক ষষ্ঠ সর্গে গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ কর্তৃক সারথী ছন্দককে বিসর্জনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বন গমনে অভিলাষী অগ্নির মতো দীপ্তিমান নরশ্রেষ্ঠ দুঃখের আকর জন্ম-মৃত্যুর আতুরঘর সন্ধানের নিমিত্ত অশ্বারোহণ করে ভার্গব মুনির আশ্রমে উপনীত হলেন। বিগলিত হৃদয়ে সারথী ছন্দক এবং অশ্ব কন্থককে বিদায় দিয়ে পরিধান করলেন কাষায় বস্ত্র। ছন্দক কন্থককে নিয়ে ফিরে গেলেন রাজপ্রাসাদে। গৈরিকধারী, ধীর, কীর্তিমান মহাত্মা সান্ধ্যমেঘপরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় যেইপথে আশ্রম সেই পথে যাত্রা করলেন।

সপ্তম সর্গ : 'তপোবনপ্রবেশঃ' নামক সপ্তম সর্গে রাজকুমার সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস বেশে তপোবনে প্রবেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। তপোবনে প্রবেশ করে তিনি বহু সন্ন্যাসীর তপশ্চর্যা দেখলেন। তাঁরা জানালেন, 'স্বর্গ তপস্যার লক্ষ্য, দুঃখ সহনই ধর্মের মূল উদ্দেশ্য।' সিদ্ধার্থ তুষ্ট হলেন না তাঁদের তপশ্চর্যা দেখে এবং তপশ্চর্যার উদ্দেশ্য শুনে। কারণ তাঁর অভিলাষ দুঃখদায়ী পুনর্জন্ম ক্ষয় করা। এক ভস্মশায়ী দীর্ঘদেহী ব্রাহ্মণ তপস্বী তাঁকে অরাড় মুনির নিকট যেতে উপদেশ দিলেন। তিনি সেই পথে যাত্রা করলেন।

অষ্টম সর্গ : 'অন্তঃপুরবিলাপঃ' নামক এই সর্গে সারথী ছন্দকের নিকট রাজকুমার সিদ্ধার্থের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনে রাজঅন্তঃপুরে সৃষ্ট বিরহ-শোকের কথা বর্ণিত হয়েছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজকুমারকে তপোবনে বিদায় দিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সারথী ছন্দক অশ্ব কন্থককে নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজকুমারের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা পরিজ্ঞাত করলেন। যশোধরা শোকে আত্মহারা, গৌতমী মুহ্যমান, রাজা শুদ্ধোধন পূজাগৃহ থেকে বের হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। সর্বত্রই শোকের ছায়া। মন্ত্রিগণ এবং রাজপুরোহিত রাজাকে ঋষি অসিতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রবোধ দিলেন। অবশেষে সবার সঙ্গে মন্ত্রণা করে স্থির করা হলো রাজকুমারকে ফিরিয়ে আনার। সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজকুমারকে ফিরিয়ে আনার জন্য মন্ত্রী এবং রাজপুরোহিত যাত্রা করলেন ঋষি ভার্গবের আশ্রমের দিকে।

নবম সর্গ : 'কুমারান্বেষণঃ' শিরোনাম শীর্ষক এই সর্গে অন্বেষণ পূর্বক কুমারকে রাজ প্রাসাদে ফিরিয়ে আনার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কুমারকে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজার আদেশে মন্ত্রী এবং রাজপুরোহিত যথাসময়ে ভার্গবমুনির আশ্রমে উপস্থিত হলেন। আশ্রমে গিয়ে তাঁরা জানতে পারলেন কুমার ঋষি অরাড় কালামের আশ্রমে গমন করেছেন। মন্ত্রী এবং পুরোহিতও সেই পথে গমন করে সিদ্ধার্থকে বৃক্ষমূলে ধ্যানরত দেখতে পেলেন। পুরোহিত পরম শ্রদ্ধা এবং স্নেহে তাঁর এবং মহারাজের বক্তব্য নিবেদন করলেন। কুমার প্রত্যুত্তরে বললেন, 'অগ্নিময় গৃহ থেকে নির্গত হয়ে তাতে পুনঃ প্রবেশ করে কে?' মন্ত্রী কুমারের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি দিলে কুমার পুনরায় বললেন, 'বরং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব তবুও গৃহে ফিরব না।' কুমারের দৃঢ়তার কাছে নতি স্বীকার করে মন্ত্রী এবং পুরোহিত ব্যর্থ মনোরথে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

Dhaka University Institutional Repository

দশম সর্গ : 'শ্রেণ্যাভিগমনঃ' নামক দশম সর্গে সন্ন্যাস বেশী সিদ্ধার্থের সঙ্গে মগধরাজ শ্রেণ্য বা বিম্বিসারের সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মন্ত্রী ও পুরোহিতকে বিদায় দিয়ে ব্রহ্মা যেমন সর্গে প্রবেশ করে তেমনি শান্তচিত্ত রাজকুমার রাজগৃহে প্রবেশ করলেন। স্থায়ী ব্রতী শিবের তুল্য কুমারের গাম্ভীর্য, দৈহিক সৌন্দর্য, দীপ্তি দেখে রাজগৃহের মানুষ ভীষণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পূজা-অর্চনা করতে লাগলেন। দীপ্ত পুরুষের সংবাদ রটল দিকে দিকে। নৃপতি শ্রেণ্য বিম্বিসার পাণ্ডব পর্বতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বন্ধুভাবে রাজ্যের অর্ধেক তাঁকে দিতে চাইলেন। তিনি বহু যুক্তি দিলেন অকাল সন্ন্যাসের বিপক্ষে। কিন্তু কুমার বিচিত্র শিখর মণ্ডিত কৈলাস পর্বতের মতোই অবিচল রইলেন।

একাদশ সর্গ : 'কামবিগর্হণম্' নামক একাদশ সর্গে সিদ্ধার্থের কামনিন্দার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মগধরাজ বিম্বিসার রাজকুমার সিদ্ধার্থকে বিষয়-ভোগে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলে কুমার তাঁকে বলেন, 'আমি জন্ম ও মৃত্যু ভয় অবগত হয়ে মুক্তির ইচ্ছায় প্রথমেই অমঙ্গলের কারণ কামনাগুলোকে এবং অশ্রুসিক্ত প্রিয়জনকে ত্যাগ করে এই ধর্ম আশ্রয় করেছি।' এরূপ বলে তিনি মগধরাজ বিম্বসারকে সুখ-দুঃখের বিশ্লেষণ করলেন, যজ্ঞের সমালোচনা করলেন এবং নানা দৃষ্টান্ত তুলে দেখালেন বিষয়ভোগের দ্বারা ভোগবাসনার তৃপ্তি হয় না। তিনি প্রবৃত্তিমার্গের দোষ দেখিয়ে পুনরায় বললেন, 'আমি অরাড় মুনির দর্শন লাভের জন্য এখানে এসেছি।' সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে শ্রেণ্য বিম্বিসার বললেন, 'আপনি যখন সিদ্ধিলাভ করবেন তখন আমার প্রতি যেন কৃপা করেন।' 'তথাস্তু' বলে সিদ্ধার্থ উঠলেন অরাড় মুনির আশ্রমে যাত্রা করলেন।

দ্বাদশ সর্গ : 'অরাড়দর্শনম্' নামক দ্বাদশ সর্গে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ও অরাড় মুনির সাক্ষাৎ, তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সিদ্ধার্থ অরাড় মুনির আশ্রমে এলেন। মুনি তাঁকে আনন্দ চিত্তে স্বাগতম্ জানালেন। কুমার মুনির নিকট জানতে চাইলেন, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়। অরাড় সাংখ্যদর্শনের ভিত্তিতে বস্তুর স্বরূপ, যুক্তি এবং যোগ সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন। সিদ্ধার্থ তাতে তুষ্ট হলেন না। উৎকৃষ্ট তত্ত্বের জন্য তিনি পুনরায় মুনি উদ্রকের আশ্রমে গেলেন। উদ্রক

Dhaka University Institutional Repository

মুনির আত্মবাদে আসক্তি দেখে সেখান থেকে সিদ্ধার্থ পুনরায় গয়ার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে গিয়ে ধ্যানমগ্ন হলেন। পাঁচজন তপস্বী তাঁর সেবায় এগিয়ে এলেন। ছয় বছর উপবাস বিধি পালন করে দেহ অস্থিচর্মসার হলো। সহসা উপলব্ধি করলেন, বৃথা এই তনুক্ষয়। সুস্থ প্রসন্নচিত্ত পুরুষই একাগ্রতা লাভ করেন। ধীরে ধীরে উঠে এলেন নদীর তীর থেকে। গোপরাজকন্যা নন্দবালা দেবপ্রেরিত হয়ে সেখানে পায়েস নিয়ে এলেন। তা আহার করে বলসঞ্চার হলো। তৎপর অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে গভীর ধ্যানে সমাসীন হলেন এই প্রতিজ্ঞা করে - 'যাবৎ কৃতার্থ না হই তাবৎ আসন থেকে উঠব না।'

ত্রয়োদশ সর্গ : 'মারবিজয়ঃ' নামক ত্রয়োদশ সর্গে সিদ্ধার্থ কর্তৃক মারবজিয়ের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রাজকুমার সিদ্ধার্থ ধ্যানাসনে উপবেশন করলেন। সিদ্ধার্থ ধ্যানাসনে বসলে জগৎ হৃষ্ট হলো, কিন্তু সদ্ধর্মের শত্রু মার ভীত হলেন। তিনি বললেন, 'মোক্ষধর্ম ত্যাগ করো।' সিদ্ধার্থ উঠলেন না দেখে সসৈন্য মার শর নিক্ষেপ করলেন। সিদ্ধার্থ অবিচল। চিন্তিত মার বিকটমূর্তি সশস্ত্র ভূতদের স্মরণ করলেন। তাদের তীব্র আক্রমণ আরম্ভ হলো। তবু সিদ্ধার্থ অবিচল। বিস্মিত মারের প্রতি তখন আকাশবাণী হলো - 'হে মার ! বৃথা শ্রম করো না। বোধির জন্য জন্মজন্মান্তরে ইনি যে পূণ্যকর্মরাশি পুঞ্জিত করেছেন আজ তার ফল লাভের দিন।' অবশেষে সিদ্ধার্থের দৃঢ়তার নিকট পরাজিত হয়ে বিষণ্ন মার প্রস্থান করলেন। অনুচররাও পলায়ন করল। পুষ্প বর্ষণ হলো আকাশ থেকে।

চতুর্দশ সর্গ : 'বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিঃ' নামক এই সর্গে রাজকুমার সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। মার ও তার সৈন্যদের পরাজিত করে সিদ্ধার্থ গৌতম দৃঢ় মনোবলের সঙ্গে গভীর ধ্যানে সমাসীন হলেন। ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে রাত্রির প্রথম প্রহরে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হলো। আপন জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ স্মরণ করতে করতে তিনি বুঝলেন - সংসার কদলী বৃক্ষের গর্ভের মতো অসার। জীবের উৎপত্তি এবং বিনাশ দর্শন করলেন অবাধে। দেখলেন সংসার চক্রে পরিভ্রমণ পূর্বক মানুষ কীভাবে দুঃখ ভোগ করছে। রাত্রির দ্বিতীয় যামে তিনি দিব্যচক্ষু লাভ করলেন। দিব্য নয়নে দেখলেন প্রাণীদের কর্মফল ভোগের দৃশ্য। রাত্রির তৃতীয় যামে জানতে পারলেন জন্ম-মৃত্যুর কারণ। রাত্রির চতুর্থ যামে তিনি সর্বজ্ঞতা লাভ করে জগতে খ্যাত হলেন 'বুদ্ধ' নামে।

২.১.২. বুদ্ধচরিত কাব্যে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্র

গৌতম বুদ্ধের মহৎ জীবনই বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। সে জীবন ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল এবং সর্বজন অনুকরণীয়। অশ্বঘোষ উপাদানের বহুত্বকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেই মহৎ জীবনের মহিমাকে বিকীর্ণ করেছে নানা পরিবেশে। সিদ্ধার্থের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনার জন্য তিনি বিস্তর আয়োজন করেছেন। তিনি তাঁকে দেখিয়েছেন প্রাচুর্যময় মনোরম প্রাসাদে ভোগ-ঐশ্বর্যরত, শিক্ষারত, কাম-কলায় দক্ষ সুত-মিত নারী পরিবেষ্টিত, জীবনের অবশ্যসম্ভাবী পরিণতি জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর মুখোমুখি, পথে পথে, কুসুমসজ্জিত বনে, তপশ্চর্যারত তপস্বীর সাহচর্যে, মগধরাজ-সান্নিধ্যে, কঠোর তপশ্চর্যায়, ভিক্ষারত, মারের সঙ্গে সংগ্রামরত এবং গভীর ধ্যানে সমাসীন হয়ে দুঃখ-মুক্তির পথ অন্বেষণে। শুধু তাই নয়, কাহিনিকে প্রাণবন্ত করার মানসে অশ্বঘোষ পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সমকালীন কাহিনিও সন্নিবেশ করেছেন বিচক্ষণতার সঙ্গে। বিশেষত, বিখ্যাত পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর উপমার ব্যবহার বুদ্ধচরিত কাব্যের মহত্ত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করছে। সারলা খোসলা [২] (Sarla Khosla) তাঁর 'Asvaghosa and His Times' শিরোনাম শীর্ষক গবেষণাকর্মে বুদ্ধচরিত গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত সেই সব পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো চমৎকারভাবে চিহ্নিত করেছেন। তন্মধ্যে বিখ্যাত চরিত্রগুলোর নাম নিম্নে অধ্যায় ও শ্লোক সংখ্যাসহ তুলে ধরা হলো :

অগস্ত্য (বু.চ. ৪/৭৩), অহল্যা (বু.চ. ৪/৭২), অজ (বু.চ. ৮/৭৯), অম্বরিষ (বু.চ. ৯/৬৯), অনরণ্য (বু.চ. ২/১৫), অঙ্গীরস (বু.চ. ৯/১০), অসিত (বু.চ. ১/৮০), অন্দিদেব (বু.চ. ৯/৭০), অশ্বিন (বু.চ. ৭/৭), অসুর (বু.চ.১১/১০), বলি (বু.চ. ৯/২০), ভরদ্বাজ (বু.চ. ৪/৭৪), ভৃগু (বু.চ. ৯/২৫), ভীষ্ম (বু.চ. ১১/১৮), ব্রহ্ম (বু.চ. ১০/১৯), বৃহস্পতি (বু.চ. ৪/৭৪, ৭/৪৩), দশরথ (বু.চ. ৮/৮১), ধ্রুব (বু.চ. ৯/২১), ধ্রুম (বু.চ. ৯/৭০), গৌতম মন্থাল (বু.চ. ৪/১৭), গৌতম মহাঋষি (বু.চ. ৪/১৮), গৌতম (অহল্যার স্বামী) (বু.চ. ৪/৭২), গঙ্গা (বু.চ. ৯/২৫০), ঘৃতাচী (বু.চ. বু.চ. ৯/৭০), অপ্সরা (বু.চ. ৪/২০), ইন্দ্র (বু.চ. ২/২৭, ৫/২২, ৭/৪৩), ঝয়ন্ত (বু.চ. ৯/৪), কার্তিকেয় (বু.চ. ১/৮৮), কালী (বু.চ. ৪/৭৬), কুর (বু.চ. ১০/৩১),

লোপামুদ্রা (বু.চ. ৪/৭৩), মাদ্রী (বু.চ. ৪/৭৯), মারুতী (বু.চ. ৪/৭৪), মনু (বু.চ. ২/১৬), মহাসুদর্শন (বু.চ. ৮/৬২), মান্ধা (বু.চ. ১১/১৩), মেখলা দণ্ডক (বু.চ. ১১/৩১), মেঘবত (বু.চ. ৫/২৭), নহুষ (বু.চ. ২/১১, ১১/১৪), পাণ্ডু পৃথু (বু.চ. ১/১০), পুরংদর (বু.চ. ১৩/৩৭), পার্বতী (বু.চ. ১৩/১৬), ঋষি শৃঙ্গ (বু.চ. ৪/১৯), রাম (পার্বতী (বু.চ. ১/৩৫), রোহিণী(বু.চ. ৪/৭৩), শচী (বু.চ. ২/২৭), শম্ভু (বু.চ. ১৩/১৬), শান্তনু (বু.চ.১৩/১২), সনৎকুমার (বু.চ. ৫/২৭), শক্র (৬/৬২), সঞ্জয় ৯ বু.চ. ৮/৭৭), শিবি (বু.চ. ১৪/৩০), সুন্দ (বু.চ. ১১/৩২), স্বয়ংভূ (বু.চ. ২২/৫১), উর্বশী (বু.চ. ৯/৮), পরাশর (বু.চ. ১২/৬৭), উগ্রায়ুধ (বু.চ. ১১/১৮), বামদেব (বু.চ.৯/৯), বাসব (বু.চ. ১৩/৯), বাসু (বু.চ. ৭/৭), বিশ্বমিত্র (বু.চ. ৪/২০), বশিষ্ট (বু.চ. ৪/৭৭), বিদেহ (বু.চ. ৮/৫), ব্যাস মুনি (বু.চ. ৪/১৬), যযাতি (বু.চ. ৪/৭৮)।

২.১.৩. বুদ্ধচরিত কাব্যের বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি

বুদ্ধচরিত কাব্যের বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কাব্যের সূচনা হয়েছে সিদ্ধার্থের জন্মকাহিনি দিয়ে। কিন্তু ঋষি অসিতের মহাবাণী আভাস দেয় যে, বোধিজ্ঞান তথা সর্বজ্ঞতা লাভই কাব্যের অভীপ্সা। দ্বিতীয় সর্গে সিদ্ধার্থের রাজকীয় ভোগ-ঐশ্বর্যে পূর্ণ প্রাসাদ জীবন, রূপবতী যশোধরার সঙ্গে বিবাহ এবং বিবাহোত্তর প্রেমময় জীবনাচার কাব্যের অভীপ্সার গতিরোধ করলেও তৃতীয় সর্গে সিদ্ধার্থ কর্তৃক জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যু দর্শন প্রভৃতি ঘটনা কাব্যের কাহিনিতে পুনরায় নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। চতুর্থ সর্গে কামনার ভাব জাগাতে দক্ষ রমণীদের প্রতি সিদ্ধার্থের অনুরাগ হীনতা এবং কামের সেবায় সিদ্ধার্থের বিতৃষ্ণা, পঞ্চম সর্গে গৈরিক বসনধারী শান্ত, সমাহিত সন্ন্যাসীর দর্শন সিদ্ধার্থের মনে গৃহত্যাগের উদ্বেগ সৃষ্টি করে। এই ঘটনা কাহিনিতে নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করে এবং কাহিনিকে বোধিজ্ঞান তথা বুদ্ধত্ব লাভের দিকে নিয়ে যাবার ইঙ্গিত বহন করে। ষষ্ঠ সর্গে গৃহত্যাগ এবং সপ্তম সর্গে তপোবনে নানা মুনির সঙ্গলাভ ও তপশ্চর্যা বুদ্ধত্ব লাভের সম্ভাবনাকে প্রোজ্জ্বল করে তোলে। অষ্টম সর্গে রাজপ্রাসাদের বিলাপ, নবম সর্গে রাজ আদেশে কুমারকে প্রাসাদে ফিরিয়ে আনার জন্য মন্ত্রী এবং পুরোহিত প্রেরণ এবং দশম সর্গে সিদ্ধার্থকে রাজা বিম্বিসারের রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান বুদ্ধত্ব

লাভের সম্ভাবনায় কিছুটা সন্দেহ উদ্রেক করলেও একাদশ সর্গে রাজা বিম্বিসারকে সিদ্ধার্থ কর্তৃক কামের অসারতা প্রতিপন্ন, দ্বাদশ সর্গে অরাড় মুনি ও রুদ্রক মুনির সাহচর্যে রাজকুমার সিদ্ধার্থের তপশ্চর্যা রাজকুমার সিদ্ধার্থে বুদ্ধত্ব লাভের বিষয়টি নিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যায়। ত্রয়োদশ সর্গে মার বিজয় এবং চতুর্দশ সর্গে মার বিজয়োত্তর বুদ্ধত্ব লাভের কাহিনি কাব্যের লক্ষ্য অর্জন ও সমাপ্তি নির্দেশ করে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, অশ্বঘোষ যে জীবনকে কাব্য রচনার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সেটা স্বয়ং বিরাট এবং এক ঐতিহাসিক মহৎ জীবন - বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহামানব এবং বিশ্ববন্ধু পুরুষ সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন-চরিত। ধর্মকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া - এই অর্জন এবং বিতরণই হচ্ছে অশ্বঘোষের কাব্যের ব্রত। বুদ্ধচরিতে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনিত্যতার সুর বাজে। সেই সুর ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল, নৈতিকতায় আদর্শে ভরপুর এবং বহুজনের হিতে প্রেরণাদীপ্ত। অশ্বঘোষ তাঁর বুদ্ধচরিত কাব্যে জন্ম থেকে বুদ্ধত্বলাভ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সিদ্ধার্থ গৌতম তথা গৌতম বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত ছন্দোবদ্ধ উচু সুরে বাঁধা পদাবলীতে বর্ণনা করেছেন, যা স্থান-কালকে পশ্চাতে রেখে অনন্তের আত্মীয় হয়ে উঠেছে।

২.১.৪. বুদ্ধচরিত কাব্যের উৎস

অশ্বঘোষের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িককালে রচিত বুদ্ধের কয়েকটি জীবন চরিত পাওয়া যায়। বিশেষত, মহাবস্তু এবং ললিতবিস্তর। তাছাড়া, মহাবর্গ, নিদানকথা, জাতক, অশোকাবদান, দিব্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থেও বুদ্ধের জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। অধিকন্তু *রামায়ণ, মহাভারত* এবং *পৌরাণিক* গ্রন্থেও বহু আদর্শ জীবনী পাওয়া যায়, যা জীবনী রচনায় অনুকরণীয়। অশ্বঘোষ *বুদ্ধচরিত* কাব্যে গ্রন্থটির উৎস সম্পর্কে কোনো প্রকার ইঙ্গিত প্রদান করেন নি। ফলে কাব্যটি রচনার জন্য তিনি *রামায়ণ, মহাভারতের* মতো মহাকাব্য অথবা ললিতবিস্তর, মহাবস্তু অথবা অন্য কোনো সাহিত্যকর্মের উপর নির্ভরশীল ছিলেন কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। এই অনুচ্ছেদে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের উৎস সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের কাহিনির বিন্যাস পদ্ধতি, চরিত্রসমূহ এবং বিষয়বস্তুর অর্ন্তনিহিত ভাব ললিতবিস্তর ও মহাবস্তু হতে ভিন্ন। ললিতবিস্তর[৩] এবং মহাবস্তু[৪] গ্রন্থদ্বয়ে অতিরঞ্জিত ভাবকল্পনা পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত, গ্রন্থদ্বয়ে বুদ্ধকে অতিমানবীয় সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, দর্শনের দিক থেকে গ্রন্থদ্বয়ে মহাযানী ভাবধারা অতীব প্রকট। পক্ষান্তরে বুদ্ধচরিতে মহাযানী ভাবধারা খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয় এবং পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত বিষয়বস্তুর আলোকেই বুদ্ধের জীবন কাহিনি বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে বুদ্ধের মানবীয় সত্তাই প্রকাশিত হয়েছে।

এম. উন্টারনীর্টস[৫] (M. Winternitz) ললিতবিস্তর গ্রন্থকে বুদ্ধচরিতে উৎস হিসেবে গণ্য করেন নি। তাঁর মতে, বর্তমানের ললিতবিস্তর অশ্বঘোষের সাহিত্য রচনার আদর্শরূপ হতে পারে না। বরং বলা যেতে পারে, ললিতবিস্তরে গ্রন্থিত গাঁথা, এপিসোডে বা উপকথাগুলো অশ্বঘোষের সাহিত্য রচনার উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। ললিতবিস্তর কখনই প্রকৃত বৌদ্ধ মহাকাব্য হতে পারে না যদিও এর মধ্যে মহাকাব্যিক গন্ধ আছে।

এ. বি. কীথ[৬] (A. B. Keith) বুদ্ধচরিত এবং ললিতাবিস্তর গ্রন্থদ্বয়ের মধ্যে বিস্তর বৈপরীত্য দেখতে পান। কিন্তু তিনি নিশ্চিত নন যে অশ্বঘোষের পূর্ব সময়ের তথাকথিত মিশ্র সংস্কৃতির গাথার সাথে ললিতবিস্তরের সংমিশ্রণ আছে কি না।

বুদ্ধচরিতে *রামায়ণ*, *মহাভারতসহ* বহু পৌরাণিক চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায় এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায়ও ক্ষেত্র বিশেষে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। অশ্বঘোষ জ্ঞানতাপস বাল্মীকিকে উচ্চাসন দেন এবং বুদ্ধচরিত কাব্যে তাঁকে 'আদিকবি' ও 'ধীমান' অভিধায় অভিহিত করেছেন।[৭] এ কারণে ধারণা করা হয় যে, অশ্বঘোষ বাল্মীকি দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। নিম্নে *রামায়ণ* ও *বুদ্ধচরিত* কাব্যে কিছু সাদৃশ্য[৮] বিষয় তুলে ধরা হলো :

- মহারাজা দশরথ বিলাপ করল, কাঁদল এবং পরিণামে পুত্র-বিচ্ছিন্নতায় মারা গেল। কবি

অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতে (বু. চ. ৮/৭৯) একই বিষয়ের অবতারণা করেছেন। রাজা শুদ্ধোধনও পুত্র-বিচ্ছিন্নতায় শোকে আচ্ছন্ন। রাজা দশরথের মতো তিনিও বিলাপ করেন (বু. চ. ৮/৮১)।

- সুমন্ত (Sumanta) রামকে ছাড়াই অযোধ্যা ফেরেন; সারথী ছন্দকও সিদ্ধার্থকে ছাড়াই কপিলাবস্তুতে ফেরেন। সুমন্ত এবং ছন্দক উভয়ের অনুভূতি আবেগ একই (বু. চ. ৬/৬৬-৬৮)। স্বামী সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগে স্ত্রী যশোধরা বিলাপ করেন; একইভাবে বনবাসী স্বামী রামের জন্য সীতা বিলাপ করেন।
- হনুমান রাবনের প্রাসাদে রাত্রিকালিন সময়ে প্রবেশ করে রাবনের স্ত্রীকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখা ছাড়াও নানাবিধ বেসামাল পরিস্থিতি অবলোকন করেন। একই পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখা যায় অশ্বঘোষের বর্ণিত রাতের দৃশ্যের যখন সিদ্ধার্থ কাম-কলায় পারদর্শী যৌন-আবেদময়ী নারীদের প্রাসাদ ছেড়ে গৃহত্যাগ করেন (বু. চ. ৫/৬১-৬৯)।

উপরোক্ত সাদৃশ্য বিচারে এ.বি. কীথ[৯] (A. B. Keith) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, রামায়ণ হলো অশ্বঘোষের ভাবনার উৎস। কিন্তু উপরোক্ত বিষয় রামায়ণের চেয়ে অশ্বঘোষের কাব্যে আরও আলংকারিকভাবে ফুটে উঠেছে।

বুদ্ধচরিতের দ্বাদশ সর্গে[১০] সিদ্ধার্থকে ঋষি অরাড় কালাম যে হিতোপদেশ দিয়েছেন, তার সাথে মহাভারতের সাংখ্যা দর্শনের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া, বুদ্ধচরিতের একটি শ্লোক[১১] : "মেঘগুলো যেমন মিলিত হয়ে আবার বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমার মতে প্রাণীদের মিলন-বিচ্ছেদও সেইরূপ।" মহাভারতেও একই ধরনের শ্লোক দেখা যায়। ক্ষেত্র বিশেষে সামান্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও রামায়ণ-মহাভারতকে বুদ্ধচরিতের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। কারণ বুদ্ধচরিত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনী নিয়ে রচিত, যেখানে সম্ভোগ ও শৃঙ্গার দু'ই যুগলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। তবে রামায়ণ এবং মহাভারতের বিষয়বস্তু আমাদের এই মহান লেখক ও কবিকে উদ্দীপনা

দিয়ে থাকবে, কারণ বুদ্ধচরিতে বর্ণিত চরিত্রসমূহে রামায়ণ, মহাভারতের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় এবং রামায়ণ-মহাভারতের বর্ণিত কাহিনির মতোই বুদ্ধচরিতের কাহিনিকে অশ্বঘোষ রচনাশৈলীর নিপুণতায় আকর্ষণীয় করে তুলতে পেরেছেন।

অপরদিকে, বুদ্ধচরিত, মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, নিদানকথা প্রভৃতি গ্রন্থের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যে, এসব গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু একই, অর্থাৎ শাক্যমুনির জীবন ও দর্শন। তবে, বুদ্ধচরিতের কাহিনিতে পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত বুদ্ধের জীবন-দর্শনের প্রভাব অধিক পরিস্ফুটিত। কারণ, পালি ত্রিপিটকের ন্যায় বুদ্ধচরিতেও বুদ্ধকে মানবীয় সত্তারূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে পালি ত্রিপিটকই অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের উৎস হিসেবে গণ্য করা যায়।

অশ্বঘোষ তাঁর কাব্যের নায়ক গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের অনুসারী। আপন জীবনে সেই ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল যেন তাঁর ব্রত। সম্ভোগ এবং শৃঙ্গার - এই দু'যুগলের বিরুদ্ধেই তাঁর সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। ফলে চিরকালের জন্য দুঃখের উচ্ছেদ যজ্ঞে ব্রতী নায়ককে যশোধরার দুঃখনিবেদন স্পর্শ করেনি।

২.১.৫. সমাজ জীবনে বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রভাব

চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং[১২] তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সময়কালে বুদ্ধচরিত কাব্যটি প্রাচীন ভারতের পাঁচটি বিভাগে এবং দক্ষিণ সমুদ্রের দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে পঠিত হতো। ইৎ সিং খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের দিকে ভারত ভ্রমণে এসেছিলেন। ইৎ সিং-এর সাক্ষ্য বুদ্ধচরিতের জনপ্রিয়তা যেমন প্রকাশ করে তেমনি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে বুদ্ধচরিত বিপুলভাবে পঠিত হওয়ার বিষয়টিও প্রকটিত করে। খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০ অব্দ থেকে বারশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত চর্যাপদে বুদ্ধের জীবনী নাটক আকারে উপস্থাপিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়। বিশেষত, বীণা পাদ[১৩] রচিত ১৭তম চর্যায় 'বুদ্ধ নাটক' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। চর্যাকার বীণাপাদ বলছেন, 'বুদ্ধ নাটক অভিনয় হচ্ছে।

বজ্রগুরু ও দেবী দু'জনে মিলিত হয়ে বুদ্ধদেবের জীবন নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে অভিনয় করছে।' ফলে চর্যাপদের রচনাকালেও বুদ্ধের জীবন-কাহিনি নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতো বলে ধারণা করা যায়। আধুনিককালেও বুদ্ধের জীবনী নিয়ে কাব্য, নাটক, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি নানা আঙ্গিকের সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। বিশেষত, এডুইন আরনল্ড (Edwin rnold) রচিত 'Light of Asia' এবং হারমেন হেস্‌সে (Hermann Hesse) রচিত 'সিদ্ধার্থ' গ্রন্থদ্বয় বিশ্বে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বুদ্ধের জীবন-দর্শনকে ভিত্তি করে বাংলায়ও প্রচুর সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে। আশা দাশ রচিত 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে বুদ্ধের জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে রচিত প্রচুর সাহিত্যকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৪] বুদ্ধের জীবন-দর্শন নিয়ে রচিত গদ্য সাহিত্যের মধ্যে অক্ষয় কুমার দত্তের 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নানাচিন্তা', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম', চারুচন্দ্র বসুর 'অশোক' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধের জীবন-দর্শন নিয়ে কাব্য রচনাকারী কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবীনচন্দ্র সেন, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, জীবনানন্দ দাস প্রমুখের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণযোগ্য। বুদ্ধের জীবন-দর্শন নিয়ে বাংলায় রচিত নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নটীর পূজা', 'চণ্ডালিকা', 'মালিনী', 'রাজা', 'অরূপরতন', 'শাপমোচন', গোপালচন্দ্র মজুমদারের 'যৌবনে যোগিনী', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'বুদ্ধদেব চরিত', কৃষ্ণবিহারী সেনের 'অশোকচরিত', শরচ্চন্দ্র সরকারের 'শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধদেবচরিত', ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'বিদুরথ', 'অশোক', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সিংহল বিজয়' এবং অসিত হালদারের 'কুনাল' প্রভৃতি প্রণিধানযোগ্য। উপর্যুক্ত গ্রন্থে বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত অংশ মূলত বুদ্ধচরিত কাব্যে বর্ণিত বুদ্ধের জীবনীর আলোকে রচিত।

শুধু সাহিত্যেই নয়, ভাস্কর্য শিল্পেও বুদ্ধচরিতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত গান্ধার ও মথুরা শিল্পকলায় এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সিদ্ধার্থের জন্ম, বিবাহ, নগর ভ্রমণ, গৃহত্যাগ, বুদ্ধত্বলাভ, ধর্ম প্রচার, মহাপরিনির্বাণ প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে, যা শিল্পকলার জগতে বিশেষ

স্থান দখল করে আছে। বুদ্ধের জীবনী নিয়ে অংকিত অজন্তা গুহার চিত্রকলা এখনো শিল্প ও চিত্রকলার জগতে বিস্ময় হিসেবে গণ্য করা হয়।

অতএব, উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ জীবনে বুদ্ধচরিত কাব্য অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

২.২. সৌন্দরনন্দ

২.২.১. সৌন্দরনন্দ কাব্যের বিষয়বস্তু

গ্রন্থটি কাব্যাকারে লেখা। গ্রন্থটি আঠারটি সর্গে বিভক্ত। সর্গগুলো হলো : কপিলাবস্তুবর্ণনো, রাজবর্ণনো, তথাগতবর্ণনো, ভার্যাযাচিতকো, নন্দপ্রব্রাজনো, ভার্যাবিলাপো, নন্দবিলাপো, স্ত্রীবিঘাতো, মদাপবাদো, স্বর্গনিদর্শনো, স্বর্গাপবাদো, প্রত্যবমর্শো, শীলেন্দ্রিয়জয়ো, আদিপ্রস্থানো, বিতর্কপ্রহানো, আর্যসত্যব্যাখ্যানো, সৌন্দরনন্দেহমৃতাধিগমো এবং আজ্ঞাব্যাকরণো। বুদ্ধের সৎভাই নন্দের দীক্ষা কাহিনিই কাব্যটির মূল আলোচ্য বিষয়। নন্দ ছিলেন অপূর্ব দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী। জন্মের পর জ্ঞাতিগণ আনন্দিত হয়েছিল বিধায় তাঁর নাম রাখা হয় নন্দ।[১৫] তাঁর দীক্ষা কাহিনী বর্ণিত হওয়ায় গ্রন্থটি সৌন্দরনন্দ নামে অভিহিত করা হয়। ভিন্নমতে, নন্দের হবু স্ত্রীর নাম ছিলো সুন্দরী। কবি তাঁর কাব্যের নামকরণ করেছেন এমনভাবে যাতে দু'টি নামই সূচিত হয়েছে।[১৬] অন্য ভাষায় বলা যায়, দুই সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি অঙ্কিত হওয়ায় কাব্যটিতে অনিন্দ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়। এ কারণে কাব্যটির নামকরণ করা হয় 'সৌন্দরনন্দ।' কাব্যটি মহাকাব্য ঢংয়ে লেখা এবং সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও গ্রন্থটিতে মহাকাব্যের প্রায় বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার সিরিজে প্রকাশিত গ্রন্থের আলোকে *সৌন্দরনন্দ* কাব্যের বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করা হলো :

প্রথম সর্গ : 'কপিলাবস্তুবর্ণনো' নামক প্রথম সর্গে ৬২ টি শ্লোকে কপিলাবস্তু নগরীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, কপিল নামক এক মুনি হিমালয়ের পাদদেশে এক মনোরম তপোবনে বসবাস করতেন। পুষ্প, ফল-মূলে সেই তপোবন ছিল সমৃদ্ধ। যে সকল মুনি-ঋষি সেখানে

বসবাস করতেন তাঁরা সকলেই ছিল শান্ত-দান্ত। জনজীবনে তাঁদের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইক্ষ্বাকুগণ সেখানে বসবাসের জন্য আগমন করলে কপিল মুনি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং কপিল মুনিকে তাঁরা গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। শাক্য বৃক্ষের নীচে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করতে থাকায় তাঁরা 'শাক্য' নামে পরিচিত হন। ক্রমে ব্রাহ্মণের গৌরবে, ক্ষত্রিয়ের শক্তিতে সেই তপোবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। কপিল মুনি নগরীর সীমানা নির্দেশপূর্বক শাক্য রাজকুমারদের নগর প্রতিষ্ঠা করতে বললেন। সুদৃশ্য নগর প্রতিষ্ঠা করা হলে সেই নগরীর নাম রাখা হয় কপিল মুনির নামে 'কপিলাবস্তু'। সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই নগরে রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয় এবং ক্রমে এক অজেয় রাজ্যে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় সর্গ : 'রাজবর্ণনো' নামক দ্বিতীয় সর্গে ৬৫টি শ্লোকে কপিলবস্তু রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদনের জীবন-কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, যথাকালে সেই রাজ্যের রাজপদে অধিষ্ঠিত হলেন শুদ্ধোদন। তিনি ছিলেন বহু শাস্ত্রে প্রাজ্ঞ, বিনয়ী এবং শৌর্যে-বীর্যে পরাক্রমশালী। তিনি ছিলেন প্রজাবৎসল এবং ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর পূণ্যবতী জ্যেষ্ঠ পত্নী অপরূপা মায়া দেবীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ পত্নীর গর্ভে জন্ম নিলেন নন্দ। অপরূপ দেহ-সৌন্দর্য্যের কারণে তাঁকে 'সুন্দরনন্দ' নামে ডাকা হতো। রাজা দুই পুত্রকে যথোচিত লালন-পালন করতে লাগলেন। তাঁদের রাজপুত্রের শিক্ষণীয় সকল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হলো। কিন্তু দুই রাজপুত্র ছিলেন পরস্পর বিপরীত স্বভাবের। সিদ্ধার্থ গৌতম ছিলেন ধীর, স্থির এবং ভোগ-বিলাসে অপ্রমত্ত। অপরদিকে নন্দ ছিলেন প্রমত্ত, ভোগ-বিলাসে মত্ত। মানবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি দেখে সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় এবং দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন।

তৃতীয় সর্গ : 'তথাগতবর্ণনো' শিরোনাম শীর্ষক তৃতীয় সর্গে ৪২টি শ্লোকে সিদ্ধার্থ তথা তথাগতের কঠোর সাধনা ও সিদ্ধি লাভের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, তিনি বনে মুনি ঋষিদের কঠোর তপস্যা অবলোকন করলেন। নিজেও কঠোর তপস্যায় রত হলেন। অরাড় মুনি এবং রুদ্রক মুনির সান্নিধ্যে তপশ্চর্যা করলেন। তিনি উপলব্ধি করলেন মুনিগণ শাস্ত্র ও বিধি অনুযায়ী

তপশ্চর্যা করছেন, কিন্তু তাঁরা বিষয়-তৃষ্ণায় পীড়িত। তখন তিনি সেই তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয়ে বোধি লাভের অভীপ্সায় কঠোর ধ্যানে মগ্ন হলেন। পর্বতরাজের মতো অচল দৃঢ়তায় তিনি ভয়ঙ্কর মারসৈন্যদের পরাজিত করলেন এবং বহু প্রত্যাশিত বোধিজ্ঞান লাভ করলেন। বোধি লাভের পর জগতের কল্যাণে বারাণসীতে লব্ধধর্মের চক্র আবর্তন করলেন। কাশী, গয়া ও গিরিব্রজে বহুজনকে দীক্ষা দিলেন। সূর্যের মতো গৌতম বিষয়-ভোগে আসক্ত বিচিত্র পথের উপাসক জনগণের অজ্ঞানান্ধকার দূর করলেন। গেলেন জন্মভূমি কপিলাবস্তু নগরীতে। রাজা পুত্রকে অভিনন্দন জানালেন। পুত্রের অতীন্দ্রিয় শক্তির পরিচয় পেয়ে রাজা দীক্ষিত হলেন, দীক্ষিত হলেন কপিলাবস্তুর অগণিত মানুষ। আনন্দে ও গৌরবে পূর্ণ হলো কপিলাবস্তু।

চতুর্থ সর্গ : 'ভার্যাযাচিতকো' নামক চতুর্থ সর্গে ৪৬টি শ্লোকে নন্দ ও স্ত্রী সুন্দরীর বিচিত্র বিলাস জীবন বর্ণনা করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, নন্দ ও সুন্দরী চক্রবাক-চক্রবাকীর মতোই রাজপ্রাসাদে প্রেমবিলাসে মত্ত। হবু স্ত্রীর সান্নিধ্যের জন্য তিনি ইন্দ্রের পূজোতেও মন দিতেন না, ধর্ম তো সেখানে তুচ্ছ। যেন তাঁরা প্রেমের দেবতা অনঙ্গ ও রতির লক্ষ্য স্থল, প্রমোদ ও আনন্দের একখানি নীড় এবং ভোগ ও তৃপ্তির একখানি পাত্র। একদিন ভিক্ষার জন্য প্রাসাদে এসে তথাগত নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভৃত্যের উদাসীনতায় ভিক্ষা লাভ না করে ফিরে গেলেন তথাগত। এক রমণীর মুখে এ খবর শুনে নন্দ স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তথাগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। নন্দ পথে দশবল বুদ্ধকে দেখলেন। তিনি ধীরে ধীরে পথ চলছেন, জনগণ চারিদিক থেকে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করছে।

পঞ্চম সর্গ : 'নন্দপ্রব্রাজনো' নামক পঞ্চম সর্গে ৫৩টি শ্লোকে নন্দের প্রব্রজ্যা-কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, রাজপথে ভক্তিবিহ্বল বিশাল জনস্রোত ভেদ করে তথাগত অগ্রসর হতে লাগলেন। নন্দ এসে তথাগতকে অভ্যর্থনা জানালেন। তথাগত ইঙ্গিতে জানালেন তাঁর ভিক্ষার প্রয়োজন নেই। তৎপর তিনি নন্দের হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দিয়ে নিয়ে গেলেন আশ্রমে ফিরে যেতে চাইলে তথাগত নন্দকে বললেন, 'জরার মতো সৌন্দর্য্যের শত্রু কেউ নেই, রোগের মতো সংকট নেই

এবং মৃত্যুর মতো বিপদ নেই। দুর্বল ব্যক্তি এই তিনটিকে বরণ করে। স্নেহের মতো বন্ধন নেই, কামনার মতো সর্বপ্লাবী স্রোত ধারা নেই এবং প্রেমাগ্নির মতো অগ্নি নেই। এই তিনিটি না থাকলে তুমি সুখের অধিকারী হতে (সৌন্দরনন্দ ৫/২৭,২৮)। এভাবে সংসারের অসারত্ব বুঝানোর পর তিনি আনন্দকে ডেকে নন্দকে প্রব্রজ্যা প্রদান করান। নন্দ দীক্ষিত হলেন তথাগতের ধর্মে।

ষষ্ঠ সর্গ : 'ভার্যাবিলাপো' নামক ষষ্ঠ সর্গে ৪৯টি শ্লোকে স্বামীর অদর্শনে সুন্দরীর উদ্বিগ্নতা ও বিলাপের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, স্বামীর অদর্শনে স্ত্রী যন্ত্রণায় অধীর ও বিমর্ষ হয়ে গেলেন। তাঁর ললাট বেদনায় ক্লিষ্ট, নিঃশ্বাসে মুখের প্রসাদন বিবর্ণ। সহচরীর মুখে নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা শুনে নানাভাবে আক্ষেপ করতে লাগলেন এবং প্রেমময় জীবনের সুখ-স্মৃতিগুলো স্মরণ করে করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলেন। অতঃপর, সহচরীদের শান্তনায় তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মনে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

সপ্তম সর্গ : 'নন্দবিলাপো' নামক সপ্তম সর্গে ৫২টি শ্লোকে নন্দের বিলাপ কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর নন্দের মনে অনুশোচনার অন্ত নেই। প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা স্মরণ করে তিনি বিষণ্ন হয়ে পড়ছিলেন। ধ্যানে বসেও স্ত্রীর চিন্তায় তাঁর চিত্ত ব্যাকুল এবং ইন্দ্রিয়ের অধীন। স্ত্রীর সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায় বিলাপ করতে করতে সিদ্ধান্ত নেন গৃহে ফিরে যাবার।

অষ্টম সর্গ : 'স্ত্রীবিঘাতো' নামক অষ্টম সর্গে ৬২টি শ্লোকে স্ত্রীর প্রতি নন্দের কামাসক্তির বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রব্রজিত হয়েও নন্দ স্ত্রীর প্রতি দারুণ আসক্ত ছিল এবং গৃহে ফিরে যাওয়ার জন্য উন্মুখ। তিনি তথাগতের এক শিষ্যকে বললেন, 'অরণ্য জীবনের আনন্দে আমার চিত্ত বিমুখ, তাই আমি গৃহে ফিরে যেতে চাই। রাজলক্ষ্মী থেকে বঞ্চিত হয়ে রাজা আনন্দ পান না, আমিও আমার প্রিয়াকে ছেড়ে কোনো তৃপ্তি পাই না (সৌন্দরনন্দ ৮/১৩)।' তখন শিষ্য তাঁকে বললেন, 'আপনি শুভ ও অশুভের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পান না; ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে আপনার মন

নিবিষ্ট, অন্তর্দৃষ্টিও আপনার নেই। তাই আপনি পরমতম কল্যাণের মধ্যেও শান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না (সৌন্দরনন্দ ৮/২৩)। রমণী যখন মোহনীয় হয় তখন তারা অন্যের মনে মোহ সঞ্চারিত করে, যখন মোহমুক্ত তখন অন্যের কাছে ভয়ের কারণ হয়; সমস্ত পাপ ও সঙ্কটের উৎস এই রমণীর সেবা কীরূপে সঙ্গত হতে পারে (সৌন্দরনন্দ ৮/৩২)।' এভাবে নানা উপদেশ দিয়ে বুদ্ধ শিষ্য নন্দকে কামনা-বাসনার অসারতা প্রতিপন্ন করলেন।

নবম সর্গ : 'মদাপবাদো' নামক নবম সর্গে ৫১টি শ্লোকে (তথাগতের) শিষ্যের নানা উপদেশ সত্ত্বেও নন্দের মোহমুক্তি না ঘটার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, নানা উপদেশ দেওয়া সত্ত্বেও স্ত্রীর প্রতি নন্দের আসক্তি অটুট রইল। স্ত্রীর চিন্তাই তাঁর মন অধিকার করে ছিল। বুদ্ধ শিষ্য তাঁকে নানাভাবে রূপ-যৌবনের অসারত্ব প্রমাণের চেষ্টা করলেন। তিনি পুনরায় শেষ উপদেশ স্বরূপ বলনে, 'কিংপাক (বিষাক্ত এক ধরণের ফল) ফলের রসাস্বদনে মৃত্যু নিশ্চিত, এতে কোনো পুষ্টি আসে না যদিও এই ফলের স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ চমৎকার; তেমনি অব্যস্থিত মন নিয়ে কেউ যদি বিষয়ভোগে আসক্ত হয় - তবে তা অনর্থই ডেকে আনে, সমৃদ্ধি আনে না (সৌন্দরনন্দ ৯/৪৮)। সুতরাং নিষ্পাপ চিত্তে উপলব্ধি কর যে আমার এই উপদেশ মুক্তিধর্মের সঙ্গে জড়িত বলেই হিতকর এবং জ্ঞানীদের অনুমোদিত এই মতের অনুবর্তী হও। তা না হলে তোমার কামনা ব্যক্ত কর (সৌন্দরনন্দ ৯/৪৯)।' এরূপ উপদেশ প্রদান করার পর নন্দ তাঁর ভাবে অচল রইল এবং মদস্রাবী হস্তীর মতোই মদান্ধ রইল।

দশম সর্গ : 'স্বর্গনিদর্শনো' নামক দশম সর্গে ৬৪টি শ্লোকে কামনা পীড়ত নন্দকে তথাগত কর্তৃক হিমালয়ে বানরী দর্শন ও স্বর্গে অপ্সরা দর্শনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধ যখন জানলেন ধর্মবিধি লঙ্ঘন করে নন্দ পত্নী দর্শনে উন্মুখ তখন তিনি তাঁকে নিয়ে গেলেন হিমালয়ে। সেখানে এক চক্ষু দৃষ্টি সম্পন্ন এক বানরী দেখিয়ে নন্দকে প্রশ্ন করলেন, 'নন্দ ! রূপে বা ভাবভঙ্গিতে কে তোমার কাছে বেশী সুন্দরী - এই এক চক্ষু দৃষ্টি সম্পন্ন বানরী নাকি সেই নারী যার প্রতি তোমার প্রেম নিবন্ধ? হতবুদ্ধি নন্দ মৃদু হেসে বললেন-'কার সঙ্গে কার তুলনা?' তখন বুদ্ধ তাঁকে স্বর্গে ইন্দ্রের

প্রমোদ্যানে নিয়ে গেলেন। সেখানে সুন্দরী অপ্সরাগণ কেউ গান করছে, কেউ বা নৃত্যরত। সেখানে অপ্সরাদের রূপ-সৌন্দর্য্য দেখে নন্দ ভাবলেন, 'সূর্য্য উদিত হলে যেমন অন্ধকারে প্রদীপের প্রভা নিশ্চিহ্ন হয় তেমনি অপ্সরাদের দিব্যশ্রী নরলোকের নারীদের দীপ্তিকে লুপ্ত করে (সৌন্দরনন্দ ১০/৪৪)।' অপ্সরাদের সৌন্দর্য নন্দের মনে কামনার আগুন উদ্দীপিত হলো এবং বললো, 'সেই এক চক্ষু বানরীর সঙ্গে আমার স্ত্রীর যে পার্থক্য, সেই পার্থক্যই দেখতে পাচ্ছি স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দরী অপ্সরাদের (সৌন্দরনন্দ ১০/৫০)।' তখন বুদ্ধ বললেন, 'তুমি যদি অপ্সরা লাভ করতে চাও তাহলে অপ্রমত্ত হয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্ম আচরণ কর। তুমি যদি দৃঢ়ভাবে ব্রত পালন কর, তুমি নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে মিলিত হতে পারবে (সৌন্দরনন্দ ১০/৬৩)।' নন্দ সম্মতি জ্ঞাপন করলে বুদ্ধ তাঁকে নিয়ে মর্ত্যে ফিরে আসেন।

একাদশ সর্গ : 'স্বর্গাপবাদো' নামক একাদশ সর্গে ৬২ টি শ্লোকে অপ্সরা প্রাপ্তির নিমিত্ত নন্দের তপশ্চর্যার কাহিনি এবং আনন্দ কর্তৃক নন্দকে উপদেশ দানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, অপ্সরাদের ধ্যানের মধ্যে রেখে নন্দ সাধনার নিয়মচর্চা করতে লাগলেন। তখন বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ এসে তাঁকে বললেন, 'অপ্সরা লাভই কী তোমার লক্ষ্য? তাহলে তোমার এই সংযমসাধনা, তা কি শুধু অসংযত প্রবৃত্তির স্রোতেই গা ভাসিয়ে দেবার জন্য? মনে যখন ভোগের লোলুপতা তখন দেহের এই কৃচ্ছ্রসাধনের কী প্রয়োজন? প্রেম ক্ষণিকের, স্বর্গবাসও ক্ষণিকের, ভোগের অবসান ঘটলেই আবার স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসতে হয়। সুতরাং, যাতে এই জন্ম-জরা-মৃত্যুর আবর্তন থেকে মুক্তি লাভ করা যায় সে চেষ্টায় ব্রতী হও।' আনন্দের উপদেশ নন্দের মনে নতুন বোধ জাগ্রত করল।

দ্বাদশ সর্গ : 'প্রত্যবমর্শো' নামক দ্বাদশ সর্গে ৪৩টি শ্লোকে নন্দের কামনা-বাসনার অসারতা উপলব্ধি সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধ শিষ্য আনন্দের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে নন্দের মনে জগতের প্রকৃত স্বরূপ অনিত্যতা সম্পর্কে সম্যক বোধ জাগ্রত হয়। অপ্সরাদের দেখে তিনি স্ত্রীকে ভুলে গিয়েছিলেন; কিন্তু তাদের সঙ্গে স্থিতিকালও ক্ষণস্থায়ী জেনে উদ্বিগ্ন চিত্তে অপ্সরাদের সঙ্গ ত্যাগ করলেন (সৌন্দরনন্দ ১২/৭)। অত:পর, তিনি বুদ্ধের কাছে এসে অশ্রুসিক্ত নয়নে প্রার্থনা

করলেন, আমি অপ্সরা চাই না, চিরস্থায়ী সুখের অধিকারী হতে চাই। আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করে সম্যক পথে পরিচালিত করুন। বুদ্ধ নন্দের উপলব্ধিকে সাধুবাদ জানালেন এবং প্রশংসাপূর্বক ধর্মোপদেশ দান করলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ : 'শীলেন্দ্রিয়জয়ো' নামক ত্রয়োদশ সর্গে ৫৫টি শ্লোকে বুদ্ধ কর্তৃক নন্দকে শীল ও ইন্দ্রিয় জয় সম্পর্কে শিক্ষা দানের বিষয় আলোচিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে নন্দের মননে শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়, পরম আনন্দে তাঁর হৃদয় অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। বুদ্ধ নন্দকে পরিশুদ্ধ জানতে পেরে প্রথমে শীল সম্পর্কে শীক্ষা দান স্বরূপ বললেন, 'হে সৌম্য ! এখন থেকে শ্রদ্ধাবৃত্তি দ্বারা সুরক্ষিত হয়ে অমৃত লাভের জন্য তোমার আচরণ নিয়ন্ত্রণে আরও অধিক মনোযোগী হও। এমনভাবে আচরণ কর যাতে তোমার দেহ ও বাক্যের প্রয়োগ পরিশুদ্ধ হওয়ার পর সরল, উন্মুক্ত, সুরক্ষিত এবং ত্রুটিহীন হতে পার (সৌন্দরনন্দ ১৩/১০, ১১)।' তিনি পুনরায় নন্দকে বললেন, 'শীল হচ্ছে সদাচারণ, এর অভাবে গৃহস্থ বা ভিক্ষু কারও জীবনই সম্ভব নয়। জ্ঞানের ভিত্তি সমাধি, সমাধির ভিত্তি দেহ ও মনের সুখ। দেহ ও মনের সুখ নির্ভর করে গভীর মানসিক শক্তির উপর, মানসিক শক্তির ভিত্তি হচ্ছে প্রীতি (সৌন্দরনন্দ ১৩/১৯, ২৪)।' শীল বিষয়ক উপদেশ দানের পর বুদ্ধ তাঁকে ইন্দ্রিয় জয় বিষয়ক ধর্মোপদেশ দান করেন। এ সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন, 'ইন্দ্রিয় শাসন বিষয়ে মানুষের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত; অসংযত ইন্দ্রিয় দুঃখ সৃষ্টি করে এবং তা পুনর্জন্মেরও কারণ (সৌন্দরনন্দ ১৩/৫৪)।' এভাবে বুদ্ধ নন্দকে শীল ও ইন্দ্রিয় জয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে নানা ধর্মোপদেশ দান করেন।

চতুর্দশ সর্গ : 'আদিপ্রস্থানো' নামক চতুর্দশ সর্গে ৫২টি শ্লোকে বুদ্ধ কর্তৃক নন্দকে শিষ্যের করণীয় তথা পার্থিব বিষয়ে ধর্মোপদেশ দানের কথা বর্ণিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, শীল ও ইন্দ্রিয় জয় সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দানের পর বুদ্ধ নন্দকে আহার সম্পর্কে উপদেশ দান করেন। উপদেশ স্বরূপ তিনি বলেন, 'অতিভোজন যেমন অনর্থ ডেকে আনে; অল্পাহারও সামর্থ্য নষ্ট করে। অহংকার বশে

অতিভোজন বা অল্পাহার বর্জন করে সতর্ক হয়ে নিজের শক্তি বুঝে ভোজন করা কর্তব্য (সৌন্দরনন্দ ১৪/৩, ৪)।' আহার বিষয়ে নানা উপদেশ দানের পর বুদ্ধ নন্দকে আচার-আচরণ ও মনোবৃত্তি সম্পর্কে উপদেশ দান করেন।

পঞ্চদশ সর্গ : 'বিতর্কপ্রহানো' নামক পঞ্চদশ সর্গে ৬৯টি শ্লোকে বুদ্ধ কর্তৃক নন্দকে মনের শাসন বিষয়ক উপদেশ দান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধ প্রথমে নন্দকে কামচিন্তা পরিহার পূর্বক মনকে বশে রাখার উপদেশ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে বুদ্ধ বলেন, 'বিষধর সর্পের মতই কামকে নির্মূল করা কর্তব্য; কাম অস্থায়ী, লোপধর্মী, প্রকৃত মূল্যহীন, সঙ্কটের কারণ এবং বহুজনভোগ্য। যারা মনে করে অর্থের প্রাচুর্যেই তৃপ্তি, স্বর্গ প্রাপ্তিতেই কৃতার্থতা এবং কামভোগেই সুখ - তাদের সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী (সৌন্দরনন্দ ১৫/৮, ১০)।' তৎপর বুদ্ধ নন্দকে কুশল-অকুশল কর্ম ও কর্মফল, প্রকৃত জ্ঞাতী, পাপাচারের কুফল প্রভৃতি ব্যাখ্যা পূর্বক মনকে সংযত করার বিষয়ে নানা উপদেশ দান করেন।

ষোড়শ সর্গ : 'আর্যসত্যব্যাখ্যানো' নামক ষোড়শ সর্গে ৯৮টি শ্লোকে বুদ্ধ প্রদত্ত চতুরার্য সত্য আলোচিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধ নন্দকে চতুরার্য সত্য ব্যাখ্যা পূর্বক ধ্যানানুশীলনের উপদেশ দান করেন। উপদেশ স্বরূপ বলেন, 'চারটি আর্য সত্য বুঝে নিয়ে, তাদের তাৎপর্য সম্যক্ উপলব্ধি করে, ধ্যানের অনুশীলনের দ্বারা সমস্ত দোষের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। এভাবে শান্তি লাভের পর যোগীর আর জন্ম হয় না। কিন্তু এই চারটি আর্য সত্য উপলব্ধি যদি না হয়, যদি প্রকৃত তাৎপর্য আয়ত্ত করা না হয় তবে মানুষ সংসার দোলায় আরোহণ করে এক জন্ম থেকে আর এক জন্মে ভ্রমণ করতে থাকে, কোনো শান্তি পায় না (সৌন্দরনন্দ ১৬/৫, ৬)। এভাবে ধর্মোপদেশ দানের পর বুদ্ধ চারটি আর্য সত্য এবং দুঃখ মুক্তির পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করেন। তৎপর মানুষের মানসিক প্রবৃত্তিসমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পর বিভিন্ন শিষ্যের যোগ সাধন পদ্ধতি অনুসরণের জন্য বুদ্ধ নন্দকে উপদেশ দান করেন।

সপ্তদশ সর্গ : 'সৌন্দরনন্দেহমৃতাধিগমো' নামক সপ্তদর্শ সর্গে ৭৩টি শ্লোকে নন্দের বুদ্ধের ধর্মোপদেশের অমৃতরস পানের মাধ্যমে সাধনায় সিদ্ধি লাভের বিষয় আলোচিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে নন্দ কঠোর সংকল্প ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে ইন্দ্রিয় জয়ের সংগ্রাম শুরু করেন। ধৈর্য নিয়ে যত্ন প্রয়োগ করে, মোহ বর্জন করে, শক্তি সংহত করে তিনি তাঁর চিন্তাকে প্রশান্ত করে তুললেন এবং চিত্তকে সংযত করে বিষয়ভোগে উদাসীন হলেন (সৌন্দরনন্দ ১৭/৬)। অতঃপর চিত্তকে সুদৃঢ় নগরীর মতো সুরক্ষিত করে দীর্ঘ সাধনায় আত্ম নিয়োগ করলেন। ক্রমে তিনি চারি আর্য সত্যের তাৎপর্য উপলব্ধি করলেন, মিথ্যাদৃষ্টির জাল ছিন্ন করলেন, কাম ও পুনর্জন্মের পরিণতি উপলব্ধি করলেন, পাপমূল উচ্ছিন্ন করলেন, ধ্যানস্তর অতিক্রমপূর্বক পঞ্চবন্ধন ছিন্ন করলেন এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গের ভেলায় চড়ে অহর্ত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তৎপর বুদ্ধের প্রতি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে উদারবাণী উচ্চারণ করলেন, 'শ্রান্ত হস্তীর মতো তিনি আমাকে নিম্নতম কামনার অনর্থ পঙ্ক থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সদ্ধর্মে আমি এখন আশ্রয়লাভ করেছি -এই ধর্ম শান্তিময়, এখানে জরা নেই, শোক নেই, অন্ধকার নেই, বিক্ষোভ নেই। আমি আজ মুক্ত (সৌন্দরনন্দ ১৭/৭২)।' কামাগ্নির আগুনে প্রজ্জ্বলিত নন্দ চিত্তকে বুদ্ধের অমিয় বাণীর বারিধারাতে প্রশান্ত করে মুক্তির স্বাদ করলেন।

অষ্টাদশ সর্গ : 'আজ্ঞাব্যাকরণো' নামক অষ্টাদশ সর্গে ৬৪টি শ্লোকে সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর বুদ্ধের প্রতি নন্দের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং নন্দের প্রতি বুদ্ধের হিতোপদেশের কথা বর্ণিত হয়েছে। সর্গ সমীক্ষায় দেখা যায়, সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর গৈরিক পরিহিত, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ও শ্বেতবর্ণ নন্দ বুদ্ধের কাছে এসে কার্যসিদ্ধির কথা সশ্রদ্ধচিত্তে জ্ঞাত করলেন। নন্দ বুদ্ধকে বললেন, 'হে প্রভু ! মিথ্যাদৃষ্টির যে তীক্ষ্ণ শল্য আমার হৃদয়ে নিহিত থেকে আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল তা আপনি আপনার উপদেশের সাঁড়াশী দিয়ে তুলে নিয়েছেন - শল্য চিকিৎসক যেমন শল্য তুলে নেন তেমনি। আমার এই ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছৃঙ্খলতায় আমি যে কামবিষ পান করেছিলাম, আপনার উপদেশের মহৌষধে তা থেকে আমি আরোগ্য লাভ করেছি (সৌন্দরনন্দ ১৮/৯)।' এভাবে নানা উপমার মাধ্যমে নন্দ বুদ্ধকে

সাধনায় সিদ্ধিলাভের কাহিনি বর্ণনা করলেন। বুদ্ধও নন্দকে নানা হিতোপদেশের মাধ্যমে তাঁর সিদ্ধিলাভের প্রশংসা করলেন। প্রশংসা স্বরূপ বুদ্ধ নন্দকে বলেন, 'আজ তোমার এই আত্মজয়ের পর বলতে হবে তোমার সন্ন্যাস গ্রহণ সার্থক হয়েছে, কেননা, তুমি নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ করেছে। সন্ন্যাস জীবন তাঁর পক্ষেই সফল যিনি নিজেকে জয় করতে পেরেছেন। যিনি নিজে চঞ্চল, যার ইন্দ্রিয় অপরাজিত তার পক্ষে এই জীবন ব্যর্থ (সৌন্দরনন্দ ১৮/২৩)।' এভাবে বুদ্ধ নন্দকে নানাভাবে হিতোপদেশ দানে প্রশংসা করার পর নন্দ বুদ্ধকে নতশিরে প্রণতি জ্ঞাপন করেন।

কাব্যের শেষে কবি অশ্বঘোষ তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সংক্ষেপে ব্যক্ত করেছেন, যা অশ্বঘোষের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে।

২.২.২ সৌন্দরনন্দ কাব্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্র

প্রতিপাদ্য বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার মানসে অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতের মতো সৌন্দরনন্দ কাব্যেও বহু পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রের উপমা তুলে ধরেছেন, যা অশ্বঘোষের কাব্যের মহত্ত্ব ও গৌরব বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। সারলা খোসলার [১৭] (Sarla Khosla) সৌন্দরনন্দ কাব্য সমীক্ষার আলোকে সেসব পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলো চিহ্নিত করেন। নিম্নে সৌন্দরনন্দ কাব্যে বর্ণিত প্রধান প্রধান পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর নাম সর্গ ও শ্লোক সংখ্যা নির্দেশসহ তুলে ধরা হলো :

অদিত্য (সৌন্দরনন্দ, ১/৬১), অগ্নি (সৌন্দরনন্দ, ৭/২৭), অহল্যা (সৌন্দরনন্দ, ৮/২৫), অক্ষমাল (সৌন্দরনন্দ, ৭/২৮), অম্বরীস (সৌন্দরনন্দ, ৭/৫১), অগ্নিরস (সৌন্দরনন্দ, ৮/৩১), অঙ্গদ (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩৩), অন্তিদেব (সৌন্দরনন্দ, ৭/৫১), অর্জুন (সৌন্দরনন্দ, ৯/১৭), অসিত (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩২), ভার্গব (সৌন্দরনন্দ, ১/২৫, ৯/১৭), ভরত (সৌন্দরনন্দ, ১/২৬), ভীষ্ম (সৌন্দরনন্দ, ৭/৪৪), দ্বৈপায়ণ (সৌন্দরনন্দ, ৭/২৯, ৩০), ঘৃতাচী (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩৫), গৌতম (সৌন্দরনন্দ, ৮/৪৫), ইন্দ্র (সৌন্দরনন্দ, ১/৫৯, ৬২, ১০/৩৫, ১১/৪৩, ৪৮), কালী (সৌন্দরনন্দ, ৭/২৯), কণ্ব (সৌন্দরনন্দ, ১/২৬), কপিল (সৌন্দরনন্দ, ১/১, ২২, ৫৭), কাশ্যপ (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩২), কৃষ্ণ ও কংস (সৌন্দরনন্দ, ৪/১৮), কুবের (সৌন্দরনন্দ, ৪/২),

মদন (সৌন্দরনন্দ, ৮/৪৫), মকন্দ (সৌন্দরনন্দ, ১/৫৮), মান্ধতৃ (সৌন্দরনন্দ, ১১/৪৩), মেনকা (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩৯, ৪০), নহুষ (সৌন্দরনন্দ, ১১/৫৮), নমুচি (সৌন্দরনন্দ, ৯/১০), পাণ্ডু (সৌন্দরনন্দ, ৭/৪৫), পরাশর (সৌন্দরনন্দ, ৭/২৯), শন্তনু (সৌন্দরনন্দ, ৭/৪৪), সরস্বতী (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩১), উগ্রতপস (সৌন্দরনন্দ, ৮/৪৫), উর্বশী (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩৮, ৪২), বাল্মীকি (সৌন্দরনন্দ, ১/২৬), বসিষ্ঠ (সৌন্দরনন্দ, ৭/২৮), যযাতি (সৌন্দরনন্দ, ১/৫৯, ১১/৪৬), যমুনা (সৌন্দরনন্দ, ৭/৩৩)।

সৌন্দরনন্দ কাব্যের উপরোক্ত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের অনেকগুলো উপমা বুদ্ধচরিত কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতের মতো রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণশাস্ত্র হতেও বিভিন্ন চরিত্রের উপমা প্রদান করে সৌন্দরনন্দ কাব্যের মাহাত্ম প্রতিপন্ন করেছেন।

২.২.৩. সৌন্দরনন্দ কাব্যের বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি

সৌন্দরনন্দ কাব্যের বিষয়বস্তুর গতি প্রকৃতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কাব্যের সূচনা হয়েছে প্রথম থেকে তৃতীয় সর্গের মধ্যে, বুদ্ধ এবং নন্দের জন্মকথা, বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভ এবং বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধের কপিলাবস্তু নগরীতে প্রত্যাবর্তন দিয়ে। কাব্যের সূচনায় আশ্রমের বর্ণনা আভাস প্রদান করে যে, 'নির্বাণই' হচ্ছে সৌন্দরনন্দ কাব্যের মূল লক্ষ্য। চতুর্থ সর্গে প্রাসাদে নন্দের বিলাসী জীবন এবং সেখানে উপেক্ষিত হয়ে বুদ্ধের ফিরে যাওয়ার ঘটনা ইঙ্গিতবাহী। সেখান থেকেই মূল কাহিনির সূচনা এবং সেখানেই কাহিনিতে নতুন গতি-প্রবাহ সৃষ্টি হয়। পঞ্চম থেকে নবম সর্গ পর্যন্ত বুদ্ধ কর্তৃক নন্দকে আশ্রমে নিয়ে যাওয়া, নানাভাবে ধর্মোপদেশ দিয়ে ধর্মপথে, দুঃখমুক্তির পথে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা এবং নন্দের অতিরিক্ত কামাসক্তির কারণে উপদেশ ব্যর্থ হবার আশঙ্কা প্রভৃতি ঘটনা রোমাঞ্চ যেমন সৃষ্টি করে এবং তেমনি কাব্যের লক্ষ্য অর্জনে কিছুটা সংশয়ও সৃষ্টি করে। এভাবে রোমাঞ্চ ও সংশয়ের দোলাচালে দোলায়িত হওয়া কাহিনি দশম হতে একাদশ সর্গে নতুন প্রবাহ লাভ করে। বুদ্ধ কর্তৃক নন্দকে হিমালয় ও স্বর্গে নিয়ে যাওয়া, হিমালয়ে বানরীকে দেখে নন্দের ক্ষোভ প্রকাশ, স্বর্গে অপ্সরা দেখে মোহিত হয়ে স্ত্রীকে ভুলে যাওয়া, অপ্সরা লাভের জন্য কঠোর সাধায় আত্মনিয়োগ করা

প্রভৃতি ঘটনা কাব্যের লক্ষ্য অর্জনে সম্ভবনা সৃষ্টি করে। দ্বাদশ সর্গ হচ্ছে কাব্যের চরম মুহূর্ত্ত। দ্বাদশ সর্গে নন্দ নতুন বোধে জাগ্রত হন। তিনি উপলব্ধি করলেন, 'অপ্সরা দেখে আমি স্ত্রীকে ভুলেছি। কিন্তু স্বর্গের অপ্সরা লাভের সাধনাও অর্থহীন, কেননা সেই সুখও ক্ষণস্থায়ী।' ত্রয়োদশ হতে ষোড়শ সর্গ হচ্ছে কাব্যের 'নিশ্চয়' পর্ব। কারণ এখান থেকে কাব্য নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ সর্গে চারি আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, সদাচার, ইন্দ্রিয় জয় প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষাদান নন্দের জীবনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। নন্দ উপলব্ধি করেন জগতের প্রকৃত স্বভাব দুঃখময়তা, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা। নতুন বোধে জাগ্রত হয়ে নন্দ ইন্দ্রিয়জয় ও তৃষ্ণা ক্ষয় করে জন্মনিরোধক দুঃখমুক্তির সোপান নির্বাণ লাভের সংকল্প করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ সর্গ হচ্ছে কাব্যের 'প্রাপ্তি ও সমাপ্তি' পর্ব। সপ্তদশ সর্গে পাপচিন্তার বিরুদ্ধে নন্দের কঠোর সংগ্রাম, ইন্দ্রিয় জয় এবং ধ্যান-সমাধির মাধ্যমে অর্হত্ত্ব লাভ এবং অষ্টাদশ সর্গে অর্হত্ত্ব লাভের পর বুদ্ধের প্রতি নন্দের কৃতজ্ঞা প্রকাশের মাধ্যমে সৌন্দরনন্দ কাব্যের প্রাপ্তি ও সমাপ্তি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অশ্বঘোষ কাহিনিকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে মুক্ত করে নিয়ে গেছেন এক আধ্যাত্মিক জগতের দিকে। তিনি প্রতিটি চরিত্র অংকন করেছেন গভীর সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে। ফলে তাঁর বর্ণনা হয়ে উঠেছে সরল এবং হৃদয়গ্রাহী। এখানেই অশ্বঘোষের কবি প্রতিভার সার্থকতা।

২.২.৪. সৌন্দরনন্দ কাব্যের উৎস

বুদ্ধচরিত কাব্যের মতো সৌন্দরনন্দ কাব্যেও উৎস সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ সাক্ষ্য দেয় যে, অশ্বঘোষ তাঁর সৌন্দরনন্দ কাব্যে *রামায়ণ*, *মহাভারত* ও *পুরাণশাস্ত্র* হতে বহু পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষের পূর্বে রচিত বা সংকলিত থেরগাথা, অঙ্গুত্তর নিকায়, অঙ্গুত্তরট্ঠকথা, ধম্মপদট্ঠকথা, বিনয়পিটক, অবদান প্রভৃতি গ্রন্থে নন্দের জীবন ও দীক্ষা কাহিনী সম্পর্কে বিক্ষিপ্তভাবে বহু তথ্য পাওয়া যায়।[১৮] তবে

সৌন্দরনন্দকাব্যে নন্দের জীবন ও দীক্ষা কাহিনি সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা ক্ষেত্র বিশেষে উপরোক্ত পালি উৎসে (ত্রিপিটকে) বর্ণিত তথ্য হতে কিছুটা ভিন্ন। সারলা খোসলা (Sarla Khosla) পালি উৎসে বর্ণিত নন্দের জীবন-কাহিনি ও সৌন্দরনন্দকাব্যে বর্ণিত জীবন কাহিনির মধ্যে যে পার্থক্যগুলো বিরাজমান তা চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। নিম্নে সারলা খোসলার (Sarla Khosla) ও শাস্ত্রী নির্দেশিত পার্থক্যগুলো প্রণিধান করা হলো[১৯] :

ক. পালি উৎসে দেখা যায়, বিয়ে ও রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান শেষ হলে বুদ্ধ নন্দের ঘরে প্রবেশ করেন। কিন্তু অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে দেখা যায় নন্দ এবং তাঁর স্ত্রী যখন আনন্দ-সাগরে ভাসছিল তখন মুনি (বুদ্ধ) বাড়িতে প্রবেশ করেন।

খ. সৌন্দরনন্দ কাব্যে দেখা যায়, সুন্দরী তার স্বামীর থেকে শপথ আদায় করছে যাতে তার গালের রং শুকিয়ে যাবার আগেই তাঁর স্বামী ফিরে আসে। কিন্তু, পালি উৎসে দেখা যায় স্বামীকে শীঘ্রই ফিরে আনার জন্য স্ত্রী চিৎকার করছে।

গ. সৌন্দরনন্দ কাব্যে দেখা যায়, ধর্মোপদেশের মাধ্যমে নন্দের মানসিকতা পরিবর্তনপূর্বক দীক্ষা দানের ক্ষেত্রে আনন্দ বিশাল ভূমিকা রাখেন। কিন্তু পালি উৎসে নন্দের দীক্ষা দাতা হিসেবে আনন্দের নামোল্লেখ নেই।

ঘ. সৌন্দরনন্দ কাব্যে দেখা যায়, নন্দ বাড়ি ফেরার প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন, কিন্তু পালি উৎসে দেখা যায় তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংযম সাধনা করছেন।

ঙ. সৌন্দরনন্দ কাব্যে বানরীকে এক চোখ বিহীন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। অপরদিকে পালি উৎসে বানরীকে নাক, কান ও লেজবিহীনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

চ. সৌন্দরনন্দ কাব্যে সুন্দরী অপ্সরা লাভের নিমিত্ত সাধনা করার জন্য আনন্দ নন্দকে ভর্ৎসনা করেন; অপরদিকে পালি উৎসে দেখা যায়, সুন্দরী অপ্সরা লাভের নিমিত্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করায় সকল ভিক্ষু নন্দকে উপহাস করেন।

উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামান্য পার্থক্য থাকলেও সৌন্দরনন্দ কাব্যে বর্ণিত নন্দের জীবন-চরিত ও দীক্ষা কাহিনির অধিকাংশই পালি উৎস তথা ত্রিপিটকে পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ মূলত কবি। কবির ভাবকল্পনা কাহিনিকে নানাভাবে প্রভাবিত এবং প্রবাহিত করে। এটাই স্বাভাবিক এবং এখানেই কবির সার্থকতা, যা অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যের ক্ষেত্রেও সত্য। এ প্রসঙ্গে শ্রী মুরারী মোহন সেনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

"কবি মধুর কাব্যের পাত্রে অত্যন্ত গভীর বিষয়ের পরিবেশনা করেছেন এতে সন্দেহ নেই। তিনি বলেছেন 'তং কাব্যধর্ম্মাৎ কৃতম্, এই পরিবেশনায় তিনি কাব্যধর্ম থেকে কোথাও ভ্রষ্ট হননি। বস্তুতঃ কবি অশ্বঘোষের প্রতিভাই এই প্রকৃতির ছিল যে বিষয় যতই জটিল হোক, তিনি অনায়াসে তাকে কাব্যের ধর্মে অনুরঞ্জিত করতে পারতেন; শুধু তাই নয়, শিল্পীর এই খেলাতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করতেন। সৌন্দরনন্দ কাব্যে কবি যেমন কামকলার উচ্ছল বর্ণনা করেছেন, নিগূঢ় তত্ত্বের বিশ্লেষণেও বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।"[২০]

অতএব, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামান্য বৈসাদৃশ্য থাকলেও পালি ত্রিপিটকে বর্ণিত নন্দের জীবন কাহিনিই অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যের অন্যতম উৎস হিসেবে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

২.২.৫. সমাজ জীবনে সৌন্দরনন্দ কাব্যের প্রভাব

সৌন্দরনন্দ কাব্যের মূল বিষয়বস্তু নন্দের দীক্ষা কাহিনি। কিন্তু বুদ্ধচরিতের ন্যায় এ কাব্যেও বুদ্ধের জীবনেতিহাস আছে। বলা চলে, নন্দের ধর্মান্তর এবং বুদ্ধের জীবন দর্শন এই কাব্যে মূল ভিত্তি। বুদ্ধচরিতের কাহিনিতে কঠোর সাধনার ফলে বুদ্ধের আলোক প্রাপ্তি তথা বোধিজ্ঞান লাভের কথা আছে। অপরদিকে, সৌন্দরনন্দ কাব্যে আছে বুদ্ধের অসামান্য নৈপূণ্যে মোহাচ্ছন্ন নন্দকে আলোর জগতে নিয়ে আসার কথা। ফলে সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে বুদ্ধচরিতের যে প্রভাব ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে তা সৌন্দরনন্দ কাব্যের প্রভাব হিসিবেও চিহ্নিত করা যায়।

সৌন্দরনন্দ কাব্যের অনেক দৃশ্য ভাস্করদের নিকট খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[২১] বিশেষ করে, নন্দ ও স্ত্রী সুন্দরীর রাজকীয় জীবন অনেক শিল্পীর শিল্পকর্মে স্থান করে নিয়েছে। এরূপ একটি অসাধারণ ভাস্কর্য শিল্পের সন্ধান পাওয়া যায়, যা বর্তমানে ভারতের মথুরা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, যার ক্যাটালগ নম্বর হচ্ছে 12.186। শিল্পকর্মটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এতে উপরে নীচে দু'টি দৃশ্য রয়েছে। উপরেরটিতে বেণী প্রসাধন চিত্রিত হয়েছে। তাতে নন্দ সুন্দরীর চুল বিন্যাস করছে এবং সুন্দরী আয়নায় নিজেকে পরখ করছে। পাশে একজন সহচর প্রসাধন ঝুড়িটি ধরে আছে। নিচের দৃশ্যে একজন সুন্দরী দর্পণে তাকিয়ে গলার হার পড়ছে আর দর্পণটি ধরে আছে একজন বামুন। তাঁর বামে নন্দ প্রসাধন-ঝুড়ি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন।

সৌন্দরনন্দ কাব্যের কাহিনি চিত্রিত অপর একটি ভাস্কর্যশিল্প দিল্লির জাতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে, যার ক্যাটালগ নম্বর হচ্ছে 1802-71। এটি খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে নির্মিত এবং গান্ধার শিল্পকলা হিসেবে খ্যাত। শিল্পকর্মটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বাম দিকে নন্দ সুন্দরীর কেশ বিন্যাস করছে এবং পাশে প্রসাদনী সামগ্রী রক্ষিত। ডানদিকে নন্দ পাত্র হাতে শ্রদ্ধা নিবেদনের ভঙ্গিতে বুদ্ধের পাশে দাঁড়ানো। মাদ্রাজের সরকারি যাদুঘরে সৌন্দরনন্দ কাব্যেরে কাহিনির আলোকে নির্মিত চুনাপাথরের তৈরি আরও একটি ভাস্কর্য সংরক্ষিত আছে, যা খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের দিকে নির্মিত এবং অমরাবতি শিল্পকলা হিসেবে খ্যাত। এই শিল্পকর্মের বাম দিকের অংশে দেখা যায়, প্রসাধন কক্ষে নন্দ ও সুন্দরী দাঁড়ানো, ডানদিকের অংশে দেখা যায়, রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকের ডানে দাঁড়িয়ে আছে বুদ্ধ এবং নন্দকে একটি পাত্র হাতে প্রাসাদ থেকে বেড়িয়ে আসছে। মধ্যবর্তী স্থানে স্ত্রীর জন্য কাতর নন্দ বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দান করছেন। এছাড়া, নন্দের বানরী ও অপ্সরা দর্শনের দৃশ্যাবলী চিত্রিত ভাস্কর্যও পাওয়া যায়।

অতএব, উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ জীবনে সৌন্দরনন্দ কাব্য যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

২.৩. নাটকের বিষয়বস্তু ও উৎস

শারিপুত্রপ্রকরণ, *রাষ্ট্রপাল*, *উর্বশী বিয়োগ* প্রভৃতি নাটকের লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া, অশ্বঘোষ একটি প্রতীকী নাটক রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, *শারিপুত্রপ্রকরণ* নাটকের কয়েকটি অঙ্ক মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাও আবার অধিকাংশ পাঠযোগ্য নয়। *প্রতীকী নাটকের* কিছু সংলাপ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। *রাষ্ট্রপাল এবং উর্বশী বিয়োগ* নাটকের পাণ্ডুলিপি এখনো অনাবিষ্কৃত। সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেওয়ার কাহিনি শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকে প্রধান আলোচ্য বিষয়। নাটকের উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলো হলো : বুদ্ধ, নায়ক বা নায় (শারিপুত্র), মৌদ্‌গল্যায়ন (মৌদ্‌গ), ধানঞ্জয় (ধানং), বিদূষক (বিদূ), মগধ (মগ), বতী (মগধাবতী), শ্রমণ (শ্রম), উপাসক (উপ), গণিকা (গণি), ব্রাহ্মণ, পারিপার্শ্বিক, চেটি, দুষ্ট, গোবং।

সমীক্ষায় দেখা যায়, মজ্ঝিমনিকায়, থেরগাথা, থেরগাথা অট্‌ঠকথা এবং ধম্মপদট্‌ঠকথায় সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের জীবন-কাহিনি পাওয়া যায়।[২২] সেইসব জীবন কাহিনি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সারিপুত্র উপতিষ্য গ্রামে এবং মৌদ্‌গল্যায়ন কোলিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। একদা উভয়ে গৃহত্যাগ করে সঞ্চয় বেলট্‌ঠপুত্র নামক এক তীর্থিকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সঞ্চয় বেলট্‌ঠপুত্রের নিকট নির্বাণ লাভের শিক্ষা লাভ না করায় সারিপুত্র নির্বাণতত্ত্ব শিক্ষা লাভের আশায় নানাদিকে বিচরণ করতে থাকেন এবং বুদ্ধশিষ্য অশ্বজি স্থবিরের নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। মৌদ্‌গল্যায়ন সারিপুত্রের নিকট সেই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন এবং ধর্মোপদেশ শ্রবণ পূর্বক তিনিও স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা রাজগৃহের বেণুবন বিহারে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজিত হয়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সাতদিন পর মৌদ্‌গল্যায়ন এবং পনর দিন পর সারিপুত্র অর্হত্ত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হন। সারিপুত্র ছিলেন অসাধারণ প্রজ্ঞা সম্পন্ন, তিনি বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অপরদিকে মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন অপরিসীম ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী। তাঁরা বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক হিসেবে খ্যাত ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বুদ্ধের পরেই ছিল তাঁদের স্থান।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ত্রিপিটকে বর্ণিত সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের জীবন কাহিনিই ছিল শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকের মূল উৎস। কিন্তু পাঠযোগ্যতার অভাবে নাটকটি সম্পর্কে মন্তব্য করা কঠিন। বিভিন্ন গ্রন্থে অন্যান্য প্রাচীনতর নাটকের উল্লেখ থাকলেও সেই নাটকগুলোর পুথি এখনো অনাবিষ্কৃত। এ কারণে অশ্বঘোষের সারিপুত্রপ্রকরণ নাটকটি ভারতবর্ষের নাট্যকৃতির প্রথম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়।[২৩] তাছাড়া, শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যা প্রাকৃত ভাষার ইতিহাস নিরূপণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকার করা যায়।

প্রতীকী নাটকটির কয়েকটি সংলাপ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।[২৪] মানুষের মনোজগতের মনোবৃত্তিগুলো প্রতীকী নাটকটিতে পাত্র-পাত্রী হিসেবে উপস্থাপন করে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের নৈতিক শিক্ষা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মানব চরিত্র হিসেবে এ নাটকে একমাত্র বুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতীকী নাটকটির পাঠযোগ্যতা না থাকলেও ধারণা করা যায় যে, নাটকটি বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক উভয় দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল। কারণ, যদি তা হতো অত প্রাচীন যুগে মানুষের মনোধর্মকে নাটকীয় চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেতো না। বুদ্ধের শিক্ষা নৈতিকতায় পূর্ণ। ফলে অনুমান করা যায় যে, বুদ্ধের জীবন দর্শনই ছিল প্রতীকী নাটকের মূল উৎস।

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, *রাষ্ট্রপাল* নাটকের পুথি আবিষ্কৃত হয়নি। মূল পাঠের অভাবে নাটকটির প্রকৃত বিষয়বস্তু কী ছিল তা বলা কঠিন। রত্না বসুর[২৫] মতে, বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনিই এ নাটকের মূল উপজীব্য বিষয়। তবে, নামকরণের দিক থেকে বিচার করলে রত্না বসুর অভিমত সঠিক বলে মনে হয়। কারণ অশ্বঘোষ রচিত *শারিপুত্রপ্রকরণ* নাটকটিও বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্র এবং মৌদ্‌গল্যায়নের দীক্ষা নিয়ে রচিত। ফলে *রাষ্ট্রপাল* নাটকটিও বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপালের দীক্ষা-কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছিল। রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনি ত্রিপিটকের অন্তর্গত মজ্ঝিমনিকায় এবং থেরগাথা গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কাহিনীটি নিম্নরূপ :

"রট্‌ঠপাল বা রাষ্ট্রপাল কুরু রাজ্যের থুল্লকোট্‌ঠিত নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ একদা

Dhaka University Institutional Repository

থুল্লকোট্ঠিত নামক স্থানে দেশনা করেন। রট্ঠপাল বুদ্ধের দেশনা শুনে গৃহত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। পিতা-মাতার অনুমতি লাভে ব্যর্থ হয়ে তিনি আমৃত্যু উপবাস আরম্ভ করেন। অবশেষে 'প্রব্রজ্জিত হওয়ার পর পিতা-মাতার দর্শনে আগমন করবে' - এই শর্তসাপক্ষে পিতা-মাতা তাঁকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেন। রট্ঠপাল বুদ্ধের সঙ্গে শ্রাবস্তী গমন করেন। সেখানে প্রব্রজ্জিত হয়ে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অর্হত্ত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হন এবং বুদ্ধের অনুমতি ক্রমে পিতা-মাতা দর্শনে নিজগ্রামে বসবাস করতে থাকেন।"[২৬]

উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, অশ্বঘোষ পালি ত্রিপিটক হতে উৎস গ্রহণ করে রট্ঠপাল নাটকটি রচনা করেছিলেন।

উর্বশী-বিয়োগ নাটেকের বিষয়বস্তু অজনা। তবে নামকরণ থেকে বোঝা যায়, নাটকটি ছিল বিয়োগান্তক। উর্বশী সম্ভবত নাটকটির নায়িকা ছিলেন। নাটকটির প্রকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা পাওয়া না যাওয়ায় উৎস নির্দেশ কষ্টকর। যাহোক, উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অশ্বঘোষ বুদ্ধের জীবন-দর্শন তথা ত্রিপিটক হতে তাঁর নাটকের উৎস গ্রহণ করেছিলেন।

৩. অশ্বঘোষের বিতর্কযুক্ত সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু ও উৎস

অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে পণ্ডিত মণ্ডলে বিতর্ক রয়েছে এমন গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। এই অনুচ্ছেদে বিতর্কযুক্ত কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস প্রকটিত করা হবে।

৩.১. সূত্রালংকার গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উৎস

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম সমীক্ষায় দেখা যায়, সূত্রালংকার গ্রন্থটি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিং, এম. আনেসাকি, এ.বি. কীথ, এস. লেভি, এইচ. লুর্ডাস প্রমুখ গবেষকগণ গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেছেন। অপরদিকে, এম. উন্টানীট্স, ই. এইচ. জনস্টন, হুবার, তোমোমাৎসু এবং দিলীপ কুমার বড়ুয়া প্রমুখ গবেষকগণ গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে স্বীকার করেন নি। আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুথি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দীর্ঘ নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, জাতক, ধর্মপদ, থেরগাথা, বিনয় পিটক এবং অবদান গ্রন্থ হতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে গ্রন্থটি রচিত হয়। বিশেষত, জাতক এবং অবদান গ্রন্থের রচনাশৈলীর অনুকরণে গ্রন্থটি গদ্যে ও সুবিন্যস্ত অলংকার সমৃদ্ধ পদ্যে রচিত। নৈতিক কাহিনি বা গল্পই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। রাজকুমার দীর্ঘায়ু কাহিনি, শিবি জাতকের রাজা শিবির কাহিনি,[২৭] সুত্ত পিটকে বর্ণিত শারিপুত্র কর্তৃক অকুশলকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষা দানে অসম্মতি এবং পরবর্তীতে বুদ্ধ কর্তৃক দীক্ষা দান বিষয়ক কাহিনি, কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের অন্তিমকালের বর্ণনা, নির্বাণ লাভের জন্য গৌতমী কর্তৃক বুদ্ধকে পূজা দান, বুদ্ধের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শনের নানা কাহিনি এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। বিষয়বস্তু সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন তথা ত্রিপিটকই গ্রন্থটির আদি উৎস ছিল।

৩.২. বজ্রসূচী গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উৎস

বজ্রসূচী গ্রন্থটি নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়, যা ইতঃপূর্বে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তু সমীক্ষায় দেখা যায়, এ গ্রন্থে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, মনুসংহিতা এবং অর্থশাস্ত্র হতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে এমন বিষয়গুলো উপস্থাপন করে বজ্রের ন্যায় কঠিন এবং ধারালো সূচের আঘাতের ন্যায় বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের আলোকে জাতিভেদ প্রথার অসারত্ব প্রতিপন্ন এবং মানবতার জয়গান করা হয়েছে। এজন্য গ্রন্থটির নামকরণ করা হয় বজ্রসূচী।

ধর্মসূত্র (১৮৭.৭), মনুসংহিতা (১২/১০৮-১১৩) এবং বেদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজার কর্তব্য হচ্ছে বেদ বাক্য শ্রদ্ধা ও মান্য করা। জন্মসূত্রেই ব্রাহ্মণ বলে গণ্য করা হতো। ব্রাহ্মণরা যে কোনো ধরনের অন্যায় করুক না কেনো তাঁদের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা যেতো না। উচ্চ বর্ণের হওয়ায় ব্রাহ্মণদের অন্যান্য বর্ণের চেয়ে কম (অর্ধেক) জরিমানা প্রদান করতে হতো। একজন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সাথে দুর্ব্যবহার করলে একশত কহাপন জরিমানা দিতে হতো। ব্রাহ্মণকে শারীরিকভাবে আঘাত করলে দ্বিগুণ জরিমানা দিতে হতো। বৈশ্যদের ক্ষেত্রে এটা আরও শোচনীয় ছিলো। ব্রাহ্মণের সাথে অসদ্ব্যবহারের জন্য বৈশ্যকে ক্ষত্রিয়ের

Dhaka University Institutional Repository

চেয়ে দেড়গুণ বেশি জরিমানা দিতে হতো। ক্ষত্রিয়ের সাথে অশোভন আচরণের জন্য একজন ব্রাহ্মণকে মাত্র পঞ্চাশ কহাপণ জরিমানা দিতে হতো। শূদ্রদের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিশেষ করে শূদ্রদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। শূদ্রের ধর্মে দীক্ষা ও বেদবাক্য উচ্চারণ ও শ্রবণ নিষিদ্ধ ছিল। আইন অমান্য করে বেদবাক্য শ্রবণ করলে শূদ্রদের কর্ণে তপ্ত গলিত সীসা প্রবেশ করানো এবং জিহ্বা কেটে ফেলা হতো। কর প্রদানের ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণেরা সুবিধা ভোগ করতো। ক্ষেত্রবিশেষে তাঁদের কর প্রদান হতে মুক্ত রাখা হতো। তাঁরা কেবল দান-দক্ষিণাই লাভ করতেন না, অধিকন্তু ক্ষেত্র বিশেষে রাজার কোষাগারের অংশীদারও হতেন। এভাবে ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা রক্ষা করা হতো। বেদশাস্ত্রে ব্রাহ্মণদের রাষ্ট্রীয় সুবিধা প্রদানেরও কথা উল্লেখ আছে। উপরোক্ত বিষয় হতে অনুমান করা যায় যে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের অবস্থান সবার উপরে। অর্থাৎ মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণই ছিল শ্রেষ্ঠ।

পক্ষান্তরে বুদ্ধ জন্ম নয়, কর্মের মাধ্যমেই ব্রাহ্মণত্ব নির্ধারণ করেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ক্ষেত্রেও বুদ্ধ অভিন্ন মনোভাব পোষণ করেছেন। অর্থাৎ কাষায় বস্ত্র পরিধান করলেই ভিক্ষু বা শ্রমণ বলে কথিত হবে না, তাঁকে ভিক্ষু বা শ্রমণের উপর্যুক্ত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে। এ প্রসঙ্গে ধর্মপদে[২৮] নিম্নরূপ উল্লেখ আছে :

বাহিত পাপো'তি ব্রাহ্মণো
সমচরিয়া সমণো'তি বুচ্চতি
পব্বজয়মত্তনো মলং
তস্মা পব্বজিতো'তি বুচ্চতি। (গাথা ৩৮৮)

'ন জটাহি, ন গোত্তেহি ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচি সো চ ব্রাহ্মণ। (গাথা ৩৯৩)

ন চাহং ব্রাহ্মণং ব্রুমি যোনিজং মত্তিসম্ভবং
ভোবাদি নাম সো হোতি স বে হোতি সকিঞ্চনো;
অকিঞ্চনং অনাদনং তম্হং বমি ব্রাহ্মণং। (গাথা ৩৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ, যিনি বিগত পাপ তিনি ব্রাহ্মণ, যিনি শমাচারী তিনি শ্রমণ বলে উক্ত হন; তেমনি যিনি আত্মমল বিদূরিত করেছেন, তাঁকেই প্রব্রজিত বলা হয়। জটা, গোত্র বা জন্মের দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না। যাঁর মধ্যে সত্য ও ধর্ম বিদ্যমান তিনিই পবিত্র এবং তিনিই ব্রাহ্মণ। যদি কেহ রাগ-দ্বেষাদি কুলষ যুক্ত হয় হয়, তবে ব্রাহ্মণ মাতৃসম্ভূত বলে আমি তাকে ব্রাহ্মণ বলি না; সে কেবল 'ভো-বাদী' নামে অভিহিত হতে পারে। যিনি অকিঞ্চন ও অনাদান তাঁকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি।

তেবিজ্জসূত্রে[২৯] বুদ্ধ বলেছেন, কেবল ত্রিবেদ জ্ঞাত হলেই ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করা যায় না। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার জন্য তর্ক ও বেদ আলোচনাই যথেষ্ট নয়। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে হলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হতে হয়। ত্রিপিটকের বহু স্থানে বুদ্ধ ন্যায়পরায়ণতা, লোভ-দ্বেষ-মোহ হীনতা, শান্ত-দান্ত, সুসমাহিত এবং পাপ মুক্ত থাকা, শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা সম্পন্ন হওয়া প্রভৃতি প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষুর গুণাবলী হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে।

বজ্রসূচী গ্রন্থে[৩০] লেখক মানব প্রবৃত্তির নিরিখে ব্রাহ্মণের যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নে দেয়া তুলে ধরা হলো :

"আমি তাঁকেই ব্রাহ্মণ বলি যিনি সকল দায়মুক্ত, শৃঙ্খলমুক্ত এবং সকল বন্ধন অতিক্রম করতে পেরেছেন। ভোগান্তির দায়কে যিনি হত্যা করতে পেরেছেন এবং সকল সংযুক্তি-সংসক্তি থেকে যিনি মুক্ত; তিনিই ব্রাহ্মণ। যে তার নিজস্ব আচার প্রকৃতির রূঢ়তা বর্জন করে সকল স্বার্থ, সকল পার্থিব বাসনা থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন তিনি ব্রাহ্মণ। যে তার কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে, পার্থিব কলুষতামুক্ত তিনি ব্রাহ্মণ বলে বিবেচিত হবেন। যাঁর নিকট হতে লালসা, কু-ইচ্ছা এবং ঈর্ষা ঝরে পড়ে গেছে তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি শুধু টিকে থাকার বাসনা যাঁর নিকট বিলীন হয়ে গেছে কারণ দৈহিক সম্ভোগকে তিনি তুচ্ছজ্ঞান করতে পেরেছেন এবং গৃহহীন হয়ে নির্জনবাসী হয়েছেন । ক্ষুদ্র স্বার্থ ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে না। যে কোন প্রিয়দর্শন বস্তু হতে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ধ্বংসাত্মক ও শাস্ত্র নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড থেকে তিনি দূরে থাকেন। যিনি ব্রাহ্মণ তিনি অদত্তবস্তু গ্রহণ করেন না। তাঁকে আমি ব্রাহ্মণ বলি যার হাতে

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষমতা থাকে কিন্তু সে কোনো প্রাণীর উপর এ ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। সচল, নিশ্চল যাই হোক না কেনো কাউকে সে বিরক্তও করে না, হত্যাও করে না। ব্রাহ্মণের ধর্ম ও বৈশিষ্ট্য হলো : সহনশীলতা, সহানুভূতি প্রদর্শন, বোধশক্তির নিয়ন্ত্রণ, বদান্যতা, শুদ্ধতা, দয়া, শিক্ষা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি।"

লেখক ব্রাহ্মণ ও সাধারণ মানুষের সমতা প্রতিপন্ন করেছেন এভাবে : 'আনন্দ-দুঃখ, জীবন-জরা-মৃত্যু, বুদ্ধিমত্তা, ক্রিয়া-কর্ম, আচার-নিষ্ঠা, যৌন-সম্ভোগ, ভয় ইত্যাদি জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেখানে সাদৃশ্য আছে; সেখানে একজন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে স্পষ্টতই কোন পার্থক্য নেই।"

এভাবে বজ্রসূচী গ্রন্থে কেবল ব্রাহ্মণীয় ধর্মের তত্ত্ব ও সামাজিক প্রথাকেই শুধু কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয় নি, অধিকন্তু মানবতাকে সবার ঊর্ধ্বেও তুলে ধরা হয়েছে। বিশেষত যুক্তির নিরিখে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের তথা তথাকথিত চর্তুবর্ণের সাম্য অবস্থা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এই গ্রন্থের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে যে লেখক একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণের লেবাসে মহৎ গুণাবলীর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরোক্ষভাবে তিনি বুদ্ধবাদের প্রচার করেছেন। শুধু এটাই নয়, তিনি তাঁর সমকালীন ধর্ম সংস্কারকদের একটা পরিবর্তনের ধারা অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তুলে এনেছেন।

এই গ্রন্থেও বহু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্রের[৩১] সমাবেশ ঘটিয়ে নৈতিক শিক্ষাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে। চরিত্রগুলো হলো : অচল (গাথা ৭), অগস্ত্য (গাথা ৭), অর্ণি (গাথা ২২), দ্রোণাচার্য (গাথা ৮), গৌতম (গাথা ৮), ইন্দ্র (গাথা ১৮), কপিল (গাথা ৭, ৮), কণ্ঠমুনি (গাথা ৩০), কৌশিক (গাথা ৭, ৮), কেশপিঙ্গল (গাথা ৭ 7), কুন্তি (গাথা ৪, ৬), কুশিকা (গাথা ৯), মহেশ্বর (গাথা ১৮), নারদ মহামুনি (গাথা ১৮), পাণ্ডু (গাথা ৩২), পাণিনী (গাথা ১৮), রাবণ (গাথা ১২), রেনুকার পুত্র রাম (গাথা ৯), শৃঙ্গ ঋষি (গাথা ৯, ২৫, ৩০), সূর্য (গাথা ৫), তিত্তিরী ঋষি(গাথা ৮), উমা (গাথা ১৮), উর্বশী (গাথা ১০), বশিষ্ট (গাথা ১০, ২৪, ৩০), বৈশম্পায়ন (গাথা ৩১, ৩২, ৩৪), বিশ্বমিত্র মহামণি (গাথা ১০, ২৬, ৩০), ব্যাস (গাথা ৯, ৩৩), এবং যুধিষ্ঠির (গাথা ৩১, ৩২)।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত বিষয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায়, বজ্রসূচী গ্রন্থের লেখক অশ্বঘোষ হোক বা না হোক তিনি যে বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র, বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন তথা ত্রিপিটক প্রভৃতি উৎস হতে তথ্য সংগ্রহণ করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৩.৩. শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র

এই গ্রন্থটি নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে. যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, গ্রন্থটি সূচনা এবং সমাপ্ত হয় গাথার মাধ্যমে। তবে গ্রন্থটি গদ্যে রচিত এবং পাঁচটি অধ্যায়ে বা ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশ বা অধ্যায় হচ্ছে ভূমিকা, যাতে গ্রন্থ লেখার কারণ বা উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাযানের মৌলিক নীতিগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মহাযানী মতবাদের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মহাযান চর্চার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় মহাযান চর্চার উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত ভাব বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ গ্রন্থে মহাযানী বোধিসত্ত্ববাদের ধারণা ও মাহাত্ম্য বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে এবং মাধ্যমিক শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ দর্শনের সংমিশ্রণও লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া, এ গ্রন্থে মহাযানী দর্শনের ধারাবাহিক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়।[৩২] তাদের যুক্তি হলো যে এই গ্রন্থটির সাথে তাঁর দুই কাব্যের (বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ) দর্শনের কোন সাদৃশ্য নাই। তুলানামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যের বিষয়বস্তুতে হীনযান দর্শনের অনিত্য, দুঃখ এবং অনাত্ম দর্শন প্রাধান্য লাভ করেছে। অপরদিকে, শ্রদ্ধোৎপাদ শাস্ত্রে মহাযান দর্শনের মৌলিক বিষয় 'তথাতা' (Suchness, True likeness, Absolute truth, True Nature, External soul, True model, Ond mind etc.) প্রাধান্য লাভ করেছে।[৩৩] বিশেষত, শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের নিম্নোক্ত তিনটি ধারণা হীনযানী (Hinayana) আদর্শ থেকে গ্রন্থটিকে আলাদা করে দেয় :

ক) গুণাগুণের ধারণা (The conception of suchness, Bhutatatthata)

খ) ত্রিকায়া তত্ত্ব (The theory of triple personality)

গ) বিশ্বাসের দ্বারা মুক্তি লাভ অথবা সুখাবতী মতবাদে বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক মুক্তি লাভ (The salvation by faith or the Sukhavati doctrin)

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, বিশেষত প্রথম তিনটি মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠানের কারণ আলোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে বিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।[৩৪] বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর থেকে অশ্বঘোষের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধ বিনয়ের কঠোর নিয়মগুলো এবং দার্শনিক চিন্তা-চেতনা পরিবর্তিত হতে থাকে, যা ঐতিহাসিকভাবে একটা স্বাভাবিক বিবর্তন বলে ধারণা করা হয়। বিশেষত, হিন্দু দার্শনিকদের সাথে প্রতিযোগিতা শুরু হলে বৌদ্ধরা গঙ্গা অববাহিকার পশ্চিমে প্রবেশ করে। এ অঞ্চলটি ছিল উপনিষদ দর্শনের পিতৃভূমি। এর সংস্পর্শে এসে বৌদ্ধ-দর্শনের বিবর্তন বেগবান হয় এবং বৌদ্ধগণ ধর্মবাণী প্রচারে সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'অশোকাবদান' (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০-১০০ অব্দ), মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, দিব্যাবদান প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধের জীবন-দর্শনের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা সময় অতিবাহিত হওয়ার ও বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিতে গ্রিক কলা, ইরানীয় দর্শন, ভারতীয় শিল্প সাহিত্যের উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে বৌদ্ধিক ধারণাগুলোর বিবর্তন বেগবান হতে থাকে এবং নতুন নতুন চিন্তা-চেতনার আলোকে সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। কুষাণযুগে এই বিবর্তন ও সমৃদ্ধি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বলা যায়, এই বিবর্তন ঘটেছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কারণে। প্রথম দিকের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলো শুধু বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নির্বাণলাভের পথ দেখিয়ে দিতেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ের গ্রন্থগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাশাপাশি সাধারণ ধার্মিক মানুষকেও সত্যের পথের সন্ধান দিতে থাকে। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দিকে এই ধারাটি বিশেষ মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে, যা অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে নিজের মুক্তির কথা বর্ণিত হলেও সৌন্দরনন্দ কাব্যে অপরের মুক্তির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। ক্রমে কর্মবাদের সঙ্গে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাও স্থান করে নেয়। এ ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থের গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কিত

লেখকের অভিমতে। নিম্নে অভিমতটি তুলে ধরা হলো :

"সকল সত্তার মধ্যে মহাযানে বিশুদ্ধ বিশ্বাস জন্মানোর জন্য, তাদের সংশয় দূর করার জন্য, মিথ্যা মতবাদের উপর তাদের আসক্তি ধ্বংসের জন্য এবং বুদ্ধের মতবাদে তাদের অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য আমি এই ধর্মোপদেশ লিখেছি।"[৩৫]

উপরোক্ত অভিমত হতে প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃতির সঙ্গে বৌদ্ধিক ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন সূচিত হয, যা ক্রমে মাধ্যমিক শূণ্যবাদ, যোগাচার, বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ-দর্শন উদ্ভবের পথ প্রশস্ত করেছিল। তার অন্যতম কারণ হচ্ছে : ক) প্রথমত, বিনয়ের কঠোর নিয়মগুলো সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজে প্রতিপালনীয় ছিল না, যা বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে; খ) দ্বিতীয়ত, এই বিবর্তন বৌদ্ধ ধর্মপ্রচারকদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন এনেছিল এবং বিবর্তিত ধর্ম-দর্শন সহজে প্রতিপালনীয় হওয়ায় প্রচারকগণ স্থানীয় জনসাধারণের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এ কারণে, খ্রিস্টপূর্ব শতকের পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থগুলোতে বিবর্তিত ধর্ম-দর্শন ও চিন্তা-চেতনার প্রাধান্য লাভ করে। অতএব, বলা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তীকালে বিবর্তিত বৌদ্ধ-দর্শনই ছিল শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থের মূল উৎস এতে ধর্মীয় ভাবনার বিবর্তনের রেকর্ড আছে, যে বিবর্তনগুলো হয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে।

৩.৪. গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উৎস

গ্রন্থটি ক্ষুদ্র এবং মাত্র ২৯টি গাথায় রচিত। বুদ্ধের গুণাবলী, বিহারে গমন ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণের সুফল প্রভৃতি এ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।[৩৬] এছাড়াও, এ গ্রন্থে কাশ্মীরের দুঃশাসনের কথাও বর্ণিত আছে। চীন, জাপান, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, বিশেষত মহাযানী দেশসমূহে ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে সূত্র আবৃতি করতে দেখা যায় এবং এই প্রক্রিয়াকে সেসব দেশে পূণ্যকর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়। পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটকের বুদ্ধবংস গ্রন্থে বুদ্ধের স্তুতি লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, খুদ্দকনিকায়ের খুদ্দকপাঠ গ্রন্থে বহু সূত্র রয়েছে যেখানে বুদ্ধের প্রশংসা ও স্তুতি বাক্য পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়েও বুদ্ধস্তুতি রয়েছে। ফলে আলোচ্য গ্রন্থের উৎস হিসেবে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনকে চিহ্নিত করলে অত্যুক্তি হবে না।

৪. উপসংহার

সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষের সকল গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বুদ্ধের জীবন-দর্শন ও তাঁর শিষ্যগণের দীক্ষা কাহিনি এবং অধিকাংশ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উৎস গ্রহণ করা হয়েছে পালি ত্রিপিটক হতে। তবে অশ্বঘোষ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণশাস্ত্রে হতে বহু ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক চরিত্রের উপমা এবং উদ্ধৃতি গ্রহণ পূর্বক বর্ণিত বিষয়বস্তুর যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন, যা অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণশাস্ত্রের প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, সংসারত্যাগ ও প্রব্রজ্যা গ্রহণের তত্ত্ব ও ঘটনা উপস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সাধারণ, মানবিক, সামাজিক এবং এমনকি গৃহজীবনের নানা কথাও অশ্বঘোষ তাঁর সাহিত্যকর্মে উপস্থাপন করেছেন কুশলতার সঙ্গে। তাছাড়া, বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করার মানসে বিচক্ষণতার সঙ্গে অশ্বঘোষ বহু পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রও উপস্থাপন করেছেন। ফলে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত হলেও তাঁর সরল স্বাভাবিক সামাজিক অনুচিন্তন এবং রচনা চাতুর্য্যে তিনি তাঁর রচনাকে শুষ্ক ধর্মগ্রন্থ থেকে পৃথক করে কালজয়ী সাহিত্যের মর্যাদা দিয়েছে। বলা যায়, রচনা কুশলতায় তাঁর সাহিত্যকর্ম ধর্মীয় ভাবনা পরিবেশনের পাশাপাশি লোকায়ত পরিবেশ সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া, অশ্বঘোষ সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তুতে দু'ধরণের আবেদন লক্ষ্য করা যায় : ধর্মকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া। একটির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজে আলোকিত হওয়া এবং অপরটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যকে আলোর পথে নিয়ে আসা।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. কলিকাতাস্থ নবপত্র প্রকাশন হতে 'সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার' সিরিজে প্রকাশিত 'বুদ্ধচরিতম্' গ্রন্থের আলোকে এই সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২. *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 16.

৩. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit., p. 19-23.

৪. ibid., p. 15-18.

৫. *History of Indian Literature*, vol. II, op. cit., p. 260.

৬. *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., p. 58.

৭. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২।

৮. *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 18.

৯. *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., p. 59.

১০. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৮।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮।

১২. *A Record of the Buddhist Religion as Preactised in India and teh Malay Archipelago by I-Tsing*, op. cit., p. 152f.

১৩. সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৬১।

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূতী।।
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা।
সুন তান্তি-ধ্বনি বিলসই রুণা।।
আলি-কালি বেণি সারি মুণেআ।

গঅবর সমরস সান্ধি গুণিআ।

জবে করহা করহকলে পিচিউ।

বতিস তান্তি-ধনি সএল ব্যাপিউ।।

নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী।

বুদ্ধ-নাটক বিসমা হোই।।

১৪. আশা দাস, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৭৫ বাংলা, পৃ. ২৭৪-৪২৩।

১৫. G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names*, Musndhiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd., 1998, Vol. II., p. 11.

১৬. *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 19.

১৭. ibid., p. 21.

১৮. স্থবির, *থেরগাথা*, রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৩৫, পৃ. ১৬৭-১৬৮; R. Morris and E. hardy (ed.), *Anguttara Nikaya*, Vol. I., P.T.S. London, 1985, p. 25; *Dhammapadatthakatha*, Vol. I., p. 103f; Herman Oldenberg (ed.), *Vinaya Pitaka*, P. T. S. London, 1982, Vol. IV., p. 173.

১৯. *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 18.

২০. 'সৌন্দরনন্দম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২১. *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 20-21.

২২. V. Trenckner and R. Chalmers, *Majjhima Nikaya*, P. T. S. London, 1887, vol. I., p. 150; *থেরগাথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯, ৫১৪; *Dhammapadatthakatha*, Vol. II., p. 93.

২৩. 'শারিপুত্রপ্রকরণম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১তম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

Dhaka University Institutional Repository

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১৩।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

২৬. থেরগাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫; *Majjhima Nikaya*, op. cit, p. Vol. II., p. 54ff.

২৭. ঈশান চন্দ্র ঘোষ (অনু.), *জাতক*, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৬৮; *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit., p. 36-37.

২৮. সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *ধর্মপদ*, শ্রীমতি মনোরমা বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১০৬-১০৭।

২৯. রাজুগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের (অনু), *দীর্ঘ নিকায়*, ডাক্তার শ্রীযুত শুধাংশু বিমল বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত, রেঙ্গুন, ১৯৬২, পৃ. ১৯৯১-১৯৩।

৩০. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit., p. 38-39; *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 22-36.

৩১. *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 36.

৩২. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit., p. 39-40,

৩৩. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op. cit., p. 36ff; *Buddhacarita or Acts of the Buddha*, op. cit., p. xxxii-xxiii; *History of Indian Literature*, vol. II, op. cit., p. 260; *Asvaghosa and His Times*, op. cit., p. 36-43.

৩৪. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ. ৩২৩-৩৪৩।

৩৫. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op. cit., p. 48.

৩৬. *Buddhacarita or Acts of the Buddha*, op. cit., p. xxxii.

চতুর্থ অধ্যায়

অশ্বঘোষের রচনাশৈলী, রচনার উদ্দেশ্য এবং স্বাজাত্যবোধ

১. ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তুর স্বরূপ ও উৎস সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষের সকল সাহিত্যকর্মের উপজীব্য বিষয় বুদ্ধের জীবন-দর্শন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি ত্রিপিটক হতে উৎস গ্রহণ করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যকর্ম যে মহৎ বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে রচিত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়বস্তুর মহত্ত্বের পাশাপাশি রচনাশৈলীর সৌকর্য এবং রচনার উদ্দেশ্য যদি মহৎ না হয় তখন সেই সাহিত্যকর্ম সমাজে যেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারে না তেমনি সদর্থক ভূমিকাও রাখতে পারে না। মূলত এই তিনটি গুণের উপর একজন লেখকের কৃতিত্ব ও রচনার সার্থকতা নির্ভর করে। তবে সেই কৃতিত্ব ও সার্থকতা আরো ঋদ্ধ হয় যখন সেই সাহিত্যকর্ম স্বদেশী উপাদান বা ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধারণ করে রাখে। এই অধ্যায়ে অশ্বঘোষের রচনাশৈলী, রচনার উদ্দেশ্য এবং স্বাজাত্যবোধ সমীক্ষা করা হবে। কারণ, এই বিষয়গুলো বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে অশ্বঘোষের অবদান পরিমাপক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এটি সর্বজন স্বীকৃত যে, বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ই অশ্বঘোষকে সর্বাধিক যশ-খ্যাতি এনে দিয়েছিল। এই দু'টি কাব্যের সংস্কৃত পুথিও আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কাব্যদ্বয় যে অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা সে বিষয়েও মতভেদ নেই। তাই, প্রস্তাবিত বিষয়টি প্রকটিত করার ক্ষেত্রে এই দু'টি কাব্যকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

২. অশ্বঘোষের রচনাশৈলী : প্রেক্ষিত বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্য

মানুষ সুন্দরের পূজারী। সুন্দরের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে শিল্প, কলা ও সাহিত্য। সভ্যতার ক্রমোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতিও ক্রমবিকাশ লাভ করতে থাকে। ফলে মানুষ নিজে এবং

Dhaka University Institutional Repository

গৃহের সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি মনের প্রকাশিত ভাবকে হৃদয়াগ্রাহী ও সুন্দর করতেও সচেষ্ট হলো। এভাবে সৃষ্টি হলো কাব্যালংকার, যা ভাষাকে রমণীয় করে সর্বজনের চিত্তবিনোদনকারী করে তুলতে পারে। সংস্কৃত আলংকারিকাচার্য ভামহ বলেছেন, 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্।'[১] শব্দ সমষ্টিকে কাব্য হতে হলে এক বিশিষ্ট ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। এই প্রকাশ ভঙ্গিমাকে আচার্য দণ্ডী 'মার্গ' হিসেবে অভিহিত করেছেন, যা অষ্টম শতাব্দীর আলংকারিক আচার্য বামন অভিহিত করেছেন 'রীতি' নামে। সাধারণত দেশ, কাল, পাত্র ভেদে কাব্য রচনায়, বাক্যের পদবিন্যাস প্রণালীতে পার্থক্য ঘটে। অলংকার শাস্ত্রে এই প্রণালীর নাম রীতি। আচার্য বামন কাব্যরীতিকে কাব্যের আত্মা হিসেবে অভিহিত করেছেন। নানা অলংকারে ভূষিত হলেও লাবণ্যবর্জিত নারীদেহ লোকপ্রিয় হয় না। তদ্রূপ কাব্যরীতি গুণ বর্জিত কাব্য হৃদয়গ্রাহী হয় না। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ছয় প্রকার কাব্য রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা : বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী, অবন্তিকা, লাটীয়া, মাগধী এবং চেতি।[২] তবে সকল আলংকারিক সকল রীতি সমর্থন করেন না। আচার্য দণ্ডী বৈদর্ভী ও গৌড়ী; আচার্য বামন বৈদর্ভী , গৌড়ী ও পাঞ্চালী; বিশ্বনাথ কবিরাজ বৈদর্ভী , গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী রীতি সমর্থন করেন। রাজশেখর বৈদর্ভী , গৌড়ী ও পাঞ্চালী এই তিনটি রীতিকে সমর্থন করেছেন। রীতিসমূহের মধ্যে বৈদর্ভী ও গৌড়ী - এই দু'টিই মুখ্য রীতি। কারণ, অন্যান্য রীতিগুলো মিশ্ররীতি এবং এদের স্বাতন্ত্র্য নেই। পণ্ডিতদের মতে, গৌড়ী ও বৈদর্ভী রীতির সংমিশ্রণে পাঞ্চালী রীতির উদ্ভব ঘটেছে। মাধুর্য্য ও সৌকুমার্যের সমাবেশ হয় পাঞ্চাল রীতিতে। পাঞ্চালীর রীতির সঙ্গে বৈদর্ভী রীতির মিশ্রণে অবন্তিকা রীতির উদ্ভব। সবকটি রীতির মিশ্রণে লাটী রীতির জন্ম। মাগধী সম্পূর্ণ রীতি নয়, খণ্ডরীতি।[৩] চৈতী রীতির অনুরূপ। বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতি ব্যতীত অন্যান্য রীতিগুলো মিশ্রাতিমিশ্রণের ফলে উদ্ভব হওয়ায় সেই রীতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির পার্থক্য প্রকৃতিগত। গৌড়ীরীতি বিকট ও উদ্ধত, অপরদিকে বৈদর্ভী রীতি হলো সুকুমার ও সুললিত। গৌড়ী রীতি সমাস বহুলা, ওজঃ ও কান্তিগুণ বিশিষ্ট হয়। বৈদর্ভী রীতি অসমাসা শ্লেষাদিগুণাদি বিশিষ্ট হয়। আচার্য দণ্ডী বৈদর্ভী রীতিকে আদর্শরীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। আলংকারিকগণের মতে, বৈদর্ভীরীতি সর্বোত্তম

রীতি এবং সর্বগুণের আধার। সকল আলংকারিক এই গুণের প্রশংসা করেছেন এবং কালজয়ী কবি কালিদাস এই রীতিকে অবলম্বন করে তাঁর সকল কাব্য রচনা করেছেন এবং বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন।

এ. বি. কীথ[৪], ই. এইচ. জনস্টন[৫] এবং এম. উইন্টারনীর্টস[৬] প্রমুখ গবেষকগণ অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে অনুসৃত রচনাশৈলী সমীক্ষাপূর্বক অভিমত পোষণ করেছেন যে, অশ্বঘোষ কাব্যদ্বয়ে বিদর্ভরীতি অবলম্বন করেছেন। নিম্নে অশ্বঘোষের উপরোক্ত কাব্যদ্বয়ে অনুসৃত 'রীতি' সমীক্ষার আলোকে পণ্ডিতদের অভিমত কতটুকু যথার্থ তা প্রতিপন্ন করা হলো।

রীতির তারতম্য ঘটে মূলত দশটি কাব্যগুণের ভিত্তিতে - শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি ও সমাধি।

শ্লেষ গুণটি বৈদর্ভী ও গৌড়ী উভয় রীতিতেই অভিপ্রেত। বৈদর্ভী রচনা কোমল। সেই কারণে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ অক্ষর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও যথাস্থানে মহাপ্রাণ ও সংযুক্ত বর্ণের সুসন্নিবেশহেতু বৈদর্ভ রচনায় শৈথিল্যদোষ ঘটে না। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে মহাপ্রাণ ও সংযুক্ত অক্ষরের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, যা কাব্যদ্বয়কে শৈথিল্যযুক্ত করেছে।

বৈদর্ভী রীতির অপর অপরিহার্য গুণ হলো প্রসাদগুণ। কিন্তু গৌড়ীয়গণ এই গুণকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন না। সাধারণত, রীতি অনুসারে প্রসাদগুণ বিশিষ্ট বাক্যের অর্থ হয় প্রসিদ্ধ, নিহিতার্থতা দোষ রহিত। প্রসিদ্ধার্থ শব্দে সহজবোধ্য বাক্যই প্রসাদগুণের পরিচায়ক। বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে অশ্বঘোষের ব্যবহৃত বাক্য দ্রুত অর্থবোধ জন্মায়, যা উত্তম কাব্যের লক্ষণ এবং এই গুণটি অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয়কে সারল্য দিয়েছে।

বর্ণ বিন্যাসগুণই হচ্ছে সমতা। এই গুণটি বৈদর্ভীরীতিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে অনভিপ্রেতও নয়। বাক্যে সাধারণত তিন প্রকার বাক্য বিন্যাস ব্যবহৃত হয়। যথা : মৃদুবন্ধ, স্ফুটবন্ধ এবং মধ্যম বা মিশ্রবন্ধ।[৭] বৈদর্ভীরীতিতে সাধারণত মধ্যমবন্ধই প্রিয়। অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয়ে বর্ণ বিন্যাসের সৌকর্য

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষণীয়। বিশেষত অনুপ্রাস ব্যবহারের মাধ্যমে বর্ণিত কাব্যদ্বয়ে সমতাগুণটি রক্ষিত হয়েছে।

মাধুর্য গুণটি বৈদর্ভী ও গৌড়ী উভয় রীতিতেই অভিপ্রেত। এই গুণটি কখনো বাক্যের কখনো অর্থের উৎকর্ষ সাধন করে। এই দু'টি গুণ, বিশেষত শ্রুত্যনুপ্রাসের ব্যবহার অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয়ে রসের পুষ্টি সাধন করেছে।

সৌকুমার্য গুণটি বৈদর্ভী রীতিতে অভিপ্রেত, কিন্তু গৌড়ীয় রীতিতে অভিপ্রেত নয়। বৈদর্ভমতে অর্থ ও অলংকারের চমৎকারিত্ব না থাকলেও শুধু সৌকুমার্যতা গুণে বাক্য কাব্য হতে পারে। সর্ব কোমলাক্ষরযুক্ত বাক্যই সৌকুমার্য গুণযুক্ত হয়। উগ্রাক্ষর মিশ্রিত কোমল বর্ণ বিন্যাস হচ্ছে সুকুমারতা। কোমলাক্ষর ও উগ্রাক্ষরের মিশ্রণে সৌকুমার্যের উদ্ভব। মুক্তমালার মাঝে শোভনীয় রত্ন স্থাপনের মতো কোমলাক্ষরের মাঝে মাঝে উগ্রাক্ষরের বিন্যাস বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ের শ্লোকে লক্ষ্য করা যায়, যা অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয়কে সৌকুমার্যতা দান করেছে।

অর্থব্যক্তি গুণটি বৈদর্ভী ও গৌড়ী উভয়রীতিতে অভিপ্রেত। এই গুণটি কাব্যের বাক্যে ব্যবহৃত ঘটক পদগুলোর অর্থ প্রতীতি জন্মায়। এই গুণটির কারণে কষ্টকল্পনার মাধ্যমে অর্থোদ্ধার করতে হয় না। অশ্বঘোষ অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা -এই ত্রিবিধ বৃত্তি বা অর্থব্যক্তি গুণের মাধ্যমে বাক্যের পদগুলোর সহজবোধ্য অর্থ প্রতিপন্ন করেছে, ফলে তাঁর কাব্য দুবোর্ধ্যতার ভারে জর্জরিত নয়।

উদারত্ব গুণটিও বৈদর্ভী ও গৌড়ী উভয় রীতিতে অভিপ্রেত। এই গুণটি বাক্যের অপরূপ বর্ণনাভঙ্গি এবং অপূর্ব ব্যঞ্জনায় বর্ণনীয় বিষয়ের শৌর্যাদির উৎকর্ষতার প্রকাশ ঘটায়। তাই এই গুণটিকে কাব্যের জীবন হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে সিদ্ধার্থ গৌতম ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে নন্দের যে জীবন চরিত অঙ্কন করেছেন তাতে বিশেষণযুক্ত বাক্যের প্রাচুর্য দেখা যায়, যা অশ্বঘোষের কাব্যদ্বয়ের উদারত্ব গুণ প্রকাশ করে।

সমাস বাহুল্যই রচনাকে ওজস্বী করে। দীর্ঘসমাস জনিত পদের ব্যবহারই ওজঃ গুণের বৈশিষ্ট্য। এই গুণটি বৈদর্ভীগণ সাধারণত গদ্যে ব্যবহার করতে অধিক পছন্দ করেন। তবে অশ্বঘোষের কাব্যে দীর্ঘসমাসজনিত পদের বহু ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

কান্তি গুণ বৈদর্ভগণের বিশেষ প্রিয়। লোকপ্রসিদ্ধ বস্তুর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনাই কান্তিগুণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অশ্বঘোষের বর্ণনা নিপুণতায় বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যের প্রতিটি আলোচ্য বিষয়, বিশেষত রাজা শুদ্ধোধন, রানী মায়াদেবী, সিদ্ধার্থ গৌতম, সারথী ছন্ন, ঋষি অসিত, বুদ্ধের ভ্রাতা নন্দের জীবন চরিত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে, যা কাব্যদ্বয়ের অন্যতম কান্তি গুণ প্রকাশ করে। তাছাড়া বৈদর্ভী রীতির অপর বৈশিষ্ট্য সমাধি গুণটিও বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যের ছত্রে ছত্রে লক্ষ্য করা যায়, যা কাব্যদ্বয়ের ভাষাকে ওজস্বী ও গাম্ভীর্য ব্যঞ্জক করে তুলেছে।

উপরোক্ত বিষয় সাক্ষ্য দেয়, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে আলংকারিক শাস্ত্র নির্দেশিত কাব্যরীতির দশটি অবিচ্ছেদ্য গুণ রক্ষিত হয়েছে।

বৈদর্ভী রীতির অপর একটি বিশিষ্ট গুণ হচ্ছে অলংকারের ব্যবহার। বিশেষত উপমা, রূপক এবং অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারের ব্যবহার কাব্যকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে, কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে এবং কাব্যকে সরলতা দানকে। এখন বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে কি ধরণের অলংকারগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে তা অন্বেষণ করবো।

শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য, ই. এইচ. জনস্টন, এ. বি. কীথ এবং মুরারী মোহন সেন বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে ব্যবহৃত ছন্দোলংকার নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং গবেষণাকর্মে প্রমাণ করেছেন, অশ্বঘোষ তাঁর কাব্যদ্বয়ে প্রচুর অলংকার ব্যবহার করেছেন।[৮] তাঁরা অশ্বঘোষের কাব্যে ব্যবহৃত অলংকারসমূহও নির্দেশ করেছেন। সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে ব্যবহৃত অলংকারসমূহের মধ্যে উপমা, রূপক এবং অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারের আধিক্য রয়েছে। নিম্নে বুদ্ধচরিত কাব্যে ব্যবহৃত কতিপয় উপমা, রূপক এবং অনুপ্রাস-এর উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

উপমা :

নিশাম্য চ চ্ছন্দক কন্থকাবুভৌ সুতস্য সংশ্রুত্য চ নিশ্চয়ং স্থিরম্।

পপাত শোকাভিহতো মহীপতিঃ **শচীপতেবুর্ত্ত ইবোৎসবে ধ্বজঃ**।। (বু.চ. ৮/৭৩)

অনুবাদ : ছন্দক এবং কন্থক উভয়কে দেখে এবং পুত্রের স্থির সংকল্পের কথা শুনে শোকাহত নরপতি মাটিতে পড়ে গেলেন, শচীপতির উৎসবের অবসানে ধ্বজের মতো।

বংশশ্রিয়ং গর্ভগতাং বহন্তী **প্রাচীব কল্পে বিররাজ রাজ্ঞী**

সা শোকমোহক্রমবর্জিতাপি ঘনং বনং গন্তুমিয়েষ দেবী।। (বু.চ. ১/৫)

অনুবাদ : গর্ভস্থ বংশসম্পদ্ করে রানী শোভিত হলেন প্রভাতকালীন পূর্বদিকের মতো, তাঁর কোন শোক, মোহ বা ক্লান্তি ছিল না, তবুও তাঁর ইচ্ছা হলো তিনি গভীর বনে যাবেন।

রূপক :

কামার্থমজ্ঞঃ কৃপণং করোতি প্রাপ্নোতি দুঃখং বধবন্ধনাদি।

কামার্থমাশাকৃপণস্তপস্বী মৃত্যুং শ্রমং চার্ছতি জীবলোকঃ।। (বু. চ. ১১/৩৪)

অনুবাদ : বিষয়ের জন্য মূঢ়গণ দীনের ন্যায় আচরণ করে এবং বধ, বন্ধন প্রভৃতি দুঃখভোগ করে। বিষয়ের জন্য আশায় দীন ক্লেশসহিষ্ণু জীবজগৎ ক্লান্তি ও মৃত্যুকে বরণ করে।

ততঃ শরত্তোয়দপাণ্ডুরেষু ভূমৌ বিমানেষ্বিব রঞ্জিতেষু।

হর্ম্যেষু সর্বর্তুসুখাশ্রয়েষু স্ত্রীণামুদারৈর্বিজহার তূর্যৈঃ।। (বু.চ. ২/২৯)

অনুবাদ : তখন তিনি প্রাসাদে-প্রাসাদে রমণীগণের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন - সেই প্রাসাদ শরৎকালের মেঘের মতো শুভ্র, মর্ত্যে অবতীর্ণ দেবরথের ন্যায় রঞ্জিত এবং সমস্ত ঋতুতে সুখের আশ্রয়।

দুঃখার্ণবাদ্ ব্যাধিবিকীর্ণফেনাজ্জরাতরঙ্গান্মরণোগ্রবেগাৎ।

উত্তারয়িষ্যত্যয়মুহ্যমানমার্তং **জগজ্জ্ঞানমহাপ্লবেন**।। (বু.চ. ১/৭০)

অনুবাদ : এই সংসার দুঃখের সমুদ্রের ন্যায় - ব্যাধির ফেণায় বিকীর্ণ, জরার তরঙ্গে উদ্বেল ও মৃত্যুর উগ্রতায় ভয়ংকর; এই সমুদ্রে প্রবাহমান আর্তজগৎকে ইনি জ্ঞানের তরীতে উদ্ধার করবেন।।

অনুপ্রাস :

কনকবলয়ভূষিতপ্রকোষ্ঠৈঃ কমলনিভৈঃ কমলানিব প্রবিধ্য

অবনততনবস্ততোহস্য যক্ষা শ্চকিতগতৈর্দধিরে খুরান্ করাগ্রৈঃ।। (বু.চ. ৫/৮১)

অনুবাদ : তখন যক্ষগণ অবনত দেহে কমলতুল্য হস্তাগ্রের দ্বারা যেন কমলবর্ষণ করতে-করতে অশ্বের খুরগুলো ধারণ করলেন। তাদের হস্তাগ্র স্বর্ণবলয়ে ভূষিত এবং ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন।

পুরমথ পুরতঃ প্রবেশ্য পত্নীং স্থবিরজনানুগতামপত্যনাথাম্।

নৃপতিরপি জগাম **পৌরসংঘৈর্দিবমমরৈর্মঘবানিবার্চ্যমানঃ**।। (বু.চ. ১/৮৭)

অনুবাদ : এরপর সন্তাবতী পত্নীকে রাজা প্রথমে নগরে প্রবেশ করালেন - তাকে অনুগমন করলেন বৃদ্ধজন। ইন্দ্র যেমন দেবগণের অর্চিত হয়ে স্বর্গে গমন করেন - তেমনি রাজাও পৌরজনের অভ্যর্থনা লাভ করে নগরে প্রবেশ করলেন।

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে কাব্যে এমন শ্লোকও পাওয়া যায় যা কেবল বিশেষ্য ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারের মাধ্যমে রচিত। নিম্নে একটি শ্লোক তুলে ধরা হলো :

হতত্বিষোহন্যাঃ শিথিলাংসবাহবঃ স্ত্রিয়ো বিষাদেন বিচেতনা ইব

ন চুক্রুশুর্নাশ্রু জহুর্ন শশ্বসু র্ন চেলুরাসুর্লিখিতা ইব স্থিতাঃ।। (বু. চ. ৮/২৫)

অনুবাদ ঃ অন্য নারীদের জ্যোতি নিভে গেছে, তারা বিষাদে যেন অচেতন, তাদের হাত ও কাঁধ ঝুলে পড়েছে; তারা উচ্চকণ্ঠে কাঁদলেন না, চোখের জলও যেন ফেললেন না, দীর্ঘশ্বাসও ফেললেন না - তারা না নড়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে হলো তারা চিত্রে অঙ্কিত।

অপরদিকে সমীক্ষায় দেখা যায়, সৌন্দরনন্দ কাব্যে অশ্বঘোষ উপমা, রূপক, দীপক, অতিশয়োক্তি, ব্যতিরেক, উৎপ্রেক্ষা এবং সমাসোক্তি প্রভৃতি অলংকার ব্যবহার করেছেন। তবে সৌন্দরনন্দ কাব্যে দীপক, অতিশয়োক্তি এবং উৎপ্রেক্ষা অলংকারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে মুরারী মোহন সেন নির্দেশিত সৌন্দরনন্দ কাব্যে ব্যবহৃত কতিপয় অলংকার উপস্থাপন করা হলো :

উপমা :

তস্মিন্ গিরৌ চারণসিদ্ধজুষ্টে

শিবে হবির্ধূমকৃতোত্তরীয়ে।

আগম্য পারস্য নিরাশ্রয়স্য **তৌ তস্থতুর্দ্বীপ ইবাম্বরস্য**।। (সৌন্দরনন্দ, ১০/৬)

অনুবাদ : তাঁরা সেখানে এসে দাঁড়ালেন; যেন আকাশের কোন দ্বীপের উপর এসে দাঁড়ালেন; সে স্থান চারণ ও সিদ্ধসেবিত, মঙ্গলদায়ক, হোমের ধূম উত্তরীয়ের মত তাকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে।

রূপক :

যস্মাদিমং তত্র চকার যত্নং

তং **স্নেহপঙ্কান্ মুনিরুজ্জিহীর্ষন্**।। (সৌন্দরনন্দ, ৫/১৮)

অনুবাদ : নন্দের চিত্ত বাইরের প্রভাবের বশীভূত, সে যাকে আশ্রয় করে তারই রূপ পায়। তাই মুনি তাঁকে প্রেমপঙ্ক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার জন্য এই চেষ্টা করেছিলেন।

দীপক :

অবেদীদ্বুদ্ধিশাস্ত্রাভ্যামিহ চামুত্র চ ক্ষমম্ ।

অরক্ষীদ্ধৈর্যবীর্যাভ্যামিন্দ্রিয়াণ্যপি চ প্রজাঃ। (সৌন্দরনন্দ, ২/১৫)

অনুবাদ : এই জগতে যা কল্যাণকর তা তিনি জানতে পারতেন বুদ্ধির সাহায্যে, পরলোকে যা হিতকর তা জানতেন শাস্ত্রজ্ঞানের সাহায্যে ধৈর্য্য দিয়ে দমন করতেন ইন্দ্রিয়গুলোকে, প্রজাদের দমন করতেন শক্তিবলে।

অতিশয়োক্তি :

বহ্বায়তে তত্রসিতে হি শৃঙ্গে

সংক্ষিপ্তবর্হঃ শয়িতো ময়ুরঃ।

ভুজে বলস্যায়তপীনবাহো

বৈদূর্যকেয়ূর ইবাবভাষে।। (সৌন্দরনন্দ, ১০/৮)

অনুবাদ : শ্বেত এবং আয়ত শৃঙ্গের উপর ময়ূর পুচ্ছ গুটিয়ে শুয়ে আছে, যেন বলরামের দীর্ঘ ও পুষ্ট বাহুতে বৈদূয্য নির্মিত কেয়ূর।

ব্যতিরেক :

ঋতুর্ব্যতীতঃ পরিবর্ততে পুনঃ।

ক্ষয়ং প্রযাতঃ পুনরেতি চন্দ্রমাঃ।।

গতং গতং নৈব তু সংনিবর্ততে।

জলং নদীনাং চ নৃণাং চ যৌবনম্।। (সৌন্দরনন্দ, ৯/২৮)

অনুবাদ : ঋতু চলে যায় আবার ফিরে আসে, চন্দ্রে ক্ষয় হয় আবার তা বৃদ্ধি ঘটে; কিন্তু নদীর জলধারা বা মানুষের যৌবন একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না।

উৎপ্রেক্ষা :

মৃদুভিঃ সৈকতৈঃ স্নিগ্ধৈঃ কেসরাস্তরপাণ্ডুভিঃ

ভূমিভাগৈরসংকীর্ণৈঃ সাঙ্গরাগ ইবাভবৎ।। (সৌন্দরনন্দ, ১/৭)

অনুবাদ : সেখানে ভূমিভাগ ছিল স্নিগ্ধ, সিক্তময়, কোপর পুষ্পের আচ্ছাদনে হরিদ্রাভ এবং পবিত্র; মনে হত, যেন বিশুদ্ধ ও স্নিগ্ধ মৃত্তিকাচূর্ণের অঙ্গরাগে চিত্রিত।

সমাসোক্তি :

পুষ্যন্তি কেচিৎ সুরভীরুদারা

মালা: স্রজশ্চ গ্রথিতা বিচিত্রাঃ

কর্ণানুকূলানবতং সকাংশ্চ

প্রত্যর্থিভূতানিব কুণ্ডলানাম্। (সৌন্দরনন্দ, ১০/২০)

অনুবাদ : কোনো তুরুতে সুরভিত শোভন মালা, কোনো তুরুতে সেই মালারই বিচিত্র রূপ; কোথাও কর্ণের অনুকুল ফুল, যাকে কর্ণের অলংকাররূপে ব্যবহার করা চলে; এই সকল ফুল যেন কুণ্ডলের প্রতিদ্বন্দ্বি।

উপরোক্ত অলংকার ছাড়াও, সৌন্দরনন্দ কাব্যে সমিল যমকও প্রচুর পাওয়া যায়, যেখানে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার আধিক্য বেশি। তবে এটি গৌড়ীয় রীতিতে বেশি অভিপ্রেত। নিম্নে সমিল যমক অলংকার ব্যবহৃত সৌন্দরনন্দ কাব্যের একটি শ্লোক তুলে ধরা হলো :

চলৎকদম্বে হিমবন্নিতম্বে তরৌ প্রলম্বে **চমরো ললম্বে**।

ছেত্তুং বিলগ্নং ন শশাক বালং কুলোদ্গতাং প্রীতিমিবার্যবৃত্তঃ।। (সৌন্দরনন্দ, ১০/১১)

অনুবাদ : পর্বতের সানুদেশে কদম্বতুর আন্দোলিত হচ্ছে একটি চমর মৃগ শাখায় ঝুলে পড়েছে; তার লেজ আটকে গেছে শাখায়, সে তা খুলে ফেলতে পারছে না - ঠিক যেমন সদ্বংশীয় ব্যক্তি তার কুলাগত প্রীতি ত্যাগ করতে পারে না।

সাধারণত, যমক অংলকারে একই ক্রিয়ারূপের মধ্যে বিভিন্ন ক্রিয়ার অর্থ যোজনা করে, একই ক্রিয়াপদকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করে এক ধরণের শব্দ নিয়ে কবি ক্রীড়া করে। সৌন্দরনন্দ কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সর্গে বেশ কিছু সমিল যমকের উদাহরণ পাওয়া যায়। এছাড়া, বুদ্ধচরিত কাব্যে, বিশেষত প্রথম অধ্যায়ের ১৫ সংখ্যক শ্লোকেও সমিল যমকের উদাহরণ পাওয়া যায়। শাব্দিক নৈপুণ্যে দক্ষতা না থাকলে বা শব্দভাণ্ডারে কবি হৃদয় পূর্ণ না হলে সমিল যমক রচনা করা যায় না। সমিল

যমকের প্রতি অশ্বঘোষের আসক্তি, অশ্বঘোষের রচনায় গৌড়ীয় রীতির প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যদিও সমালোচকগণ তা স্বীকার করেন না। অশ্বঘোষের শব্দ ভাণ্ডারের ঋদ্ধতা দেখে আলংকারিক রাজশেখর তাঁকে 'শব্দকবি' হিসেবে অভিহিত করে সম্মান জানিয়েছেন। কিন্তু ভর্তৃহরি যে অর্থে শব্দকবি অশ্বঘোষকে সেই অর্থে শব্দ কবি কোনক্রমেই বলা চলে না। কারণ, অশ্বঘোষের কাব্যে শব্দনৈপুণ্যের খেলা থাকলেও তা বিরক্তিকর নয়, কাব্যগুণে তা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, অশ্বঘোষের ভাষাশৈলী ছিল অলংকারে সমৃদ্ধ, যা তাঁর রচনাশৈলীকে ঋদ্ধ করেছে এবং কাব্যকে করেছে যুগোত্তীর্ণ। এ প্রসঙ্গে মুরারী মোহন সেনের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

"অশ্বঘোষ ভাষা প্রিয় কবি; তাঁর ভাষার জন্যই (ভাবের জন্য নয়) নাকি তিনি মধ্যযুগকে আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। আধুনিক যুগের পাঠকের কাছে তিনি প্রিয় তাঁর কবি-ভাবনার জন্য, ভাষা তাঁর ভাবের অধীন - পরবর্তীকালের কবি ভর্তৃহরি বা ভারবির সঙ্গে তুলনা করলেই অশ্বঘোষের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য ধরা পড়বে। কাব্য রচনার রীতিতে তিনি রামায়ণ এবং মধ্যযুগীয় কবিদের (ভারবি প্রভৃতি) মধ্যবর্তী।"[৯]

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে ভারতীয় কাব্যাদর্শের সর্বোত্তম রীতি বৈদর্ভী রীতি অনুসৃত হয়েছে।

৩. রচনার উদ্দেশ্য

সংস্কৃত আলংকারিকের মতে, বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় আদর্শ কাব্যের উদ্দেশ্য হবে চতুর্বর্গ ফলদায়ক : ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। অর্থাৎ কাব্যানুশীলনে মানুষ ধর্মে উদ্বুদ্ধ হবে; কাব্য রচনা বা প্রকাশ করে অর্থের অধিকারী হবে; অর্জিত অর্থ দ্বারা সংসার নির্বাহ তথা কামভোগ করবে এবং কাব্যের মর্মবাণী মানুষকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে মোক্ষ লাভের পথে পরিচালিত করবে। সংস্কৃত আলংকারিক নির্দেশিত এই উদ্দেশ্য কেবল কাব্যের ক্ষেত্রেই নয়, সকল প্রকার সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য বলে প্রতীয়মান হয়। এই অনুচ্ছেদে অশ্বঘোষ কী উদ্দেশ্যে তাঁর সাহিত্যকর্ম রচনা করেছিলেন তা সমীক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করা হবে। আলোচ্য বিষয়ে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে প্রাপ্ত তথ্য এবং সাহিত্যকর্মে বর্ণিত বিষয়বস্তুর মর্মবাণী - এই দু'টি বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক আলোচ্য সমস্যা সমাধান করা হবে।

৩.১. সৌন্দরনন্দ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য

সৌন্দরনন্দ কাব্যের সম্পূর্ণ সংস্কৃত পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কাব্যের শেষে 'কবি কথা' নামক অংশে কাব্য রচনার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ইত্যেষা ব্যুপশান্তয়ে ন রতয়ে মোক্ষার্থগর্ভা কৃতিঃ
শ্রোতৃণাং গ্রহণার্থমন্যমনসাং কাব্যোপচারাৎ কৃতা।
যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যদত্র হি ময়া তৎ কাব্যধর্মাৎ কৃতং
পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হৃদ্যং কথং স্যাদিতি।।

প্রায়েণালোক্য লোকং বিষয়রতিপরং মোক্ষৎ প্রতিহতং
কাব্যব্যাজেন তত্ত্বং কথিতমিহ ময়া মোক্ষঃ পরমিতি।
তদ্ধুদ্ধা শামিকং যত্তদবহিতমিতো গ্রাহ্যং ন ললিতং
পাংসুভ্যো ধাতুজেভ্যো নিয়তমুপকরং চামীকরমিতি।। [১০]

অনুবাদ : মুক্তির বিষয় নিয়ে এই কাব্য রচিত, রচিত হয়েছে কাব্যরীতিতে; আনন্দ দান এর উদ্দেশ্য নয়, শান্তির প্রাপ্তি এবং সেই সঙ্গে অন্য বিষয়ে যাদের মন ব্যাপৃত তাদের আকর্ষণ করাই এর লক্ষ্য। সেইজন্য এই কাব্যে মুক্তি ছাড়াও অন্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছি। আস্বাদ যাতে বাড়ে সেইজন্য কাব্যের নীতিকে অনুসরণ করেছি, যেমন তেতো ঔষধকে পানীয় করে তোলার জন্য তাতে মধু মিশিয়ে দেওয়া হয়।

আমি দেখেছি, মানুষ প্রধানত বিষয়ভোগের আনন্দে মত্ত, মুক্তি বিষয়ে তারা বিমুখ; তাই মোক্ষই পরমার্থ এই কথা ভেবে আমি কাব্যের ছলে এখানে তত্ত্বকথা বলেছি। এইকথা বুঝে পাঠক এতে সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করুক যা শান্তির পথে নিয়ে যায় - যা শুধুই আনন্দজনক তা এতে মিলবে

Dhaka University Institutional Repository

না। ধুলিমিশ্রিত সোনার তাল থেকে সোনাকে পৃথক করে নেওয়া হয় - এই কাব্যের পাঠও তেমনি।

সৌন্দরনন্দ কাব্যের উপরোক্ত বিষয় স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় যে, যারা বিষয়ভোগে মত্ত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত এবং মুক্তির বিষয়ে বিমুখ তাদের বুদ্ধ নির্দেশিত দুঃখমুক্তির পথে পরিচালিত করাই অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দ' কাব্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। তাছাড়া, সৌন্দরনন্দ কাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ হতে ষোড়শ সর্গ পর্যন্ত বৌদ্ধ তত্ত্বকথা যেভাবে আলোচিত হয়েছে, তা অশ্বঘোষকে কবির চেয়ে ধর্মপ্রচারক হিসেবেই অধিক প্রতিভাত করে।

৩.২. বুদ্ধচরিত কাব্য রচনার উদ্দেশ্য

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বুদ্ধচরিত কাব্যের সম্পূর্ণ সংস্কৃত পুথি আবিষ্কৃত হয়নি, ১৭টি সর্গ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৭টির সর্গের মধ্যেও চতুর্দশ সর্গের ৫২ সংখ্যক শ্লোক থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত শ্লোকগুলো অশ্বঘোষের রচিত নয়। উক্ত কাব্যের যে তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায়, তাতে ২৮টি সর্গ রয়েছে। এ কারণে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বুদ্ধচরিত কাব্যটি ২৮টি সর্গে বিভক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়। বর্তমান সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধচরিত পাওয়া যায় তাতে 'কবি কথা' অংশটি নেই। ফলে বুদ্ধচরিত কাব্য রচনার উদ্দেশ্য জানা যায় না। তবে সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধচরিতের যে ১৪টি সর্গ অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকৃত তা সমীক্ষা করলে দেখা যায়, কাব্যটিতে 'জন্ম থেকে বুদ্ধত্ব লাভ' পর্যন্ত সিদ্ধান্ত গৌতম তথা গৌতম বুদ্ধের জীবন-চরিত বর্ণিত আছে। উক্ত জীবন-চরিত পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, সিদ্ধার্থ গৌতম মানুষের দুঃখমুক্তির পথের সন্ধান লাভের জন্য পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন, রাজ-ঐশ্বর্য ও রাজসিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেন এবং বিভিন্ন মুনি-ঋষির সান্নিধ্যে, কখনো একা কঠোর তপশ্চর্যা করেন। অবশেষে বুদ্ধগয়ার বোধিতরু মূলে কঠোর ধ্যান-সাধনায় লাভ করেন 'বোধিজ্ঞান' এবং জগতে খ্যাত হন 'বুদ্ধ' নামে। বোধিজ্ঞান লাভের মধ্য দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন 'দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ কথা, দুঃখ নিরোধের উপায় তথা 'আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ' এবং দুঃখের কারণ চক্র

Dhaka University Institutional Repository

'প্রতীত্যসমুৎপাদ' তত্ত্ব। ফলে, বুদ্ধচরিত কাব্যের 'কবি কথা' অংশ আবিষ্কৃত না হলেও ধারণা করা যায় যে, অশ্বঘোষ সৌন্দরনন্দ কাব্যের ন্যায় একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বিষয়ভোগে মত্ত, ক্ষণস্থায়ী আনন্দে নিমজ্জিত, চঞ্চল চিত্তের মানুষের মনে ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করা, বুদ্ধ অনুসৃত দুঃখমুক্তির পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করা এবং দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শন করাই বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল উদ্দেশ্য।

৩.৩. নাটক রচনার উদ্দেশ্য

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, শারিপত্রপ্রকরণ এবং প্রতীকী নাটকের সংস্কৃত পুথির খণ্ডাংশ মাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। নাটকদ্বয়ের আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুথির তেমন একটা পাঠযোগ্যতা নেই। সংস্কৃত পুথির যেটুকু অংশ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে লেখক পরিচিতি অংশটি পাওয়া যায় নি। অপরদিকে রট্ঠপাল বা রাষ্ট্রপাল নাটকের পুথিও আবিষ্কৃত হয়নি। ফলে অশ্বঘোষের নাটক রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল তা জানা যায় না। তবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা সাপেক্ষে নাটক রচনার উদ্দেশ্য অনুমান করা যেতে পারে। সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্র এবং মৌদ্গল্যায়নের দীক্ষা কাহিনী শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকের মূল আলোচ্য বিষয়। বিশেষত, তাঁরা কেন এবং কীভাবে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন তা নাটকটিকে প্রকটিত করা হয়েছে। অপরদিকে প্রতীকী নাটকে মানুষের মনোজগতের মনোবৃত্তি গুলো প্রতীকী নাটকটিতে পাত্র-পাত্রী হিসেবে উপস্থাপন করে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের নৈতিক শিক্ষা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। মানব চরিত্র হিসেবে এ নাটকে একমাত্র বুদ্ধকে উপস্থাপন করা হয়েছে।[১১] শারিপুত্রপ্রকরণ নাটকের ন্যায় রট্ঠপাল নাটকটিও বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে। ফলে নাটকের বিষয়বস্তুর মর্মবাণীর আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, লোভ-দ্বেষ-মোহ এবং তৃষ্ণায় জর্জরিত সাধারণ মানুষকে বুদ্ধের অমিয়বাণী গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং আসবক্ষয়পূর্বক দুঃখমুক্তির ও শান্তির পথে পরিচালিত করাই অশ্বঘোষের নাটক রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৩.৪. শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র গ্রন্থের প্রারম্ভে লেখক গ্রন্থ রচনার আটটি উদ্দেশ্য[১২] ব্যক্ত করেছেন, যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ক. সকল সত্তার দুঃখমুক্তির নিমিত্ত;

খ. তথাগতের শিক্ষার সঠিক অর্থ প্রকাশের জন্য;

গ. যাঁরা নির্বাণের পথে যাত্রা করেছেন, তাঁদের মঙ্গলের জন্য;

ঘ. বৌদ্ধধর্ম শিক্ষানুবীশদের মধ্যে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত ও দৃঢ় করার জন্য;

ঙ. বুদ্ধের সকল অনুসারীদের তৃষ্ণা এবং লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্তির পথ প্রদর্শন করার জন্য;

চ. মিথ্যা-দৃষ্টি পরিহারের পথ প্রদর্শনের জন্য;

ছ. অমিতাভ বুদ্ধের নাম-কীর্তনের ফল বর্ণনার জন্য;

জ. পাঠকের চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন এবং ধ্যান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করা প্রভৃতির জন্য গ্রন্থটি রচনা করা হয়।

উপরোক্ত কারণ বর্ণনা করার পর গ্রন্থটিতে পর্যায়ক্রমে মহাযানের মৌলিক দর্শন, মহাযান দর্শনের ব্যাখ্যা, মহাযান চর্চা এবং মহাযান চর্চার ফল বর্ণনা করা হয়। উক্ত বিষয়সমূহ লেখার কারণ প্রসঙ্গে অশ্বঘোষ বলেন,

"সকল সত্তার মধ্যে মহাযানে বিশুদ্ধ বিশ্বাস জন্মানোর জন্য, তাদের সংশয় দূর করার জন্য, মিথ্যা মতবাদের উপর তাদের আসক্তি ধ্বংসের জন্য এবং বুদ্ধের মতবাদে তাদের অবিচ্ছিন্ন বিশ্বাস জাগ্রত করার জন্য আমি এই ধর্মোপদেশ লিখেছি।"[১৩]

অশ্বঘোষের শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রের বিষয়বস্তুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুমন কান্তি বড়ুয়া বলেন, 'প্রাত্যহিক জীবনে মানুষ যে সমস্ত চেতনা ও সংস্কারের কারণে বিভ্রান্ত হতে পারে, তিনি সেই বিষয়গুলোকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে এই গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন।'

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্রে বর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হলেও মর্মবাণী একই, অর্থাৎ মানুষকে বুদ্ধ নির্দেশিত দুঃখমুক্তির ও চিরশান্তি নির্বাণের পথে পরিচালিত করা।

৩.৫. অন্যান্য গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য

অশ্বঘোষের অন্যান্য (বিতর্কিত) গ্রন্থগুলোতে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে বিষয়বস্তু পর্যালোচনা সাপেক্ষে আলোচ্য বিষয়ে ধারণা লাভ করা যায়। বজ্রসূচী গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ সাম্যনীতির আলোকে তথাকথিত জাতিভেদ প্রথার অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে লেখক ধর্মশাস্ত্র, মনুসংহতিা এবং বেদ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণিত ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য উদ্ধৃতি প্রদান পূর্বক বুদ্ধ নির্দেশিত ব্রাহ্মণের প্রকৃত স্বরূপ উপস্থাপনের মাধ্যমে তথাকথিত জাতিভেদ প্রথার মূলে কঠোরাঘাত করা হয়েছে এবং কর্মগুণ, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের আলোকে মানুষের পরিচিতি নির্ধারণ ও মনুষ্যত্বের জয়গান করা হয়েছে। লেখকের মতে, দুঃখ-বেদনা, জীবনচর্যা, বিচার-বুদ্ধি, পেশা, জন্ম-মৃত্যু, ভয়-ভালবাসা, যৌনতা প্রভৃতিতে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের একই অনুভূতি, যা চতুর্বর্ণের সাম্য অবস্থা প্রতিপন্ন করেছে। মানব সমাজে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠাই গ্রন্থটির বিষয়বস্তুর মূল আবেদন। এ প্রসঙ্গে জে. কে. নরিমন (J. K. Nariman) এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

"*In this tract the doctrine of equality of mankind has been advocated : for all human beings are, `in respect of joy and sorrow, love, insight,manners and ways, death, tear and life, all equal.' --- It would be of much greater importance for the literary history of India on account of teh quotations from Brahmanic texts.*"[১৪]

বজ্রসূচী গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আবেদন পর্যালোচনা সাপেক্ষে সুমন কান্তি বড়ুয়া[১৫] মনে করেন, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের চেতনাকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যেই অশ্বঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। যাহোক, গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বজ্রসূচী গ্রন্থে সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও 'মানবজাতির সাম্যাবস্থা প্রতিপন্ন করাই' বজ্রসূচী গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষের অপর (বিতর্কিত) গ্রন্থ সূত্রালংকার গ্রন্থেও গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে গ্রন্থটির বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দীর্ঘ নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, জাতক, ধর্মপদ, থেরগাথা, বিনয় পিটক এবং অবদান গ্রন্থ হতে বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। রাজকুমার দীর্ঘায়ু কাহিনি, রাজা শিবির কাহিনি, অকুশলকর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে ধর্মে দীক্ষা দানে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্রের অসম্মতি এবং পরবর্তীতে বুদ্ধ কর্তৃক দীক্ষা দান, কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের অন্তিম জীবন, নির্বাণ লাভের জন্য গৌতমী কর্তৃক বুদ্ধকে পূজা দান এবং বুদ্ধের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শনের নানা কাহিনি এ গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।[১৬] আলোচ্য গ্রন্থের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নৈতিক কাহিনি বা গল্পই এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য বিষয়। ফলে লেখক বুদ্ধের অন্যতম দর্শন নৈতিকতা শিক্ষা দানের মাধ্যমে মানুষকে বুদ্ধ নির্দেশিত দুঃখমুক্তি তথা নির্বাণের পথে পরিচালিত করাই গ্রন্থটির রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

অশ্বঘোষের গণ্ডীস্তোত্র, শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র এবং ষড়গতিকারিকাহ্ প্রভৃতিতেও গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সরাসরি উল্লেখ নেই। কিন্তু বিষয়বস্তু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বুদ্ধের গুণাবলী, বিহারে গমন ও ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণের সুফল প্রভৃতি গণ্ডীস্তোত্র গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র গ্রন্থে একশত পঞ্চাশটি স্তুতি গাথার মাধ্যমে বুদ্ধস্তুতি এবং ষড় পারমিতার বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। ষড়গতিকারিকাহ্ গ্রন্থে কর্মফলের কারণে মানুষের ষড়গতি লাভের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও, এ গ্রন্থে অকুশল কর্মের ফলে মানুষ অবীচি নরকে জন্মগ্রহণপূর্বক ভয়াবহ দুঃখভোগ করার বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণত, বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ এবং বিহারে গমনের ফলে মানুষ অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকার এবং কুশলকর্ম সম্পাদনের প্রেরণা লাভ করে। গৃহী বৌদ্ধরা নিত্য বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘের গুণাবলী স্মরণ এবং নিয়মিত বিহারে গমন পূণ্যকাজ হিসেবে গণ্য করে থাকেন। উক্ত দু'টি বিষয় তাঁরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পন্ন করে থাকেন। কারণ, তা ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে। মহাযানী দেশগুলোতে ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে শ্রদ্ধার সঙ্গে বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ করার রীতি এখনো প্রচলিত আছে। অপরদিকে,

Dhaka University Institutional Repository

পারমিতার অনুশীলন বৌদ্ধদের অত্যবশ্যক কর্ম হিসেবে বিবেচিত। ফলে, বিষয়বস্তুর আলোকে ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা জাগ্রত করা, মানুষকে কুশল কর্ম সম্পাদনে ও পাপকর্মে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করা এবং দুঃখমুক্ত নির্বাণের পথে পরিচালিত করা প্রভৃতি গণ্ডীস্তোত্র, শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র এবং ষড়্গতিকারিকাহ্ গ্রন্থত্রয় রচনার অভিপ্রায় হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

তাছাড়া, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখেছি অশ্বঘোষ তাঁর সাহিত্যকর্মে বহু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্র উপস্থাপন করেছেন এবং অধিকাংশ চরিত্র ধার্মিক ও সজ্জন ব্যক্তির। সেসব চরিত্র নৈতিকতায় ভাস্বর, ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয়। ফলে ধারণা করা যায় যে, মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতা জাগ্রত করাও অশ্বঘোষের গ্রন্থ রচনার অভিপ্রায় ছিল।

৪. অশ্বঘোষের স্বাজাত্যবোধ

একজন লেখকের স্বদেশ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সাহিত্যকর্মে নিহিত থাকা বা ধারণকৃত স্বদেশী উপাদানের মাধ্যমে। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে প্রসঙ্গক্রমে ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, যা অশ্বঘোষের স্বদেশ প্রেমের স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অনন্য উৎস হিসেবেও গণ্য করা যায়। এই অনুচ্ছেদে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম, বিশেষত বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয় সমীক্ষার আলোকে তাঁর স্বাজাত্যবোধ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হবে।

৪.১. প্রাচীন ভারতের জনপদ

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবকাঠামো তথা গ্রাম, নগর, বন্দর, জনপদ সম্পর্কে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িককালে ভারতবর্ষ ষোলটি মহাজনপদে বিভক্ত ছিল। অঙ্গুত্তরনিকায়, মহাবস্তু, ললিতবিস্তর, জৈন ভাগবত সূত্র প্রভৃতিতে ষোলটি জনপদের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু চূল্লনির্দেশ গ্রন্থে সতেরটি

জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। জাতক গ্রন্থে জনপদসমূহ রট্‌ঠ বা রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। তবে উক্ত গ্রন্থে ষোলটিরও অধিক জনপদের নামোল্লেখ আছে। উপরোক্ত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত জনপদসমূহের নামের মধ্যে মিল-অমিল উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। তবে অধিকাংশ নামের ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। মৈত্রী তালুকদার[১৭] তাঁর 'পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবয়ব : একটি সমীক্ষা' শিরোনাম শীর্ষক প্রবন্ধে তুলনামূলক পর্যালোচনা সাপেক্ষ জনপদসমূহের একটি তালিকা তৈরী করেছেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বৌদ্ধ সাহিত্য (পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য)			
অঙ্গুত্তর নিকায়	চূল্লনিদ্দেস	মহাবস্তু	জৈন ভাগবতী সূত্র
১। অঙ্গ	১। অঙ্গ	১। অঙ্গ	১। অঙ্গ
২। মগধ	২। মগধ	২। মগধ	২। বঙ্গ (ভঙ্গ)
৩। কাসি (কাশী)	৩। কাশী	৩। কাশী	৩। মগহ (মগধ)
৪। কোসল (কোশল)	৪। কোশল	৪। কোশল	৪। মলয়
৫। বজ্জি (বৃজ্জি)	৫। বজ্জি	৫। বজ্জি	৫। মালব (মালবক)
৬। মল্ল	৬। মল্ল	৬।। মল্ল	৬। অচ্ছ
৭। চেতি (চেদি)	৭। চেদি	৭। চেদি	৭। বচ্ছ (বৎস)
৮। বংস (বংশ)	৮। বংস	৮। বৎস	৮। কোচ্ছ (কচ্ছ?)
৯। কুরু	৯। কুরু	৯। কুরু	৯। পাঢ় (পাণ্ড্য বা পৌণ্ড্র)
১০। পাঞ্চাল	১০। পাঞ্চাল	১০। পাঞ্চাল	১০। লাঢ় (লাট বা রাঢ়)
১১। মচ্চ (মৎস)	১১। মচ্চ (মৎস)	১১। মৎস	১১। বজ্জি (ভজ্জি)
১২। সূরসেন (শূরসেন)	১২। সূরসেন	১২। সূরসেন	১২। মোলি (মল্ল)
১৩। অস্‌সক (অশ্মক)	১৩। অস্‌সক	১৩। অস্‌সক	১৩। কাসি (কাশী)
১৪। অবন্তি	১৪। অবন্তি	১৪। অবন্তি	১৪। কোসল (কোশল)
১৫। গান্ধার	১৫। কম্বোজ	১৫। শিবি	১৫। অবাহ
১৬। কম্বোজ	১৬। যোন	১৬। দর্শান	১৬। শম্ভুত্তর (শুম্ভত্তর)
	১৭। কলিঙ্গ		

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের ন্যায় অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যেও প্রাচীন ভারতের বহু জনপদ এবং জনপদসমূহের গ্রাম, নগর, বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ তাঁর কাব্যে মূলত বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষাকেই প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মে বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনপদ, গ্রাম, বন্দর, নগরসমূহই প্রাধান্য লাভ করছে। বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্য সমীক্ষায়

Dhaka University Institutional Repository

দেখা যায়, নিম্নোক্ত জনপদ, গ্রাম নগরের কথা কাব্যদ্বয়ে বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে : কপিলাবস্তু (বু.চ. ১/৮৯), কুরু (বু. চ. ৪/১০), কাশী (বু.চ. ১১/১), মগধ (বু.চ. ১১/১), লুম্বিনী (বু.চ. ১/৬), কাশীর রাজধানী বেনারস (সৌন্দরনন্দ ৩/১০), মগধের রাজধানী রাজগৃহ (সৌন্দরনন্দ ৩/১০, ১৫), অল্লকপ্প, কেসপুত্ত, সুংসুমারগিরি, রামগ্রাম, কুশিনারা, পাবা, পিপ্পলিবন, বিদেহ, মিথিলা এবং বৈশালী।

পালি সাহিত্য সাক্ষ্য দেয় যে, উপরোক্ত জনপদসমূহে বুদ্ধ সবচেয়ে বেশি বিচরণ করেছেন এবং এসব জনপদ মধ্যদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৮] অশ্বঘোষ মধ্যদেশকে হিমালয় ও পরিয়াত্রা পর্বতের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। [১৯] ফলে অশ্বঘোষের সময়কালে হিমালয় থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত মধ্যদেশের অন্তর্ভূক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। এছাড়া, অশ্বঘোষ তাঁর সাহিত্যকর্মে বিন্ধ্যকোষ্ট, বিন্ধপাদ, পারিযাত্রা, মগধ, রাজগৃহ, হিমবন্ত এবং পাণ্ডব পর্বতের কথা উল্লেখ করলেও মধ্যদেশের পূর্ব এবং পশ্চিম সীমারেখা সম্পর্কে স্পষ্ট কিছুই নির্দেশ করেন নি। তবে তিনি যেসব স্থানের নাম উল্লেখ করেছেন তা হতে ধারণা করা যায় যে, মধ্যদেশ উত্তরে হিমবন্ত বা হিমালয়, দক্ষিণ-পশ্চিমে বিন্ধপর্বত বা পারিযাত্রা এবং পূর্বে মগধের পাণ্ডব পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহাকবি কালিদাস তাঁর 'কুমারসম্ভব' কাব্যে যেভাবে হিমালয় পর্বতকে কান্তিমান করেছেন আমাদের কবি অশ্বঘোষ হিমালয়কে সেভাবে সুস্পষ্ট করেননি। তবে তিনি হিমালয়ের কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন যা তপস্বীদের শান্তি ও নীরবতার জন্য অপরিহার্য ছিল এবং তাঁদের আশ্রম নির্মাণ উপযোগী পরিবেশ সেখানে বিদ্যমান ছিল।[৯] অশ্বঘোষ বিন্ধ্য পর্বতের (বু. চ. ৮/৩৮) পাশের অনেক বিখ্যাত পর্বতচূড়া ও তাদের শাখা-প্রশাখার নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন: কৈলাশ (বু. চ. ২/৩০), মন্দরা (বু. চ. ৬/১৩) এবং মেরু বা সুমেরুর (বু. চ. ১/৩৭, ৫/২৬)। তিনি বিন্ধ্যা পর্বতকে পাথর ও গাছপালায় পরিপূর্ণ [২০] বলে উল্লেখ করেছেন। এসব বিখ্যাত পর্বতের নাম প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যেও উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাদেব এবং পার্বতীর আবাসস্থল হওয়ার জন্য কৈলাশের খ্যাতি সর্বত্র বিদিত। মহাভারতে মন্দরাকে হিমালয়ের অন্যতম একটি শ্রেণি বলা হয়েছে। এই মহাকাব্য অনুসারে, এটা পূর্বে অবস্থিত এবং খুব

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভবত গন্ধমদন পর্বতের অংশ। অশ্বঘোষ মন্দরাকে সুউচ্চ এবং রৌদ্রময় পর্বত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, মন্দরা পর্বতে কিন্নররা বসবাস করতো, যারা মূল্যবান রত্ন ব্যবহার করে পর্বতে বিচরণ করতো, শিল্পকলায় দক্ষ এবং সব সময় মুখে মিষ্টি হাসি লেগে থাকতো।[২১]

অশ্বঘোষ সৌন্দরনন্দ কাব্যে উল্লেখ করেছেন যে, কপিলাবস্তু জনপদটি কপিল মুনির নামানুসারে নামকরণ হয়েছিল এবং ইক্ষ্বাকুবংশ জনপদটি গড়ে তুলেছিল, যা শাক্যবংশের রাজধানী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁর মতে, নগরটি হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল। কপিলাবস্তু বুদ্ধের জন্মভূমি হওয়ায় অশ্বঘোষের নিকট তা আদর্শ নগরী হয়ে ওঠে। তাই নগরটির কথা অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ উভয়কাব্যে বহুবার উল্লেখ করেছেন। তিনি নগরটির রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'বাগান, মন্দির, আশ্রম, মঠ, ঝর্ণা, জলাশয়, কুঞ্জবন ইত্যাদিতে নগরটি সাজানো ছিলো। কপিল মুনির আশ্রম ছিলো ফুলে ফলে ভরা। শিকারি পশু ও হরিণেরা সেখানে মুক্তভাবে বিচরণ করতো।'[২২] অশ্বঘোষের কপিলাবস্তু নগরীর বর্ণনার সঙ্গে মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থের সাগল নগরীর বর্ণনার মিল পাওয়া যায়। অশ্বঘোষ সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনীকে সুন্দর, দেবকানন তুল্য এবং ধ্যানের পক্ষে অনুকূল বন হিসেবে এবং কাশী জনপদকে পবিত্র নগরী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাজগৃহ নগরী পাঁচটি পর্বত ও তপ্তকুণ্ড দ্বারা সুরক্ষিত ও সুশোভিত, রাজগৃহের সকল গৃহ শ্রীসম্পন্ন এবং মগধের পাণ্ডব পর্বত হাতির কানের মতো গাঢ় নীল বর্ণের ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।

৪.২. নদ-নদী

প্রাচীনকালে নদ-নদী দ্বারা জনপদ, গ্রাম ও নগরীর সীমারেখা নির্ধারণ করা হতো। এ কারণে প্রাচীন সাহিত্যে নদ-নদীর প্রচুর বর্ণনা পাওয়া যায়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যেও বহু প্রাচীন নদ-নদীর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রধান নদীগুলোর বর্ণনা প্রদান করা হলো :

গঙ্গা একটি পৌরাণিক নদী। এটা ভারতবর্ষে পবিত্রতম নদী হিসেবে বিবেচিত। ঋগ্বেদ, রামায়ণ, ধর্ম-সূত্র এবং পুরাণশাস্ত্রে এই নদীর উল্লেখ আছে। বিভিন্ন লেখকের বর্ণনায় এই নদী মহিমান্বিত রূপ লাভ

করেছে। এখনো পবিত্র নদী হিসেবে এটি সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র মতে, স্বর্গ থেকে গঙ্গার উৎপত্তি, যা শিবের জটা প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং হিমাবত হতে হিমালয়ের পাদদেশ হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে গঙ্গা হিমালয় হতে প্রবাহিত হওয়ার কথা বর্ণিত আছে।[২৩]

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যে গঙ্গার মহিমান্বিত রূপ লক্ষ্য করা যায়। গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে সিদ্ধার্থ রাজগৃহে গমন করেছিলেন বলে বুদ্ধচরিত কাব্যে উল্লেখ আছে। অশ্বঘোষ বরুণা, অসি, মন্দাকিনী এবং যমুনাকে গঙ্গার শাখা নদী হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং গঙ্গার উদর হতে ভীষ্মের জন্ম কথার বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, বারাণসী নগরী বরুণা ও অসি নদীর মধ্যবর্তী স্থানে, মগধ সোণ ও গঙ্গার নদীর মধ্যবর্তী স্থানে এবং কুরু ও কাশী জনপদ গঙ্গার তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। তিনি আরো বলেন, বরুণা নদী বারাণসীর উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত, অপরদিকে অসি নদী বারাণসীর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত এবং অসি ও বরুণা নদীর নামানুসারে স্থানটি 'বারাণসী' নামে ভূষিত হয়েছিল। তিনি পুনরায় বলেন, বুদ্ধের সময় বরুণা ও অসি নদীর তীর ঘনবনে আকীর্ণ ছিল এবং এই দু'টি নদীর সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গমস্থল পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য করা হতো। উল্লেখ্য যে, উক্ত স্থানটি এখনো পবিত্র স্থান হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

অশ্বঘোষ সৌন্দরনন্দ কাব্যে মন্দাকিনীকে স্বর্গের পবিত্র নদী বলে বর্ণনা করেছেন।[২৪] রামায়ণে এবং পালি অঙ্গুত্তরনিকায় গ্রন্থেও নদীটির নামোল্লেখ পাওয়া যায়। মূলত এটি হলো কালীগঙ্গা অথবা পশ্চিমা কালী অথবা মন্দাকিনী, যা গড়ওয়ালের কেদার পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এটা গঙ্গার অলকানন্দা ও গঙ্গার উপনদী।

পালি সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি যে নদীটির নামোল্লেখ পাওয়া যায় তা হচ্ছে নৈরঞ্জনা নদী। বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভ এবং মহাপরিনির্বাণের ঘটনার সঙ্গে নদীটির সম্পর্ক রয়েছে বিধায় বৌদ্ধ সাহিত্যে নদীটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ফা-হিয়েনের[২৫] মতে, কুশিনগরের উত্তরে এই নদীটির অবস্থান।

নদীটি বর্তমানে 'ফল্গু' (Phalgu) নামে পরিচিত। অশ্বঘোষের মতে, এই নদীর তীরে বুদ্ধের সঙ্গে পঞ্চবর্গী শিষ্যগণের সাক্ষাৎ হয়েছিল।[২৬] পালি সাহিত্যে, বিশেষত জাতকে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে সিদ্ধার্থের অসাধারণ তপস্বী-জীবনের কাহিনি বর্ণিত আছে।

পালি সাহিত্যে[২৭] বর্ণিত বড় পাঁচটি নদীর মধ্যে যমুনা অন্যতম। 'মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থে যমুনাকে শ্রেষ্ঠ দশটি নদীর মধ্যে একটি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। মূলতঃ এটি একটি প্রাচীন নদী যা ঋগ্বেদেও (X. 75, 5) উল্লেখ আছে। অশ্বঘোষ[২৮] এই নদীকে উৎকৃষ্ট নদীর একটি আখ্যা দিয়ে বলেন, এর জল গাঢ় নীল এবং এর ঢেউ ছিল ফেনিল।

৪.৩. প্রকৃতি : বৃক্ষ, ফুল-ফল

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে বহু বন-বনানী, ফুল-ফলের বর্ণনা পাওয়া যায়, যা অশ্বঘোষের প্রকৃতি প্রেমের স্বাক্ষর বহন করে। তিনি বন-বনানীকে ভূ-পৃষ্টের উপন্যাস তথা জীবন কাহিনি হিসেবে অভিহিত করেছেন।[২৯] তাঁর সাহিত্যকর্মে ঋতুকালীন এবং বারমাসি হরেক রকম গাছপালার প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি পর্বত চূড়ার সমান বহু বিশাল বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং পারিজাত বৃক্ষকে সমস্ত রাজকীয় বৈশিষ্ট্যের আধার হিসেবে অভিহিত করেছেন। নিম্নে তাঁর সাহিত্যকর্মে বর্ণিত প্রধান প্রধান বৃক্ষগুলোর নামোল্লেখ করা হলো :

নাগবৃক্ষ, নাগ-কেশর, গন্ধপর্ণ, পারিজাত, পাইন, তমাল, শাল, কদম্ব, প্রিয়াঙ্গু, পিপল, মন্দরা অথবা কোরাল, তাল, কর্ণিকারা, লোধ্র, অশোক, নাগবৃক্ষ, শাল, কর্ণিকার (Karnikara), মন্দার (Mandara), অশ্বত্থ, আমড়া, তিলক, কুর্বক, আম, জম্বু, ঘৃতকুমারী, চন্দন এবং বট।

এই বৃক্ষগুলো ছাড়াও অশ্বঘোষ অসিপত্রবন[৩০] অর্থাৎ ঘন-তরবারি-পাতাযুক্ত বৃক্ষ (Dark-sword-Leaved) এবং নানারকম বন্যবৃক্ষ সমৃদ্ধ (Dark-sword-Leaved) বনের কথাও বলেছেন। উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে কবির জ্ঞান অসাধারণ যখন তিনি বলেন যে, 'ঋতুকালীন ব্যতীত উদ্ভিদের

Dhaka University Institutional Repository

পাতার রং দেখে উদ্ভিদ চেনা যায়।' ফুল-ফল সমেত বন-বনানীর কথা ছাড়াও তিনি কিছু বিশেষ ফল-বৃক্ষের কথা বলেছেন। তন্মধ্যে আম, বদরী ফল, কদলী, জম্বর অন্যতম।[৩১]

ফলজ বৃক্ষের পাশাপাশি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে নানান গঠনের, বর্ণের, গন্ধের এবং ঋতুর ফুলের বর্ণনাও পাওয়া যায়। তিনি যেসব ফুলের বর্ণনা প্রদান করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সিতপুষ্প, মাধবী, পারিজাত, মন্দার, অগস্ত্য, কুন্দ, সরস, চম্পক, কর্ণকার, বকুল, পলাশ, অশোক, নাগকেশর, জাফরান, জলপদ্ম। তিনি 'সিতাপুষ্প'[৩২] ফুলের রং সাদা, দেখতে খুবই সুন্দর এবং সাজ-সজ্জায় ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি মাধবী ফুল পূজার অর্ঘ্যে, মন্দরা ফুল অভ্যর্থনা জানানোর ক্ষেত্রে এবং অগস্ত্য, সাদা বর্ণের কুন্দ, সরস , চম্পক, কর্ণকার ফুলসহ অন্যান্য শ্বেত-বর্ণের ফুল পতাকা-দণ্ডের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৩] তিনি আমের মুকুলকে[৩৪] বিশেষ সুগন্ধময় ফুল হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যার সুগন্ধে কোশীল পাখি আকৃষ্ট হতো। তিনি এটিকে আবেগ উত্তেজক এবং ঈশ্বরের প্রেমের ফুল হিসেবে আখ্যা দিয়ে একে 'পুষ্পকেতু' অভিধায় ভূষিত করেছেন। তিনি হিমালয়ের ঢাল এবং কপিল গৌতম আশ্রমের ভূমি জাফরানের[৩৫] হলুদাভ বর্ণে আচ্ছন্ন থাকতো বলে উল্লেখ করেছেন। এই ফুলকে বিশুদ্ধ পার্থিব বস্তুর সমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হতো। তিনি লাল, নীল, সাদা বিভিন্ন বাহারী পদ্মেরও উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, জলে যেসব ফুল ও উদ্ভিদ জন্মাত তন্মধ্যে পদ্মই শ্রেষ্ঠ। আবার বাহারি ধরনের পদ্মের মধ্যে জলপদ্ম[৩৬] বেশি জনপ্রিয় ছিল। জলে জন্মালেও এটি জল দ্বারা প্রভাবিত নয়। পদ্মের মুকুল সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জেগে ওঠত এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যেত। তাঁর কাব্যে পদ্মের প্রচুর উপমা লক্ষ্য করা যায়, যা নিম্নোক্ত উক্তিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় :

কাচিৎ পদ্মবনাদেত্য সপদ্মা পদ্মলোচনা

পদ্মবক্ত্রস্য পার্শ্বেঽস্য পদ্মশ্রীরিব তস্থুষী। (বু. চ. ৪/৩৬)

অর্থাৎ পদ্মবন থেকে কোন পদ্মলোচনা পদ্ম হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল, তারপর পদ্মানন সেই রাজকুমারের পাশে পদ্মশ্রীর মতো এসে দাঁড়াল।

এছাড়াও অশ্বঘোষ বহু লতা-গুল্মের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সিন্ধুবার নামক এক প্রকার লতা-গুল্মের ঝোঁপের কথা উল্লেখ করেছেন, যা পুকুর পাড়ে জন্মে এবং বৃদ্ধি লাভ করে। তিনি ঘন ঝোঁপকে 'গুল্ম' (Gulam) এবং কণ্টকযুক্ত ঝোঁপকে 'সারগুল্ম' নামে অভিহিত করেছেন (সৌন্দরনন্দ, ৫/৮)। তিনি ফুল-সমেত বহু লতাগুল্মের কথা বলেছেন, বিশেষত পুষ্পসমৃদ্ধ অতিমুক্তা লতা-গুল্ম , যা আম্রবৃক্ষ বেয়ে উপরে ওঠে যেত। তিনি এমন বাগানের বর্ণনা দিয়েছেন যা ফুলসমৃদ্ধ লতাগুল্মে পূর্ণ হয়ে নিকুঞ্জের[৩৭] ন্যায় হয়ে যেতো, যেখানে পথিকগণ বিশ্রাম নিতে পারতো।

তিনি তাঁর কাব্যে ঘাসের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। নরম ঘাসকে তিনি শাদ্বল এবং বনের সৌন্দর্য্য হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি কুশ এবং দুর্বা ঘাসের কথা বেশি উল্লেখ করেছেন, যা দেবতার অর্ঘ্য প্রদানে ব্যবহৃত হতো।

৪.৪. প্রাণীকূল

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে বিশেষত *বুদ্ধচরিত* ও *সৌন্দরনন্দ* কাব্যে জলে, স্থলে এবং অন্তরীক্ষে বিচরণকারী বহু প্রাণীরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : হাতি, ঘোড়া, সিংহ, মৃগ, বাঘ, ভালুক, মেষ, গরু, উট, হরিণ, শুকর, গরুড়, গাধা, বানর, পিঁপড়া, সর্প, মাছ, কুমীর, হংস, ময়ূর, কোশীল, কবুত এবং নানা পৌরাণিক পাখী। অশ্বঘোষ তাঁর কাব্যে তুর্গ, তুরঙ্গ, বাজিবর, অশ্ব, হয় (Haya) প্রভৃতি নানাজাতের ঘোড়ার সাথে আমাদের পরিচয় করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, সাদা রঙের ঘোড়াকে সর্বোৎকৃষ্ট ঘোড়া হিসেবে বিবেচনা করা হতো।[৩৮] সম্ভবত হরিণ অশ্বঘোষের খুবই প্রিয় ছিল। তিনি হরিণকে তপস্বীদের সাথে তুলনা করে বলেছেন, 'বুদ্ধ যখন ধ্যান করতেন তখন হরিণগুলো শান্ত থাকতো।' অশ্বঘোষ *বুদ্ধচরিত* কাব্যে নানা জাতের সাপের মধ্যে ভুজঙ্গ এবং কৃষ্ণ-সর্প সবচেয়ে বিষাক্ত সাপ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি কিছু অদ্ভুত স্বর্গীয় পাখিরও বর্ণনা দেন, যাদের লাল ঠোঁট, স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো চোখ, লাল দাগযুক্ত ঘন বাদামি ডানা রয়েছে। তিনি স্ত্রী-

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় এক প্রকার পাখির কথা উল্লেখ করেছেন, যা শোক উৎপন্ন করে এমন চিৎকারের জন্য বিখ্যাত। জলাশয়ের পাশে বসবাসকারী এ পাখি নিঃসঙ্গ থাকতে পছন্দ করে। অশ্বঘোষ এই পাখীর কান্নার শব্দকে গৌতমীর কান্নার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ পাখি ভীতু স্বভাবের। অশ্বঘোষ করণ্ডব (Karandavas) এবং চক্রবাক (Cakravaka) নামে দু'টি জল পাখির কথা বলেছেন। করণ্ডব[৩৯] হলো হাঁসজাতীয় পাখি। আর, চক্রবাক হচ্ছে রাজহাঁস জাতীয় পাখি। একে ব্রাহ্মণীয় হাঁসও বলা হয়।

৪.৫. সমাজ জীবন

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ধর্ম ও ধার্মিকের জীবনী অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের মূল উপজীব্য বিষয়। তবে সন্ন্যাস জীবনের মহিমা কীর্তনের পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজ জীবন সম্পর্কিত বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে সমগোত্রীয় বিবাহ প্রথার পাশাপাশি অসম-গোত্রীয় ও বহু বিবাহেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে ভাই-বোনের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হলেও বৌদ্ধ সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে এরূপ বিবাহের কথা উল্লেখ দেখা যায়। পালি দীর্ঘনিকায়ের অট্ঠকথা সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থ সাক্ষ্য দেয় যে, রাজা ওক্কাকের প্রধান মহিষীর চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। প্রধান মহিষীর মৃত্যু হলে রাজা অপর এক নারীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভজাত সন্তানকে রাজসিংহাসনের উত্তারাধিকারী মনোনীত করার আশ্বাস প্রদান করেন। বিবাহের পর রাজা তাঁর সন্তানদের বিতারিত করলে তাঁরা কপিলাবস্তু নগরে কপিল মুনির আশ্রমের পাশে বসতি স্থাপন করেন এবং রাজপুত্রগণ বোনদের বিবাহ করে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। অশ্বঘোষের *বুদ্ধচরিত* কাব্যে ভাই-বোনের বিবাহের কথা উল্লেখ না থাকলেও বহু বিবাহের উল্লেখ আছে। উক্ত কাব্য পাঠে জানা যায়, সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন মায়াদেবী এবং মহাপ্রজাপতি নামক দু'বোনকে বিবাহ করেছিলেন। সৌন্দরনন্দ কাব্যে স্বামীকে 'আর্যপুত্র' এবং 'পতিদেবতা' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।[৪০] ফলে ধারণা করা যায় যে, স্বামী মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে সতিদাহ

প্রথা ও অসম-গোত্রীয় বিবাহের কথাও উল্লেখ আছে। বিধবা বিবাহের কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও *বুদ্ধচরিত* কাব্যে বিধবার করুণ জীবন-কাহিনির বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪১] এছাড়াও অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে জাতিভেদ প্রথারও উল্লেখ পাওয়া যায়।

৪.৬. ধার্মিক ব্যক্তিত্ব

অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম যেহেতু বুদ্ধের জীবন-দর্শনের ভিত্তিতে রচিত সেহেতু তাঁর রচনায় বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াবলি প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে বিক্ষিপ্তভাবে বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া গেলেও বুদ্ধের জীবন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কথাই প্রাধান্য লাভ করেছে। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে, বিশেষতঃ সৌন্দরনন্দ কাব্যের ষোড়শতম সর্গে বহু বুদ্ধশিষ্যের কথা উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা নানা কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। নিম্নে সৌন্দরনন্দ কাব্যে বর্ণিত কতিপয় প্রধান শিষ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

আনন্দ থের (সৌন্দরনন্দ, ১১/৮) : আনন্দ ছিলেন বুদ্ধের মামাতো ভাই। তিনি বুদ্ধের নিকট দীক্ষিত হন এবং বুদ্ধের প্রধান সেবক ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেশিত সকল ধর্ম স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। এজন্য, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি 'ধর্মভাণ্ডাগারিক' নামেও পরিচিত ছিলেন। প্রথম মহাসঙ্গীতিতে তিনি ধর্ম-আবৃত্তি করেছিলেন। অপরিসীম কৃতিত্ব ও অবদানের জন্য তিনি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।[৪২]

সারিপুত্র ও মহামৌদ্‌গল্যায়ন (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৯১) : সারিপুত্র নালক নামক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল বঙ্গান্ত এবং মাতার নাম ছিল রূপসারী। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল উপতিষ্য। কিন্তু মাতার নামানুসারে তিনি সারিপুত্র নামেই পরিচিতি লাভ করেন। অপরদিকে মহামৌদ্গাল্যায়ন রাজগৃহের নিকটবর্তী কোলিত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম ছিল মৌদ্‌গলী। মাতার নামানুসারেই তিনি মৌদ্‌গল্যায়ন নামে পরিচিতি লাভ করেন। সারিপুত্র এবং মৌদ্গাল্যায়ন উভয়ে একই দিনে জন্মগ্রহণ করেন এবং উভয় পরিবারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় সারিপুত্র ও মৌদ্গাল্যায়নের মধ্যেও বন্ধুত্ব সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একদিন দু'বন্ধু নাটক দেখতে গমন করেন

এবং নাটক দেখে জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করে গৃহত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁরা সঞ্জয় বেলট্ঠপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সমগ্র জম্বুদীপে সত্যের সন্ধানে একত্রে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁরা বহু জ্ঞানী গুণীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও অনুসন্ধানরত সত্যের সন্ধান না পেয়ে দু'জন দু'দিকে গমন করেন, তবে তাঁদের মধ্যে সন্ধি হয় যে, সত্যের সন্ধান পেলে একে অপরকে জানাবে।

কিছুদিন পর, সারিপুত্র বুদ্ধশিষ্য অশ্বজিৎ থেরর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি অশ্বজিৎ নিকট বুদ্ধ ভাষিত দু'টি গাথা শ্রবণ করে স্রোতাপত্তিফলে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর তিনি মৌদ্গাল্যায়নের নিকট গিয়ে গাথাদ্বয় ভাষণ করেন এবং মৌদ্গাল্যায়নও গাথাদ্বয় শ্রবণ করে স্রোতাপত্তি ফলে অধিষ্ঠিত হন। অতঃপর, তাঁরা বেলুবন বিহারে গমন করে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যাগ্রহণ করেন। মৌদ্গল্যায়ন প্রব্রজ্যা গ্রহণের সাতদিন পর এবং সারিপুত্র পনের দিন পর অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। দু'জনেই বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক ছিলেন। প্রজ্ঞায় সারিপুত্র এবং ঋদ্ধিশক্তিতে মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রজ্ঞায় বুদ্ধের পরেই ছিল সারিপুত্রের স্থান। তিনি বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দেশনাসমূহ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। এ কারণে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি 'ধর্মসেনাপতি' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[৪৩]

মহাকশ্যপ থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৯০) : তিনি মগধের মহাতিত্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কপিল এবং মাতার নাম ছিল সমুনাদেবী। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় পিপ্পলি। বয়োপ্রাপ্ত হলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতা-মাতার আদেশে ভদ্দাকপালিনি নামক সাগল নগরের এক সুন্দরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু পরস্পরের সম্মতিক্রমে তাঁরা আলাদা থাকতেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাঁরা সংসার ধর্মে উদাসীন হয়ে পড়েন এবং সমস্ত ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে গৃহত্যাগ পূর্বক দু'জন দুই দিকে চলে যান। পিপ্পলি রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী স্থানে বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং বুদ্ধের ধর্ম-দেশনা শ্রবণ করেন অতীব প্রীত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অতঃপর সাধনায় অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। সংঘে প্রবেশের পর তিনি মহাকশ্যপ থের নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ধূতাঙ্গ জীবন যাপন করতেন এবং অপরিসীম ঋদ্ধিশক্তির

অধিকারী ছিলেন।[৪৪] আপন কর্মগুণে তিনি বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য হিসেবে সংঘে স্থান করে নেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ তথা মৃত্যুর সময় মহাকশ্যপ থের উপস্থিত ছিলেন না এবং মহাকশ্যপ থের না আসা পর্যন্ত বুদ্ধের দেহ চিতায় তোলা হয়নি।

কচ্চায়ন থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৮৭) : তিনি মহাকচ্চয়ন থের নামেও বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিচিত। তিনি উজ্জয়নীর রাজা চণ্ডোপ্রদ্যোত এর পুরোহিত পুত্র ছিলেন। স্বর্ণোজ্জ্বল গায়ের রং এর কারণে এবং গোত্রের নাম 'কচ্চায়ন' হওয়ায় তাঁকে 'কচ্চায়ন' নামে অভিহিত করা হয়। তিনি পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে বেদশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজা প্রদ্যোতের পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। একদা রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার জন্য সঙ্গীসহ তাঁকে বুদ্ধের নিকট প্রেরণ করেন। তাঁরা বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন। কর্মগুণে তিনি বুদ্ধের প্রখ্যাত শিষ্যদের অন্যতম একজন হিসেবে সংঘে স্থান করে নেন। তিনি বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দেশনা প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করতে পারতেন।[৪৫] তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং শ্রেষ্ঠিপুত্র শ্রোণকুটিকর্ণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন, যিনি কর্মগুণে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন অলংকৃত করে আছেন।

অনুরুদ্ধ থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৮৭) : তিনি কপিলাবস্তুর শাক্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল অমিতোদন। তিনি বিলাসী জীবন পরিত্যাগ করে অন্যান্য শাক্যপুত্রদের সঙ্গে বুদ্ধের নিকট অনুপ্রিয় আম্রবনে প্রব্রজিত হন। তিনি সারিপুত্রের নিকট অষ্ট ভাবনা শিক্ষা লাভ করে চেতি রাজ্যে গমন করেন এবং সেখানে একাগ্র চিত্তে ধ্যান-সমাধি চর্চাপূর্বক অর্হত্ত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হন। তিনিও বুদ্ধের অন্যতম শিষ্যদের একজন ছিলেন।[৪৬]

অজিত মানব থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৮৯) : অজিত মানব ছিলেন শ্রাবস্তীর ব্রাহ্মণ এবং কোসল রাজ প্রসেনজিতের দ্রব্যমূল্য নির্ধারক কর্মকর্তা। একদা তিনি বুদ্ধের নিকট গমন করেন এবং বুদ্ধকে দার্শনিক

বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে বুদ্ধ সেসব বিষয়ে উত্তর প্রদান করেন, যা সুত্তনিপাতের পরায়ণ বর্গে 'অজিতমানবপুচ্ছ' শিরোনামে বর্ণিত আছে। তিনি বুদ্ধের উত্তর শুনে অতীব সন্তুষ্ট হন এবং এক হাজার অনুসারীসহ বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক সাধনা বলে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। বুদ্ধ সারিপুত্রকে অজিতমানব কর্তৃক জিজ্ঞাসিত দর্শন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করেন, যা মজ্ঝিমনিকায় গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৪৭]

কৌণ্ডিণ্য থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৮৭): তিনি কপিলাবস্তুর নিকটবর্তী দ্রোণবস্তুর এক ধণাঢ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বেদ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন। রাজা শুদ্ধোদন তাকেও রাজপুত্র সিদ্ধার্থের ভবিষ্যৎ গণনার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের একজন ছিলেন, যাঁদের নিকট বুদ্ধ প্রথম তাঁর নবলব্ধ ধর্ম প্রচার করেছিরেন। বুদ্ধের নব লব্ধ ধর্ম-দর্শন তিনিই প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।[৪৮]

ভদ্দালি থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৮৮) **:** একদা বুদ্ধ 'অনাথপিণ্ডকের জেতবনারামে অবস্থান কালে ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে 'এক বেলা আহারের' বিনয় প্রজ্ঞপ্তি করেছিলেন। ভাদ্দালি থের এই নিয়মের বিরোধিতা করে বলেন : "যদি আমি শুধু দৈনিক একবার আহার করি, আমার নীতি থাকতে পারে, আমার সংশয়, অবিশ্বাস, দুর্ভাবনা থাকতে পারে।" পরবর্তী তিনমাস তিনি বুদ্ধ প্রদত্ত নিয়ম অনুসরণ না করে বুদ্ধকে এড়িয়ে চলেন। বুদ্ধ ধর্মদেশনার নিমিত্ত শ্রাবস্তী ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার সময় তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করেন এবং অসুন্দর আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁকে ক্ষমা করে দেন এবং তিনি সাধনায় অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।[৪৯]

গোদত্ত থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৮৮) : তিনি শ্রাবস্তীর এক বণিকের পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব নেন এবং পাঁচশত শকট নিয়ে নানা স্থানে বাণিজ্যে যেতেন। একদা শকটবাহী একটি ষাঁড় বোঝার ভার বহন করতে অক্ষম হয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। তাঁর লোকেরা এটাকে তুলতে ব্যর্থ হলে তিনি এটাকে মারাত্মকভাবে আঘাত করেন। ষাড়টি মানুষের কণ্ঠ ধারণ করে

নিষ্ঠুরতার জন্য তাঁকে শাপান্তর করলো। এতে গোদত্ত মর্মাহত হন এবং সকল ভোগ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রব্রজিত হয়ে বুদ্ধের বাণীকে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে কঠোর সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অর্হত্ত্বফল অর্জন করেন। তিনি বুদ্ধের অভিধর্ম-দর্শনে প্রাজ্ঞ ছিলেন। এজন্য তিনি 'অভিধার্মিকগোদত্ত' নামেও পরিচিত ছিলেন।[৫০]

গবম্পতি থের : (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৯১) : তিনি বেনারসের এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাজকুমার যশের সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্বক কঠোর সাধনায় অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তিনি অপরিসীম ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী ছিলেন। একদা বুদ্ধ অঞ্জনবনে অবস্থান করছিলেন। তখন তাঁর কতিপয় শিষ্য সরযূ নদীর বালুচরে অবস্থান করছিলেন। রাত্রে হঠাৎ নদীর জল বেড়ে গেলে ভিক্ষুগণ আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তখন বুদ্ধকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে গবম্পতি নদীতে গমন করেন এবং ঋদ্ধিবলে জলের স্রোতধারা থামিয়ে দেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর প্রথম মহাসঙ্গীতিতে যোগদানের জন্য মহাকশ্যপ থের গবম্পতির থেরকে আনয়নের জন্য পূর্ণ থেরকে প্ররেণ করেছিলেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে তিনি মহাসঙ্গীতিতে যোগদানে অপরাগ হন এবং নিজের ভিক্ষাপাত্র ও তিনটি চীবর উপহার হিসেবে প্রেরণ করে তিনি মহাসঙ্গীতি আয়োজনের সাফল্য কামনা করেন।[৫১]

কপ্প থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৯১) : তিনি মগধের এক প্রাদেশিক শাসকের পুত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভোগাসক্তি পরায়ণ ছিলেন। একদা তিনি বুদ্ধকে নানা মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রী সমন্বিত এক কল্পবৃক্ষ দান করেন। বুদ্ধ তাঁর মধ্যে দুঃখমুক্তি লাভের অমিত সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে পার্থিব জীবনে ভোগের অসারতা সম্পর্কে তাঁকে নানা উপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি অতীব মুগ্ধ হন এবং গৃহত্যাগপূর্বক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অতীত কর্মফলগুণে তিনি প্রব্রজ্যাস্থলেই অর্হত্ত্বফলে অধিষ্ঠিত হন।[৫২]

মহাকপ্পিনথের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৯০) : তিনি বুদ্ধের অন্যতম শিষ্যদের একজন ছিলেন। বিশেষত 'ভিক্খুওবাদ'[৫৩] শিক্ষায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি বয়সে বুদ্ধ অপেক্ষা বড় ছিলেন এবং

কুক্কুটবতী নামে এক সীমান্ত প্রদেশীয় শহরের এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 'মহাকপ্পিন' নামে রাজা মনোনীত হন। সাগল রাজ্যের অনোজা নামক এক সুন্দরীকে তিনি পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি পণ্ডিতদের খুব সমাদর করতেন। একদা বুদ্ধের কিছু অনুসারীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে এবং তাঁদের নিকট হতে তিনি বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারেন। তিনি বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্ম-দর্শনের কথা জ্ঞাত হয়ে মন্ত্রীসহ বুদ্ধের নিকট গমন করেন। বুদ্ধ তাঁদের ধর্ম-দেশনা করেন। তাঁরা বুদ্ধের ধর্মকথা শুনে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্বক বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি বুদ্ধের ধর্মের সহজ ব্যাখ্যা প্রদানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। কথিত আছে যে, তাঁর দেশিত ধর্মকথা শুনে সহস্র শ্রোতা অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।[৫৪]

উরুবেলা কশ্যপ থের (সৌন্দরনন্দ, ১৬/৯০) : তিনি উরুবেলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিন ভাইয়ের মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল 'কশ্যপ'। উরুবেলায় জন্মগ্রহণ করায় তিনি উরুবেলাকশ্যপ নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি তিন বেদে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাঁচশত শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বসবাস করতেন। একদা বুদ্ধ তাঁকে দেখতে যান এবং কথিত আছে যে, বুদ্ধের দর্শনতাত্ত্বিক আলোচনা শ্রবণ করে বুদ্ধের শিষ্যত্ববরণ করেন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উরুবেলাকশ্যপকে 'অগ্গং মহাপরিসানং' (অগ্র মহাপরিষদ) অভিধায় ভূষিত করেন।[৫৫]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অশ্বঘোষ তাঁর সাহিত্যকর্মে বুদ্ধের জীবন-দর্শনের পাশাপাশি ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও সযত্নে ধারণ করে রেখেছেন, যা কেবল অশ্বঘোষের স্বদেশ প্রীতি তথা স্বাজাত্যবোধের পরিচয়ই বহন করে না, অধিকন্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে নতুন মাত্রাও যোগ করতে পারে।

৫. উপসংহার

সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ছয় প্রকার কাব্য রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সংস্কৃত আলংকারিকগণ বৈদর্ভী রীতিকে সর্বোত্তম কাব্য রীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষই প্রথম ব্যক্তি যিনি তাঁর বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে আলংকারিক নির্দেশিত সর্বোত্তম কাব্যরীতি বৈদর্ভী রীতি প্রয়োগ করেছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বুদ্ধের জীবন-দর্শন সংশ্লিষ্ট হলেও অশ্বঘোষ নানা আঙ্গিকের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি অনুসারে রচনার উদ্দেশ্যও ভিন্ন হয়। কিন্তু বিষয়বস্তু ও সাহিত্যকর্মের ধরণ ভিন্ন হলেও অশ্বঘোষের প্রায় সকল গ্রন্থেরই রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ নানা দুঃখে জর্জরিত, বিষয়ভোগে মত্ত, লোভ-দ্বেষ-মোহে আসক্ত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত এবং মুক্তির বিষয়ে বিমুখ মানুষকে বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে দুঃখমুক্তি তথা নির্বাণের পথে পরিচালিত করা। অশ্বঘোষ কবি বা সাহিত্যিক হলেও মূলত বৌদ্ধ ভিক্ষু। বুদ্ধের জীবন-দর্শনই ছিল তাঁর জীবন চর্চার পাথেয়। তিনি নিজে যেমন বুদ্ধের শিক্ষাকে ধারণ করেছেন তেমনি তাঁর গ্রন্থ রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে অপরের মাঝেও ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অপরের মুক্তিও কামনা করেছেন।

এই আদর্শের পাশাপাশি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও ধারণ করে আছে। বিশেষত, প্রাচীন ভারতীয় জনপদ, নগর, বন্দর, গ্রাম, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়, যা অশ্বঘোষের স্বদেশ প্রেমের স্বাক্ষর যেমন বহন করে, তেমনি প্রাচীন ভারত বিষয়ক জ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করে। তাছাড়া, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে নৈতিকতায় ভাস্বর, ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় বহু ধার্মিক ও সাধু-সজ্জনের ব্যক্তির জীবনী পাওয়া যায়, যা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতা জাগ্রত করে।

তথ্যনির্দেশ

১. যুধিষ্ঠির গোপ, দণ্ডিকৃতঃ কাব্যাদর্শ (প্রথম পরিচ্ছেদঃ), শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৬৫।

২. সংস্কৃত আলংকারিক ভোজ তাঁর সরস্বতীকণ্ঠাভরণ গ্রন্থে ছয়টি রীতির এভাবে উল্লেখ করেছেন:

"বৈদর্ভী চাথ পাঞ্চালী গৌড়ী চাবন্তিকা তথ।

লাটীয়া মাগধী চেতি ষোড়া রীতির্নিগদ্যতে।।" (সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, ২/৫২)

৩. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, কাব্যাদর্শ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১০৭।

৪. *A History of Sanskrit Literature*, op. cit., p. 60-61.

৫. *Buddhacarita or Acts of the Buddha*, op. cit., 1995, p. lxiii.

৬. *History of Indian Literature*, Vol. II, op. cit., p. 258.

৭. *দণ্ডিকৃতঃ কাব্যাদর্শ (প্রথম পরিচ্ছেদঃ)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৮. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭; *Buddhacarita or Acts of the Buddha*, op. cit., p. lxiii-lxvi; *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*।

৯. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫, সর্গ অষ্টাদশ, শ্লোক ৬৩-৬৪।

১১. সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, প্রাগুক্ত, ১১ তম খণ্ড, পৃ. ১৫।

১২. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op. cit., p. 49.

১৩. *Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith*, op. cit., p. 48.

১৪. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit., p. 38-39.

১৫. বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক, প্রাগুক্ত, পৃ. পৃ. ৩৮।

১৬. *Literary History of Sanskrit Buddhism*, op. cit., p. 36-37.

১৭. মৈত্রী তালুকদার, 'পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবয়ব : একটি সমীক্ষা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্মসংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/জুন ২০১৬, পৃ. ৩৮।

১৮. B. C. Law, *Historical Geography of Ancient India*, Societe Asiatique De Paris, France, 1954, p. 12.

১৯. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক ৬২।

২০. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, অষ্টম সর্গ, শ্লোক ৩৮।

২১. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, প্রথম সর্গ, শ্লোক ৪৮।

২২. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, প্রথম সর্গ, শ্লোক ১৩।

২৩. ধর্মাধার মহাস্থবির, *মিলিন্দ প্রশ্ন*, কলিকাতা, পৃ. ১২।

২৪. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, একাদশ সর্গ, শ্লোক ৫১।

২৫. *On Yuang Chwang;s Travel in India*, op. cit., p. 110; James Legge, *The Travels of fa-Hien*, Oriental Publishers, Delhi, 1972, p. 70.

২৬. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, দ্বাদশ সর্গ, শ্লোক ৯০।

২৭. *Samyutta Nikaya*, op. cit., vol. II., p. 135; *Anguttara Nikaya*, op. cit., vol. IV, p. 101.

২৮. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, চতুর্থ সর্গ, শ্লোক ৭৬, দ্বাদশ সর্গ, শ্লোক ১০।

২৯. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, ত্রয়োদশ সর্গ, শ্লোক ৬৮।

৩০. প্রাগুক্ত, চতুর্দশ সর্গ, শ্লোক ১৫।

৩১. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, প্রথম সর্গ, শ্লোক ৯।

৩২. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্রথম সর্গ, শ্লোক ৮৬।

৩৩. প্রাগুক্ত, সপ্তম সর্গ, শ্লোক ৪, চতুর্দশ সর্গ, শ্লোক ৮৯; *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, প্রথম সর্গ, শ্লোক ১২।

৩৪. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, তৃতীয় সর্গ, শ্লোক ১, ২৪।

৩৫. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, প্রথম সর্গ, শ্লোক ৭।

৩৬. প্রাগুক্ত, প্রথম সর্গ, শ্লোক ৮, চতুর্থ সর্গ, শ্লোক ৩২; *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, প্রথম সর্গ, শ্লোক ২১।

৩৭. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, অষ্টম সর্গ, শ্লোক ৮।

৩৮. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পঞ্চম সর্গ, শ্লোক ৭৯; দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক ২২।

৩৯. প্রাগুক্ত, পঞ্চম সর্গ, শ্লোক ৫৩।

৪০. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ৯ম খণ্ড, চতুর্থ সর্গ, শ্লোক ৩৪; অষ্টম সর্গ, শ্লোক ৪২-৪৩।

৪১. *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, অস্টম সর্গ, শ্লোক ৩৬।

৪২. G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names,* Munshiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd., New Delhi, 1998, vol. I., p. 249-68.

৪৩. *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. II., p. 541-545.

৪৪. *Anguttara Nikaya*, op. cit., Vol. I., p. 23.

৪৫. সংখিত্তেন ভাসিতস্স বিত্থারেণ অত্থং বিভজন্তানং, *Anguttara Nikaya*, op. cit., Vol. I., p. 23.

৪৬. *Vinaya Pitklam*, P. T. S. London, vol. II., p. 180-183; *Anguttara Nikaya*, op. cit., Vol. I., p. 23.

৪৭. *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 36.

৪৮. *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 683.

৪৯. *Majjhima Nikaya*, op. cit., vol. I., p. 437.

৫০. *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 812.

৫১. *Dictionary of Pali Proper Names*, op. cit., vol. I., p. 756.

৫২. থেরগাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮।

৫৩. *Anguttara Nikaya*, op. cit., Vol. I., p. 25.

৫৪. *Vinaya Pitakam*, P. T. S. London, vol. I., p. 105.

৫৫. *Anguttara Nikaya*, op. cit., Vol. I., p. 25.

পঞ্চম অধ্যায়

মহাকবি হিসেবে অশ্বঘোষের মূল্যায়ন : প্রেক্ষিত বুদ্ধচরিত

১. ভূমিকা

অশ্বঘোষের রয়েছে নানা পরিচয়। কিন্তু মহাকবি হিসেবেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন। মহাকবি পরিচয়টি তাঁর সকল পরিচয়কে ছাপিয়ে যায় এবং সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে তিনি এই পরিচয়ে অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। অশ্বঘোষ বিরচিত বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি মহাকবি ছিলেন। যেমন, সৌন্দরানন্দ কাব্যের কবিকথা অংশে এরূপ উল্লেখ আছে : "আর্যসুবর্ণাক্ষীপুত্রস্য সাকেতস্য ভিক্ষোরার্য ভদন্তাশ্বঘোষস্য মহাকবের্মহাবাদিনঃ কৃতিরিয়ম্।"[১] অর্থাৎ সাকেতের আর্য সুবর্ণাক্ষী পুত্র মহাকবি, মহাবাগ্মী, ভিক্ষু আচার্য ভদন্ত অশ্বঘোষ কর্তৃক রচিত। অনুরূপভাবে, বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে গ্রন্থটি মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করার বিষয়টি এভাবে উল্লেখ পাওয়া যায় : "ইতি বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যে ভগবৎপ্রসূতিনাম প্রথম সর্গঃ।"[২] অর্থাৎ বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের 'ভগবৎ প্রসূতি' নামক সর্গ সমাপ্ত। বর্ণিত দু'টি কাব্যের মধ্যে বুদ্ধচরিতকে কবি নিজেই মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করলেও সৌন্দরনন্দ কাব্যকে মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করেননি। তবে, গবেষকগণ মনে করেন, সৌন্দরনন্দ কাব্যও মহাকাব্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং অশ্বঘোষের বহু অপূর্ব সৃষ্টির মধ্যে বর্ণিত কাব্যদ্বয়ই তাঁকে মহাকবির আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

সংস্কৃত আলংকারিকের মতে, মহাকাব্যের কতিপয় সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহাকবিকে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে সেইসব বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করতে হয়। এ অধ্যায়ে সংস্কৃত আলংকারিক, বিশেষত বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণে' বর্ণিত মহাকাব্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বুদ্ধচরিত কাব্যে কতটুকু রক্ষিত হয়েছে তা নির্ণয়ের মাধ্যমে মহাকবি হিসেবে অশ্বঘোষের মূল্যায়ন করা হবে। প্রথমে

সাহিত্যদর্পণে বর্ণিত মহাব্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হবে। তৎপর বুদ্ধচরিতে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বিচারপূর্বক মহাকবি হিসেবে তাঁর সার্থকতা প্রতিপন্ন করা হবে।

২. মহাকাব্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা

অগ্নিপুরাণে (৩৩৭/২৪-৪৫, বঙ্গবাসী সংস্করণ) মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত আছে। এছাড়া, বহু খ্যাতনামা সংস্কৃত আলংকারিক মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। বিশেষত, ভামহ (কাব্যালংকার), ভোজদেব (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ), দণ্ডী (কাব্যাদর্শ), বিশ্বনাথ কবিরাজ (সাহিত্যদর্পণঃ) এবং হেমচন্দ্র (কাব্যানুশাসন) প্রমুখ আলংকারিকগণ মহাকাব্যের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।[৩] ভরত মুনির বর্ণনায়ও মহাকাব্যের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তবে হেমচন্দ্র অতি সংক্ষেপে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করেছেন। উপরে বর্ণিত আলংকারিকদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। তবে, তাঁদের মধ্যে সংস্কৃত আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ বর্ণিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ আমি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্য মূল্যায়নের জন্য গ্রহণ করেছি। কারণ, তা অন্যান্য আলংকারিক অপেক্ষা সুসংগঠিত এবং শ্রেণিবিন্যস্ত বলে মনে হয়েছে।

সংস্কৃত আলংকারিকদের নির্দেশিত বৈশিষ্ট্য গুলো সাজালে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ, যা ক্রমধারা অনুসারে বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে উপস্থান করা হলো :

ক. **সূচনা :** মহাকাব্য আরম্ভ হবে মঙ্গলাচরণ, নমস্কার, আশীর্বাদ কামনা বা বস্তুনির্দেশ প্রভৃতির মাধ্যমে।

খ. **বিষয়বস্তু :** বিষয় হবে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক, অর্থাৎ কোনো দেবতা, সাধু বা সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করেও মহাকাব্য রচিত হতে পারে।

গ. **নায়ক :** এক বংশে জাত রাজা বা ঐ বংশের বা অন্য বংশের বহুব্যক্তি নায়ক হতে পারে, তবে তথায় নায়ক হবে সুর, সদ্বংশজাত, ক্ষত্রিয় এবং ধীরোদাত্ত গুণান্বিত।

ঘ. **নামকরণ :** কবির বা বৃত্তের নামে বা নায়কের নামে মহাকাব্যের নামকরণ হবে।

ঙ. **সর্গ :** মহাকাব্য হবে সর্গবন্ধ এবং অসংক্ষিপ্ত। তবে সর্গ সংখ্যা হবে আটের অধিক এবং সর্গসমূহ বেশি বড় যেমন হবে না, তেমনি বেশি ছোটও হবে না। সর্গস্থ কথার নামে সর্গের নাম হবে। প্রতিটি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের কথার সূচনা থাকবে, অর্থাৎ সর্গগুলো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হবে।

চ. **উদ্দেশ্য :** মহাকাব্যের উদ্দেশ্য হবে চতুর্বর্গ ফলদায়ক।

ছ. **ছন্দ-অলংকার :** মহাকাব্য হবে নানা ছন্দে রচিত এবং অলংকার বহুল।

জ. **রস :** মহাকাব্য হবে রস ও ভাবপূর্ণ। তবে শৃঙ্গার, বীর, শান্তাদির কোনো একটি রস অঙ্গীরস হবে।

ঝ. **ভাষা :** মহাকাব্যের ভাষা হবে ওজস্বী ও গাম্ভীর্য-ব্যঞ্জক।

ঞ. **নানা বৃত্তান্ত :** মহাকাব্য হবে সবর্দা বিভিন্ন প্রকার বৃত্তান্তের দ্বারা লোকরঞ্জনকারী। কোথাও দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা থাকবে, কোথাও বা সৎব্যক্তির গুণকীর্তন থাকবে। সন্ধ্যা, চাঁদ, সূর্য, রাত, প্রদোষ, অন্ধকার, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ব, মুনি, স্বর্গ, যুদ্ধ, মৃত্যু, মন্ত্র, জন্মাদি যথাসাধ্য বর্ণিত থাকবে।

ট. **বিরহ-মিলন :** মিলনের পাশাপাশি মহাকাব্যে বিরহের বর্ণনাও থাকবে।

ঠ. **নায়কের জয় :** নায়কের জয় বা আত্ম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মহাকাব্য সমাপ্ত হয়। সাধারণত এতে ট্র্যাজেডির স্থান নেই।

৩. বুদ্ধচরিত কাব্য সমীক্ষা

বুদ্ধচরিত কাব্যের পূর্ণাঙ্গ সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়নি। ই.বি. কাওয়েল (E. B. Cowell) নেপালের রাজদরবার হতে বুদ্ধচরিত কাব্যের একটি সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেছে। তাতে ১৭টি সর্গ রয়েছে এবং বুদ্ধের জন্ম থেকে বারাণসীতে প্রথম ধর্মপ্রচার পর্যন্ত বুদ্ধ জীবনের নানা ঘটনা বর্ণিত

আছে। কিন্তু আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির ১৭টি সর্গের মধ্যে গবেষকগণ প্রথম সর্গ থেকে চতুর্দশ সর্গের ৫১ নং শ্লোক পর্যন্ত অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করলেও চতুর্দশ সর্গের ৫২ নং শ্লোক থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত অশ্বঘোষের রচনা বলে মনে করেন না। কারণ চতুর্দশ সর্গের ৫২নং শ্লোক থেকে সপ্তদশ সর্গ পর্যন্ত শ্লোকগুলোর রচনাশৈলী, ভাষা, শব্দচয়ন এবং ছন্দ তৎপূর্ববর্তী সর্গের শ্লোক হতে ভিন্ন। ই. বি. কাওয়েল আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপির চতুর্দশ সর্গে একটি লেখা দেখতে পান, যা বঙ্গানুবাদ করলে এরূপ দাঁড়ায় : "লুপ্ত অংশ অনুসন্ধান করেছি, না পেয়ে আমি অমৃতানন্দ চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ এবং সপ্তদশ সর্গ রচনা করলাম।"[৪] এ স্বীকারোক্তি হতে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত সর্গগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী নেপালী কবি অমৃতানন্দ পরবর্তীকালে রচনা করে সংযুক্ত করেছিলেন। ই. বি. কাওয়েল পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনাপূর্বক ইংরেজি অনুবাদসহ প্রকাশ করেছে। তিনি পাণ্ডুলিপির ১৭টি সর্গ গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন। তাঁর মতে ১৭টি সর্গের মধ্যে শেষ চারটি সর্গের শ্লোকগুলোর ভাব কুয়াশাচ্ছন্ন এবং সন্দেহজনক। সর্গগুলোতে অল্পপরিসরে জোরপূর্বক বহু ঘটনা উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলস্বরূপ সর্গগুলো বিন্যস্ত নয়। এরূপ রচনাশৈলী প্রথম ১৩টি সর্গে দেখা যায় না। সপ্তদশ সর্গে বহু দুর্বোধ্য শব্দ এবং অর্থহীন শ্লোক দ্বারা বুদ্ধ কর্তৃক বহু ব্যক্তিকে দীক্ষা দান এবং বুদ্ধের নানা দেশ পরিভ্রমণের কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে, যা অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর সঙ্গে যেমন সামঞ্জস্যহীন তেমনি সুনিপুণ হাতের লেখা বলেও মনে হয় না। সপ্তদশ সর্গ সম্পর্কে মুণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও অভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে,

"ছন্দ, শব্দপ্রয়োগ, রচনাশৈলী, অর্থ প্রভৃতি দিক দিয়াই সপ্তদশ সর্গটিতে এতই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যে ইহা কিছুতেই অশ্বঘোষের রচনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ যে প্রাঞ্জলতা এবং পারিপাট্য অশ্বঘোষের রচনায় প্রাণবন্ত সপ্তদশ সর্গে তাহার লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না।"[৫]

বুদ্ধচরিত কাব্যের তিব্বতি এবং চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায়। তিব্বতি ও চৈনিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলোতে ২৭টি সর্গ আছে এবং জন্ম হতে মহাপরিনর্বাণ লাভ পর্যন্ত বুদ্ধজীবনী বর্ণিত আছে।

এছাড়া, প্রথম মহাসঙ্গীতি হতে সম্রাট অশোকের সময়কাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের কাহিনি বর্ণিত আছে। ই. বি. কাওয়েল আবিষ্কৃত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির শেষ চারটি (চতুর্দশ হতে সপ্তদশ) সর্গ তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদের সঙ্গে তুলনামূলক পর্যালোচনা করেন এবং এই সর্গগুলোর সঙ্গে তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদের চতুর্দশ হতে সপ্তদশ সর্গের বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল দেখে বলেন, হয়তো পরবর্তীকালে অমৃতানন্দ লুপ্ত অংশের সন্ধান লাভ করেছিলেন, যার ভিত্তিতে তিনি সর্গগুলো রচনা করেছিলেন। কিন্তু অমৃতানন্দ লুপ্ত অংশ খুঁজে পাননি বলে নিজেই স্বীকার করেছেন, ফলে তিনি চৈনিক ও তিব্বতি অনুবাদের ভিত্তিতে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির শেষ চারটি সর্গ রচনা করেছিলেন – এরূপ ধারণা করা যায়। তারাপদ ভট্টাচার্য এবং মুণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও মনে করেন যে, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বুদ্ধচরিতের যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার শেষ চারটি সর্গ অমৃতানন্দ পরবর্তীকালে রচনা করে সংযুক্ত করেছিলেন।[৬] ই. এইচ. জনস্টন আবিষ্কৃত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিটি আরো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে বলেন, শুধু শেষ চারটি সর্গই নয় অনেক সর্গে অমৃতানন্দের সংশোধনী লক্ষ্য করা যায়। তিনি সংশোধনীগুলো চিহ্নিত করেন। বিশেষত তিনি মনে করেন, প্রথম সর্গের ১ থেকে ৭ নং শ্লোক, ২৪ নং শ্লোকের শেষ চারটি শব্দ এবং ২৫ থেকে ৩৯ নং শ্লোকের প্রথম তিনটি চরণও অমৃতানন্দ রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিম্নরূপ অভিমত প্রদান করেন :

"The earlier leaves are all much rubbed and often hard to read, and the margins are covered with trivial glosses in late hand. For the first canto and apparently for leaves 7 and 8 in the second canto Amritananda filled up the lacunae with his own words and guessed at the readings where he had not patience to decipher them." [৭]

তিনি পুনরায় বলেন,

"I infer that, after Amritananda had made his trascript with additions and alternations of his own, many of the leaves were cleaned anfd reinked, a process which would naturally lead to mistakes and which may perhaps have been responsible for the loss of leaves 7 and 8."[৮]

উপরে বর্ণিত কারণে গবেষকগণ সংস্কৃত ভাষায় প্রাপ্ত বুদ্ধচরিতের চৌদ্দটি সর্গ অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করেন এবং সেই সর্গগুলো হলো : ভগবৎপ্রসূতি, অন্তপুরঃবিহারঃ, সংবেগোৎপত্তিঃ, স্ত্রীবিঘাতনঃ, অভিনিষ্ক্রমণম্, ছন্দকনিবর্ত্তনঃ, তপোবনপ্রবেশঃ, অন্তঃপুরবিলাপঃ, কুমারান্বেষণঃ, শ্রেণ্যাভিগমনঃ, কামবিগর্হণম্, অরাড়দর্শনম্, মারবিজয়ঃ এবং বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিঃ। সর্গগুলো সমীক্ষা করলে দেখা যায় :

প্রথম সর্গে ৮৯টি শ্লোকে রাজুকমার সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম কাহিনি বর্ণনা করা হয়, যিনি সম্যক্ সম্বোধি লাভ করে জগতে 'ভগবান বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। বিশেষত, কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে, রানী মায়া দেবীর গর্ভে তাঁর প্রতিসন্ধি গ্রহণ, লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ এবং যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ প্রভৃতি জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণিত হওয়ায় সর্গটির নামকরণ করা হয় 'ভগবৎপ্রসূতি'। দ্বিতীয় সর্গে ৫৬টি শ্লোকে কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজপ্রাসাদে রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনাচার বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত, রাজকীয় ভোগ ঐশ্বর্যে রাজপ্রাসাদে বেড়ে উঠা, যশোধরার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং পুত্র রাহুলের জন্ম প্রভৃতি রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনাচার বর্ণিত হওয়ায় সর্গটির নামকরণ করা হয় 'অন্তপুরঃবিহারঃ'। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম নগর ভ্রমণে বের হলে মানব জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং শান্তি ও সত্যান্বেষণী সন্ন্যাসী - এই চারি নিমিত্ত দর্শন করেন। ফলে তাঁর চিত্তে যে ভাবাবেগ উৎপন্ন হয় তা সংবেগোৎপত্তিঃ নামক তৃতীয় সর্গে ৬৫টি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। সিদ্ধার্থ গৌতমের ভাবাবেগ দূর করার জন্য

পিতা রাজা শুদ্ধোদন সব সময় কুমারকে আনন্দে নিমজ্জিত করে রাখার নিমিত্তে সর্ব কলায় পারদর্শী, রূপ-গুণে ঋষিচিত্ত বিচলিত করতে সক্ষম, ভাব-জাগানী কলা-কৌশলে পারঙ্গম সূত-মিত-রমণী দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত করে রাখতেন। সেসব রমণীরা সংকল্পে অবিচল, দৃঢ়চিত্ত, দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণে প্রতিজ্ঞ কুমারের মনকে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হন। কুমার কর্তৃক নারী প্রত্যাখানের সেই কাহিনি 'স্ত্রীবিঘাতনঃ' নামক চতুর্থ সর্গে ১০৩টি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে দৃঢ়প্রত্যয়ী কুমার পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন এবং সকল রাজকীয় ভোগ ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে চলে যাওয়ার কাহিনি 'অভিনিষ্ক্রমণম্' নামক পঞ্চম অধ্যায়ে ৮৭টি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। 'ছন্দকনিবর্ত্তনঃ' নামক ষষ্ঠ সর্গে ৬৮টি শ্লোকে রাজ-রথ চালক ছন্দককে নিয়ে নিষ্ক্রমণ, তাকে রাজ-ভূষণ অর্পন করে গৈরিক বসন ধারণপূর্বক বিদায় নেওয়ার করুণ-কাহিনি বর্ণনা করা হয়েছে। 'তপোবনপ্রবেশঃ' নামক সপ্তম সর্গে অশ্বসারথী ছন্দককে বিদায় জানিয়ে সন্ন্যাস জীবন-যাপনের জন্য তপোবনে প্রবেশের কাহিনি ৫৮টি শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে। অশ্বসারথী ছন্দকের নিকট কুমারের সন্ন্যাস অবলম্বনের খবর শুনে রাজঅন্তঃপুরে শোকের যে ছায়া নেমে আসে তার বর্ণনা ৮৭টি শ্লোকে 'অন্তঃপুরবিলাপঃ' নামক অষ্টম সর্গে দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাস অবলম্বনের খবর শুনে পিতা, বিমাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন শোকাহত হয়ে পড়েন। শোকাহত পিতা রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে অন্বেষণ করে ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ-কর্মচারীদের আদেশ দেন। রাজ-কর্মচারীরা কুমার অন্বেষণে বের হয়ে পড়েন। সেই কাহিনি 'কুমারন্বেষণঃ' নামক নবম সর্গে ৮২ টি শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। সন্ন্যাস অবলম্বনকারী কুমার ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে জীবন-ধারণ করতেন। একদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করার জন্য মগধরাজ্যে গমন করে। তাঁর রূপ-গুণের কথা শুনে রাজা বিম্বিসার তাঁকে রাজ প্রাসাদে ঢেকে পাঠান এবং তাঁকে সেনাপতির পদ অলংকৃত করার আহ্বান জানান। মগধরাজ বিম্বিসার শ্রেণি-বিম্বিসার নামেও খ্যাত ছিল। তাঁর নিকট গমন এবং উভয়ের কথোপকথনের কাহিনি 'শ্রেণ্যাভিগমনঃ' নামক দশম সর্গে ৮১টি শ্লোকে তুলে ধরা হয়েছে। সন্ন্যাসধারী কুমার ভোগ-বিলাস, কামনা-বাসনা এবং

Dhaka University Institutional Repository

লোভ-লালসার অসারত্ব প্রতিপন্ন করে রাজা বিম্বিসারের আহ্বান প্রত্যাখান করেন। সেই কাহিনি 'কামবিগর্হণম্' নামক একাদশ সর্গে ৭৩টি শ্লোকে উপস্থাপন করা হয়। সন্ন্যাসব্রতধারী কুমারের ঋষি অরাড় কালামের নিকট গমন, শিষ্যত্ব গ্রহণ এবং কথোপকথনের কাহিনি 'অরাড়দর্শনম্' নামক দ্বাদশ সর্গে ১২১টি শ্লোকে বিস্তর করা হয়। দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে দৃঢ় সংকল্প পরায়ণ সন্ন্যাসী গয়ার বোধিবৃক্ষের নীচে বজ্রাসনে গভীর ধ্যানে সমাসীন এবং দুঃখমুক্তির পথের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সেই আসন পরিত্যাগ না করার সংকল্পে অটল। বোধিজ্ঞান লাভ আসন্ন দেখে এবং সংকল্পচ্যুত করার মানসে মারের তিন কন্যা, রতি, আরতি এবং তৃষ্ণা তাঁকে নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকে। তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মার সসৈন্যে আক্রমণ করে তাঁকে লক্ষ্যচ্যুতি ঘটানো চেষ্টা করে। কিন্তু তাঁর সম্বোধি তথা বুদ্ধত্ব লাভের দৃঢ় সংকল্পের নিকট মারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সেই কাহিনি মারবিজয়ঃ নামক ত্রয়োদশ সর্গে ৭৩টি শ্লোকে প্রকটিত করা হয়েছে। 'বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিঃ' নামক চতুর্দশ সর্গে সন্ন্যাস জীবনের কঠিন অধ্যায় অতিক্রম করে কীভাবে বুদ্ধত্ব লাভ করেন তা ১১২টি শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে।

উপরের বর্ণনা হতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, চৌদ্দটি সর্গে জন্ম হতে বুদ্ধত্ব লাভের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বুদ্ধচরিত কাব্যের যে তিব্বতি এবং চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায় তাতে ২৮ সর্গ আছে এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত বুদ্ধের জীবন কাহিনি এবং বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ উত্তর অনুষ্ঠিত প্রথম মহাসঙ্গীতি হতে সম্রাট অশোকের সময়কাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের কাহিনি বর্ণিত আছে। ইৎ-সিং সপ্তম শতাব্দিতে ভারতবর্ষ ভ্রমণে এসেছিলেন এবং বৌদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় রচিত বুদ্ধচরিত কাব্যখানি ২৮টি সর্গে বিভক্ত ছিল এবং ভারতবর্ষের পাঁচটি রাজ্যে এবং দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে ব্যাপকভাবে গীত-আকারে পঠিত হত। ফলে ধারণা করা যায় যে, মূল বুদ্ধচরিত কাব্যখানি ২৮টি সর্গে বিভক্ত ছিল এবং চতুর্দশ সর্গের ৫২ নং শ্লোক হতে ২৮তম সর্গ পর্যন্ত অংশটুকু হারিয়ে গিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বুদ্ধচরিত কাব্যে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সমীক্ষা

এই অনুচ্ছেদে উপরে বর্ণিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ বুদ্ধচরিত কাব্যে কতটুক রক্ষিত হয়েছে তা সমীক্ষা করা হবে এবং মহাকবি হিসেবে অশ্বঘোষের মূল্যায়ন করা হবে।

৪.১. সূচনা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

সাধারণত অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহাকাব্য নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি লাভ করার নিমিত্তে কবি সূচনায় বাগ্ দেবীর প্রসাদ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মঙ্গলাচরণ বা নমস্ক্রিয়া বা বন্দনা নিবেদন করে। লেখক এবং পাঠকের মঙ্গল কামনায়ও মঙ্গলাচরণ করা হয়। ক্ষেত্র বিশেষে বস্তুনির্দেশের মাধ্যমে মহাকাব্য আরম্ভ হয়। সূচনা সমীক্ষায় দেখা যায়, বর্তমানে যে বুদ্ধচরিত কাব্য পাওয়া যায় তাতে 'ভগবৎপ্রসুতি' নামক প্রথম সর্গে সিদ্ধার্থ গৌতমের (গৌতম বুদ্ধের) জন্মকাহিনি বর্ণিত হয়েছে। প্রথম সর্গ শুরু হয়েছে ইক্ষ্বাকুকুলজাত শুদ্ধোদনের পরিচয় দিয়ে, যা নিম্নরূপ :

ইক্ষ্বাকুবংশার্ণবসম্প্রসূতঃ প্রেমাকরশ্চন্দ্র ইব প্রজানাম্।
শাক্যেষু সাকল্যগণাধিবাসঃ শুদ্ধোদনাখ্যো নৃপতির্বভূব ।। বু.চ. ১/১

আসীন্মহেন্দ্রাদিসমস্য তস্য পৃথ্বীর গুর্বী মহিষী নৃপস্য।
মায়েতি নাম্নী শিবরত্নসারা শীলেন কান্ত্যাহপ্যধিদেবতেব।। বু. চ. ১/২

দেবৈরভিপ্রার্থ্যমনল্পভোগং সার্ধং তয়াহসৌ বুভুজে নৃপালঃ ।
সা চাথ বিদ্যেব সমাধিযুক্তা গর্ভং দধে লোকহিতায় সাধ্বী ।। বু. চ ১/৩

অর্থাৎ শাক্যদের মধ্যে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন - তিনি ছিলেন সকল গুণের আশ্রয়স্বরূপ। ইক্ষ্বাকুবংশ যেন এক বিশাল সমুদ্রের মতো- সেই সমুদ্র থেকেই তাঁর জন্ম; আর প্রজাদের কাছে তিনি ছিলেন চাঁদের মতোই প্রীতির আধার।(বু. চ. ১/১) রাজা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার সমান, মায়া নামে তাঁর যে মহিষী ছিলেন তিনি পৃথিবীর মতোই গৌরবময়ী। তিনি কল্যাণকর রত্নসমূহের সার - স্বভাবে ও

Dhaka University Institutional Repository

সৌন্দর্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার মতো।(বু. চ. ১/২) রাজা তাঁর সঙ্গে সব ভোগ করলেন যা দেবতাদেরও প্রার্থনীয়। তারপর মহিষী লোকহিতের জন্য সমাধিযুক্তা বিদ্যার মতো গর্ভধারণ করলেন।(বু.চ. ১/৩)

সূচনা সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে সূচনায় কোনো মঙ্গলাচরণ নেই। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা ইক্ষ্বাকুকুলজাত শুদ্ধোদন ও মাতা মায়াদেবীর পরিচয় এবং সিদ্ধার্থ গৌতমের (যিনি বুদ্ধত্ব লাভ করে জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন) প্রতিসন্ধিগ্রহণ তথা জন্মকাহিনি দিয়ে কাব্যটি আরম্ভ হয়েছে এবং কাব্যটিতে সূচনা হতে শেষ পর্যন্ত গৌতম বুদ্ধের জীবনীর নানা দিক প্রাধান্য লাভ করেছে। সাধারণত পার্থিব দর্পণে বস্তু প্রতিবিম্বিত হলে সেই প্রতিবিম্ব ততক্ষণই দেখা যায় যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি বর্তমান থাকে। যে মুহূর্তে বস্তুটি সরে যায় সেই মুহূর্তে প্রতিবিম্বটিও অপগত হয়। এটিই বস্তু। অনুরূপভাবে অশ্বঘোষ গৌতম বুদ্ধের জীবনের নানা ঘটনা বুদ্ধচরিত কাব্যে বাগময় দর্পণে অপূর্ব কাব্যশৈলীতে এমনভাবে প্রতিবিম্বিত করেছেন, গৌতম বুদ্ধকে অপসৃত করলে সেই কাব্য অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ে, তাতে আর কিছুই থাকে না। ফলে বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্য গৌতম বুদ্ধের মহাজীবনের উপর নির্ভরশীল এবং বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রথম সর্গ হতেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অতএব, গৌতম বুদ্ধের জীবনই বুদ্ধচরিত কাব্যের বস্তুনির্দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ফলে মঙ্গলাচরণ না থাকলেও বুদ্ধচরিত কাব্যে বস্তুনির্দেশ আছে। বৌদ্ধধর্ম কর্ম প্রধান ধর্ম। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের ফল ভোগ করবে। কর্মফল কেউ এড়াতে পারবে না এবং স্বীয় কর্ম ব্যতীত কর্মফল ভোগ হতে কেউ রক্ষাও করতে পারবে। বৌদ্ধধর্মে অদৃষ্টবাদের স্থান নেই। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ বুদ্ধ নির্দেশিত কর্মবাদ দর্শনে চূড়ান্তভাবে বিশ্বাসী। অশ্বঘোষ কবি হলেও বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। ফলে তিনি কর্মবাদী ছিলেন। স্বীয় কর্মগুণে কাব্যটি নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি লাভ করবে - এই ছিল হয়তো প্রত্যাশা। সম্ভবত এ কারণে বুদ্ধচরিত কাব্যে সূচনায় মঙ্গলাচরণ নেই। তবে যেহেতু বস্তুনির্দেশ আছে, সেহেতু বলা যায় বুদ্ধচরিত কাব্যে সূচনা বিষয়ক মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪.২. বিষয়বস্তু বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

শর্ত অনুসারে মহাকাব্যের বিষয়বস্তু কবিকল্পিত নয়; হবে ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক, অর্থাৎ কোনো দেবতা, সাধু বা সজ্জন ব্যক্তিকে আশ্রয় করেও মহাকাব্য রচিত হতে পারে। বুদ্ধচরিত কাব্যের নায়ক একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস সাক্ষী দেয়, তিনি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে রানী মায়াদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অধিকন্তু তিনি একজন সাধু-সজ্জন ব্যক্তি। কারণ, ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সর্বপ্রাণীর দুঃখ মুক্তির পথ অনুসন্ধানের নিমিত্তে তিনি ২৯ বছর বয়সের রাজ-সিংহাসনের মায়া, যাবতীয় ভোগ ঐশ্বর্য এবং প্রাণপ্রিয় পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। ছয় বছর কঠোর সাধনায় ৩৫ বছর বয়সে লাভ করেন সম্বোধি এবং জগতে খ্যাত হন 'বুদ্ধ' নামে। তৎপর সুদীর্ঘ ৪৫ বছর বহুজনের হিতের জন্য, মঙ্গলের জন্য সেই দুঃখ-মুক্তির ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর ধর্ম-দর্শনের অমৃত বাণী শুনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে বহু ব্যক্তি দুঃখমুক্ত পরমসুখকর নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন এবং এখনো করছেন। ফলে বুদ্ধচরিত কাব্যের বিষয়বস্তু কেবল ঐতিহাসিকই নয়, অধিকন্তু সাধু-সজ্জন ব্যক্তির জীবন চরিতও বটে। অশ্বঘোষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ ও সাধু-সজ্জন ব্যক্তিত্ব গৌতম বুদ্ধের জীবনকে অবলম্বন করেই বুদ্ধচরিত কাব্য রচনা করেছেন। তবে অশ্বঘোষের বর্ণনায় পৌরাণিকতার ছোঁয়াও বিদ্যমান। কারণ, বুদ্ধের প্রায় পাঁচশত বছর পরে অশ্বঘোষ কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। পাঁচশত বছরের ব্যবধানে বুদ্ধের জীবনীতে বহু অতিরঞ্জিত ভাব-কল্পনা যুক্ত হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে ই. বি, কাওয়েলের অভিমত প্রণিধানযোগ্য : "It is an early Sanskrit poem written in India on the legendary history of Buddha."[৯] পৌরাণিকতার ছাপ থাকলেও বুদ্ধচরিতের বিষয়বস্তু সাধু, সজ্জন এবং বহুজন পূজ্য ব্যক্তির জীবন কথা। এ প্রসঙ্গে তারাপদ ভট্টাচার্য বলেন, "বুদ্ধচরিতে বুদ্ধের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত কতটুকু আছে এ-নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে, অবশিষ্ট লক্ষণটি অটুট থাকে যে এটি বিশ্ববন্দ্য পুরুষের চরিতকথা।"[১০]

মূলত যে জীবন-চরিত পাঠককে আকর্ষণ করে তাহাই জীবনী রচনার বিষয়বস্তু হওয়ার যোগ্য। কারণ জীবন-চরিতের মহত্ত্বের উপরই মহাকাব্যের মহত্ত্ব নির্ভর করে। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে যে জীবন-চরিতকে উপজীব্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছে তা নৈতিক আদর্শে পরিপূর্ণ এক মহাজীবন। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে মহামানব গৌতম বুদ্ধের মহাজীবনকে আশ্রয় করে যে আলেখ্য নির্মাণ করেছেন তা স্থান-কালকে অতিক্রম করে 'বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা'য় পরিণত হয়েছে, যেখানে মানব মনের স্পন্দন শোনা যায়, যা বুদ্ধচরিত কাব্যকে মহত্ত্ব দান করেছে। এ কাব্যের আবেদন সার্বজনীন এবং মানব হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দেয়। এ কারণে এ.বি কীথ, জি. কে. নরিমন এবং এম. উন্টানীট্স বুদ্ধচরিতকে মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।[১১] এ প্রসঙ্গে এম. উন্টানীট্স-এর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

"Here we have indeed for the first time an actual epic of Buddha, created by a real poer, a poet, who filled with intense love and reverence for the exalted figure of the Buddha, and deeply imbued with the truth of teh Buddha doctrine, is able to present the life and doctrine of the Master in noble and artistic, but not artificial language."[১২]

উপরের বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, বুদ্ধচরিত কাব্যে বিষয়বস্তু বিষয়ক বৈশিষ্ট্য বা শর্তও রক্ষিত হয়েছে।

৪.৩. নায়ক বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্যের শর্তানুসারে এক বংশে জাত রাজা বা ঐ বংশের বা অন্য বংশের বহুব্যক্তি নায়ক হতে পারে, তবে তথায় নায়ক হবে সুর, সদ্বংশজাত, ক্ষত্রিয় এবং ধীরোদাত্ত গুণান্বিত। গৌতম বুদ্ধের জীবন চরিতই বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। গৌতম বুদ্ধই এ কাব্যের প্রধান নায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

গৌতমবুদ্ধ কুপিলাবস্তু রাজ্যে শাক্যজাতির রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র। শাক্যগণ ছিলেন ক্ষত্রিয় বংশজাত। ফলে নায়ক গৌতমও সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়। কাব্যের ছত্রে ছত্রে তাঁর নায়কোচিত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজকুমার হলেও তাঁর আচার-আচরণ ছিল বিনয়ী। দেবদত্তের শরে আহত রাজহংসের সেবা এবং হংসের দাবীদার দেবদত্তকে হংসের পরিবর্তে বিনয়ের সঙ্গে শাক্যরাজ্য প্রদানে আবেদন তাঁর সেবা ও ত্যাগের মহিমা যেমন ঘোষণা করে তেমনি তাঁর মহত্ত্বও প্রকটিত করে। সর্বপ্রাণীর মঙ্গলের নিমিত্তে দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য স্ত্রী-পুত্র-পরিজন এবং রাজসিংহাসন প্রভৃতি ত্যাগ আত্মত্যাগের জগতে সচারচর দেখা যায় না। রাজকীয় ভোগ ঐশ্বর্য তাঁর প্রাসাদে বসবাসকালীন চিত্তকে আত্মশ্লাঘায় বিগলিত করতে পারেনি। তিনি হর্ষ-শোক প্রভৃতিতে অভিভূত হননি। তার অনন্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে : আহার না পেয়েও তিনি দুঃখ পাননি; বোধিলাভ না হওয়ায় দেহ রক্ষার জন্য আহারের সন্ধানে বের হয়েছিলেন এবং নন্দবালার কাছে পায়েস পেয়েও তিনি উচ্ছ্বসিত হন নি। তাঁর এই শমগুণ তাঁকে ধীরোদাত্ত নায়কের অভিধায় ভূষিত করে। এই ধারণাকে সমর্থন করে নায়কের চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রসঙ্গে দিলীপ কুমার বড়ুয়ার অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

"এ কাব্যের নায়কের চরিত্র শৌর্যে, বীর্যে এবং ঔদার্যের গুণগৌরবে অনন্যসাধারণ, যা মানব মনকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, মহত্ত্ববোধ উদ্রেক করে এবং এর আবেদন সার্বজনীন। বুদ্ধ যতবড় শাস্ত্রবীর, তার চেয়ে বড়-আদর্শবীর বা নীতিবীর। বুদ্ধচরিতে নায়কের নৈতিক বীর্যের মহিমাই প্রদর্শিত হয়েছে।"[১৩]

নায়কের অভ্যুদয় এবং প্রতিনায়কের পরাভব মহাকাব্যের নায়কের অন্যতম গুণ। এ কাব্যে প্রতিনায়ক একটু ভিন্নধর্মী। মানুষের কু-প্রবৃত্তিগুলোকে এ কাব্যে প্রতিনায়কের ভূমিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। রাজ সিংহাসনের মায়া, রাজকীয় ঐশ্বর্য, রূপ-গুণে অপরূপা নারীর স্পর্শ, মার কন্যার প্রলোভন প্রভৃতি কু-প্রবৃত্তিগুলো প্রতিনায়কের চেয়েও অধিক শক্তিশালী, যা এ কাব্যে নায়ক সিদ্ধার্থ গৌতমকে সংকল্পচ্যুত করতে পারেনি, বরং তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তায় নিকট হয়েছিল পরাভূত। ক্ষত্রিয় রীতি

Dhaka University Institutional Repository

অনুসারে বিদ্যা-শিক্ষা পাশাপাশি তিনি শর-নিক্ষেপ এবং অশ্ব-রথ-তলোয়ার চালনায় পারদর্শিতাও অর্জন করেন। গুরুর নিকট বিদ্যা শিক্ষা কালে তিনি অতুলনীয় মেধা, মনন ও প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। যশোধরার সঙ্গে বিবাহের পূর্বে ক্ষত্রিয় যুবকের সঙ্গে শর-নিক্ষেপ এবং অশ্ব-রথ-তলোয়ার চালনায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন, যা তাঁর অপরিসীম শৌর্য-বীর্যের স্বাক্ষর করে। মহাকাব্যে প্রথমে নায়কের গুণ বর্ণনা করা হয়, তৎপর প্রতিনায়কের পরাভব বর্ণনা করা হয়। বুদ্ধচরিত কাব্যে প্রথমে নায়ক সিদ্ধার্থ গৌতমের অপরিসীম গুণকীর্তন করা হয়েছে, তৎপর প্রতিনায়ক হিসেবে উপস্থাপিত কু-প্রভৃতিগুলোর পরাভব দেখানো হয়। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যখানিতে নায়ক সম্পর্কিত মহাকাব্যের লক্ষণও রক্ষিত হয়েছে।

৪.৪. নামকরণ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্যের নামকরণ বিষয়ক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কবির বা বৃত্তের নামে বা নায়কের নামে মহাকাব্যের নামকরণ হবে। "বুদ্ধস্য চরিতং তম্ অধিকৃত্য কৃতঞ্চ মহাকাব্যং ততো বুদ্ধচরিতম্" বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রধান চরিত্র ভগবান বুদ্ধ। তাঁর জীবনচরিত এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। নায়কের নামানুসারেই কাব্যটির নাম রাখা হয়েছে 'বুদ্ধচরিত'। ফলে, বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে নামকরণ বিষয়ক বৈশিষ্ট্যও রক্ষিত হয়েছে।

৪.৫. সর্গ বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

সর্গ বিষয়ক প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহাকাব্য হবে সর্গবন্ধ এবং অসংক্ষিপ্ত। বুদ্ধচরিত কাব্যখানিতে বিষয়বস্তু সর্গ অনুসারে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, বুদ্ধচরিতের তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদে ২৮টি সর্গ রয়েছে। ফলে ধারণা করা হয়, মূল বুদ্ধচরিত কাব্যখানিও ২৮টি সর্গে বিভক্ত ছিল। আবিষ্কৃত সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির তেরটি সর্গ বুদ্ধঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে ধরে নিলেও বুদ্ধচরিত কাব্যে সর্গ সংখ্যা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ এতে আটের অধিক সর্গ থাকার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। যে জীবন মহৎ সে জীবনের উপস্থাপনের

Dhaka University Institutional Repository

আয়োজনও বিস্তর। তাই বুদ্ধচরিত কাব্যখানি অসংক্ষিপ্ত এবং সর্গগুলো অতি দীর্ঘও যেমন নয়, তেমনি অতি ক্ষুদ্রও নয়। নিম্নের প্রদত্ত তালিকা হতে তা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় :

সর্গ	**শ্লোক সংখ্যা**
প্রথম	৮৯
দ্বিতীয়	৫৬
তৃতীয়	৬৫
চতুর্থ	১০৩
পঞ্চম	৮৭
ষষ্ঠ	৬৮
সপ্তম	৫৮
অষ্টম	৮৭
নবম	৮২
দশম	৮১
একাদশ	৭৩
দ্বাদশ	১২১
ত্রয়োদশ	৭৩
চতুর্দশ	১১২

মহাকাব্যের সর্গ বিষয়ক অপর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সর্গস্থ বিষয়বস্তু অনুসারে সর্গের নামকরণ হবে। বুদ্ধচরিতকাব্যের প্রতিটি সর্গে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। যেমন, প্রথম সর্গে কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদনের স্ত্রী মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন, মায়া দেবীর গর্ভে সিদ্ধার্থ গৌতমের প্রতিসন্ধি গ্রহণ, লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ, ঋষি অসিতের রাজকুমার দর্শন, রাজকুমার সম্পর্কে ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী এবং লুম্বিনী কানন থেকে কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা প্রভৃতি বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। এক কথায় বলা চলে, প্রথম সর্গে সিদ্ধার্থ গৌতম তথা গৌতম বুদ্ধের জন্ম কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাই সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে 'ভগবৎপ্রসূতি'। বিষয়বস্তুর সঙ্গে এই নামকরণ সঙ্গতিপূর্ণ। দ্বিতীয় সর্গে রাজকীয় ভোগ

ঐশ্বর্যে কপিলাবস্তু নগরীর রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে কুমারের বেড়ে উঠা, যশোধরার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এবং পুত্র রাহুলের জন্ম প্রভৃতি রাজাকুমার সিদ্ধার্থের জীবনাচার বর্ণিত হওয়ায় সর্গটির নামকরণ করা হয় 'অন্তপুরঃবিহারঃ'। এ সর্গেও বিষয়বস্তুর সঙ্গে নামকরণের সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় সর্গে নগর ভ্রমণের সময় মানব জীবনের চরম পরিণতি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং শান্তি ও সত্যান্বেষণী সন্ন্যাসী - এই চারি নিমিত্ত দর্শন করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে যে সংবেগ সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর বর্ণনা দেওয়া হয়। বর্ণিত বিষয় অনুসারে সর্গটির নামকরণ করা হয় 'সংবেগোৎপত্তিঃ'। ফলে, বলা যায়, তৃতীয় সর্গও সর্গস্থ বিষয় অনুসারে নামকরণ করা হয়েছে। সিদ্ধার্থ গৌতমের মনের ভাবাবেগ দূর করার জন্য পিতা রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে ইন্দ্রিয়জাত সুখে নিমজ্জিত রাখার নিমিত্তে ছলা-কলায় পারদর্শী, রূপ-গুণে অদ্বিতীয়া, বশীকরণে পারদর্শী রমণী দ্বারা সর্বদা পরিবেষ্টিত করে রাখতেন। সংকল্পে অবিচল, দৃঢ়চিত্ত, দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণে প্রতিজ্ঞ কুমার কর্তৃক সেসব নারী প্রত্যাখ্যানের কাহিনি চতুর্থ সর্গে বর্ণিত হয়েছে এবং বর্ণিত বিষয় অনুসারে চতুর্থ সর্গের নামকরণ করা হয়েছে 'স্ত্রীবিঘাতনঃ'। পঞ্চম সর্গে সিদ্ধার্থ গৌতমের গৃহত্যাগ তথা অভিনিষ্ক্রমণের কথা বর্ণিত হয়েছে বিধায় সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে 'অভিনিষ্ক্রমণম্'। ষষ্ঠ অধ্যায়ে গৃহত্যাগের পর সিদ্ধার্থ গৌতম ভার্গব মুনির আশ্রমে সারথী ছন্দককে রাজভূষণাদি অর্পন করে বিদায় দেওয়ার কাহিনি বর্ণিত হওয়ায় সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে 'ছন্দকনিবর্ত্তণঃ'। ছন্দককে বিদায় দিয়ে সিদ্ধার্থ গৌতম তপোবনে প্রবেশ করলেন। সপ্তম অধ্যায়ে তপোবনের জীবনাচার বর্ণিত হওয়ায় অধ্যায়টির নামকরণ করা হয়েছে 'তপোবনপ্রবেশঃ'। সারথী ছন্দকের নিকট সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের খবর শুনে রাজ অন্তঃপুরে শোকের ছায়া নেমে আসে এবং রাজ অন্তঃপুরবাসীগণ শোকে মূহ্যমান হয়ে বিলাপ করতে থাকে। সেই বিষয়টি অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়। তাই সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে 'অন্তঃপুর বিলাপঃ'। শোকে মূহ্যমান পিতা রাজা শুদ্ধোদন রাজকুমার সিদ্ধার্থকে অন্বেষণ করে নিয়ে আসার জন্য রাজ অমাত্যদের আদেশ দেন। রাজার আদেশে অমাত্যগণ কুমার অন্বেষণে গমন করেন। সেই কাহিনি বর্ণিত হওয়ায় নবম

সর্গের নামকরণ করা হয়েছে ‘কুমারান্বেষণঃ’। সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্বক সিদ্ধার্থ গৌতম পাণ্ডব পর্বতে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সৌম্য-অবয়ব এবং শমগুণের কথা শুনে মগধরাজ বিম্বিসার তাঁকে দর্শন করার জন্য পাণ্ডব পর্বতে আগমন করেন এবং তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করেন। সেই বিষয়টি দশম সর্গে বর্ণিত হওয়ায় সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে ‘শ্রেণ্যাভিগমনঃ’। মগধরাজ বিম্বিসার সিদ্ধার্থ গৌতমের সৌম্যকান্তি রূপ দর্শন করে অভিভূত হন এবং তাঁকে অর্ধেক রাজ্য ভোগ করার, সেনাপতির পদ অলংকৃত করার এবং অর্থ-কামধর্ম পালন করার আহ্বান জানান। সন্ন্যাস জীবনাচারী সিদ্ধার্থ গৌতম রাজাকে কামধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। এই বিষয়টি একাদশ সর্গে বর্ণিত হয়েছে এবং সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে ‘কামবিগর্হণম্’। দ্বাদশ সর্গে ‘ঋষি অরাড় কালামের সাক্ষাৎ ও কথোপকথের বিষয় বর্ণিত হওয়ায় সর্গটির নামকরণ করা হয়েছে ‘অরাড়দর্শনম্’। ত্রয়োদশ সর্গে ‘মার বিজয়ের; কাহিনি বর্ণিত হওয়ায় সর্গটির নামকরণ করা হয় ‘মারবিজয়ঃ’। চতুর্দশ সর্গে বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির কথাবর্ণিত হয়। তাই সর্গটির নামকরণ করা হয় ‘বুদ্ধত্বপ্রাপ্তিঃ’। অতএব, দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধচরিতের প্রতিটি সর্গ সর্গস্থ বিষয় অনুসারে নামকরণকৃত।

বুদ্ধচরিতের প্রতিটি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন, বুদ্ধচরিতের দ্বিতীয় সর্গে ‘অন্তঃপুরবিহারঃ’ নামক সর্গে কপিলাবস্তু নগরীর অভ্যন্তরে সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনাচার বর্ণিত হয়েছে। তার ইঙ্গিত প্রথম সর্গে কপিলাবস্তু নগরে প্রবেশের কথার মাধ্যমে প্রদান করা হয়, যা নিম্নরূপ:

পুরমথ পুরতঃ প্রবেশ্য পত্নীং স্থবিরজনানুগতামপত্যনাথাম্।
নৃপতিরপি জগাম পৌরসংঘৈর্দিবমমরৈর্মঘবানিবার্চ্যমানঃ।।
ভবনমথ বিগাহ্য শাক্যরাজো ভব ইব ষন্মুখজন্মনা প্রতীতঃ।
ইদমিদমিতি হর্ষপূর্ণবক্ত্রো বহুবিধপুষ্টিযশস্করং ব্যধত্ত।।
ইতি নরপতিপুত্রজন্মবৃদ্ধ্যা সজনপদং কপিলাহ্বয়ং পুরং তৎ।
ধনদপূরমিবাপ্সরসোহবকীর্ণং মুদিতমভূন্নলকূবরপ্রসূতৌ।।[১৪]

অর্থাৎ "এরপর সন্তাবতী পত্নীকে রাজা প্রথমে নগরে প্রবেশ করালেন - তাঁকে অনুগমন করলেন বৃদ্ধজন। ইন্দ্র যেমন দেবগণের অর্চিত হয়ে স্বর্গে গমন করেন - তেমনি রাজাও পৌরজনের অভ্যর্থনা লাভ করে নগরে প্রবেশ করলেন। ষড়াননের জন্মে মহাদেবের মতোই প্রীত হয়েছিলেন শাক্যরাজ। ভবনে প্রবেশ করে তিনি – 'এইটি কর, এইটি কর' বলে বহুবিধ পুষ্টি ও কল্যাণকর কর্মের আদেশ দিলেন। এইভাবে রাজপুত্র জন্মের সমৃদ্ধিতে জনপদ-সমন্বিত কপিলাবস্তু নগরী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল - যেমন উদ্বেল হয়েছিল নল-কুবেরের জন্মে অপ্সরাপূর্ণ কুবেরপুরী।"

উপরে বর্ণিত বিষয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, অন্তঃপুর প্রবেশের কথার মাধ্যমে অন্তঃপুরে জীবনাচার শুরুর ইঙ্গিত প্রদান কারা হয়েছে। ফলে বলা যায়, প্রথম সর্গের সঙ্গে দ্বিতীয় সর্গের সম্বন্ধ রক্ষিত হয়েছে।

অনুরূপভাবে, বুদ্ধচরিত কাব্যে তৃতীয় সর্গের বিষয়বস্তুর আভাস দ্বিতীয় সর্গের শেষে এভাবে প্রদান করা হয়েছে :

এবং স ধর্মং বিবিধং চকার সদ্ভির্নিপাতং শ্রুতিতশ্চ সিদ্ধম্।
দৃষ্ট্বা কথং পুত্রমুখং সুতো মে বনং ন যায়াদিতি নাথমানঃ।।
রিবক্ষিষন্তঃ শ্রিয়মাত্মসংস্থাং রক্ষন্তি পুত্রান্ ভুবি ভূমিপালাঃ।
পুত্রং নরেন্দ্রঃ স তু ধর্মকামো ররক্ষ ধর্মাদ্‌বিষয়েষু মুঞ্চন্।।
বনমনুপমসত্ত্বা বোধিসত্ত্বাস্তু সর্বে বিষয়সুখরসজ্ঞা জগ্মুরুৎ পন্নপুত্রাঃ।
অত উপচিতকর্মা রুঢ়ম্‌লেহপি হেতৌ সরতিমুপসিষেবেবোধিমাপন্ন যাবৎ।।[১৫]

অর্থাৎ "পুত্রমুখ দর্শন করে তিনি (রাজা শুদ্ধোদন) সাধুসেবিত বেদসিদ্ধ বিবিধ ধর্মের অনুষ্ঠানকরণে, তাঁর প্রার্থনা –আমার পুত্র যেন কোন প্রকারেই বনে না যায়। পৃথিবীতে নরপতিগণ আপনাকে প্রতিষ্ঠিত সম্পদ রক্ষার ইচ্ছায় পুত্রদের রক্ষা করেন – সেই ধর্মকাম নরপতি কিন্তু বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত করে দিয়ে পুত্রকে ধর্ম থেকে রক্ষা করেছিলেন। অনুপম চরিত্র সমস্ত বোধিসত্ত্বই বিষয়সুখরস অনুভব করে পুত্র উৎপন্ন হলেই বনে গমন করেছিলেন। তাই বন গমনের হেতু দৃঢ়মূল হলেও কর্মক্ষয় না হওয়ায় সিদ্ধার্থ বোধিলাভ না করা পর্যন্ত ইন্দ্রিয়-সুখের সেবা করেছিলেন।"

উপরের বর্ণনায় দেখা যায়, রাজকুমার সিদ্ধার্থ যাতে সংসার ত্যাগ করে বনবাসী না হয়, তার জন্য রাজা শুদ্ধোদন নানা প্রকার চেষ্টা করেন, যা সন্ন্যাস অবলম্বনের জন্য সিদ্ধার্থের চিত্তে ভাবান্তর উদয় হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। এভাবে দ্বিতীয় সর্গের শেষে আভাস দিয়ে তৃতীয় সর্গে রাজকুমার সিদ্ধার্থের চিত্তে সংসার ত্যাগের উদ্বেগ উৎপত্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। ফলে, দেখা যায় যে, দ্বিতীয় সর্গেও তৃতীয় সর্গের বিষয়বস্তুর আভাস দেওয়ার শর্ত তথা দু'টি সর্গের পরস্পর সম্বন্ধ রক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, এভাবে বুদ্ধচরিতের প্রতিটি সর্গে তৎপরবর্তী সর্গের বিষয়বস্তুর আভাস দিয়ে সর্গসমূহের মধ্যে সম্বন্ধ করা হয়েছে। অতএব, বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে সর্গ বিষয়ক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে।

৪.৬. উদ্দেশ্য বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্যের উদ্দেশ্য হবে চতুর্বর্গ ফলদায়ক। অর্থাৎ মহাকাব্য পাঠের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ - এই চার প্রকার ফল লাভ ঘটে। সংস্কৃত আলংকারিক দণ্ডীর মতে, "নিরন্তর কাব্যানুশীলনে মানুষ ধর্মে প্রবর্তিত হয়, অধর্মে নির্বৃত্ত হয়। কাব্যাদি রচনা করে অনেকে বিপুল অর্থের অধিকারী হন, গ্রন্থ প্রকাশনা ও অধ্যাপনাদি করেও অনেকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন। বেদাদি শাস্ত্রের ন্যায় কাব্যশাস্ত্রও চতুর্বর্গ ফললাভের হেতু হয়।"[১৬]

সমীক্ষায় দেখা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে প্রধান আলোচ্য বিষয় গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন, যে জীবন বিশুদ্ধ, দশ পারমিতে পরিপূর্ণ, সেবা ও ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর এবং অনুকরণী, যা পাঠে মানুষের চিত্তে ধর্মীয় চেতনা উৎপন্ন হয়, মানুষকে দুঃখমুক্তির পথে পরিচালিত করে এবং নির্বাণ প্রাপ্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। অন্যদিকে মানুষকে অকুশল কর্ম সম্পাদন হতে বিরত রাখে। এক কথায় বলা যায়, বুদ্ধচরিত পাঠে ধর্ম প্রাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাকাব্য রচনা করে বা পাঠ করে কবি ও পাঠকের অর্থ প্রাপ্তি হয়। কবি অশ্বঘোষ ছিলেন সংসারত্যাগী বৌদ্ধ ভিক্ষু। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের প্রধান প্রত্যাশা অর্থ নয়, সর্বপ্রাণীর দুঃখমুক্তি, যা অশ্বঘোষের ক্ষেত্রেও ছিল সত্য। কাব্য রচনা উদ্দেশ্য অশ্বঘোষ এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

"এ কাব্যের বিষয় মুক্তি, কিন্তু রচিত হয়েছে কাব্যের রীতিতে, আনন্দ দান এর উদ্দেশ্য নয়, শান্তির পথ বিশ্লেষণ করাই এর লক্ষ্য; আর একটি লক্ষ্য, যেসব শ্রোতার মন বিক্ষিপ্ত তাদের আকৃষ্ট করা। যাতে সবাই আকৃষ্ট হন এইজন্য আমি কাব্যে মুক্তি বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়েরও অবতারণা করেছি, কিন্তু অবতারণা করতে গিয়ে আমি কাব্যধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হইনি। আমার লক্ষ্য এর সাধুতা বাড়ানো, যেমন তিক্ত ঔষধে মধু মিশিয়ে উপাদেয় করে তোলা হয়, এ-ও তেমনি।"[১৭]

অশ্বঘোষের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায়, অর্থ নয়, মানুষকে শান্তির পথ প্রদর্শন করাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে তাঁর অর্থ লাভ হয়েছিল কি না তা জানা না গেলেও তিনি যে বুদ্ধজীবনী উপস্থাপন করে মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন তা চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিনের বর্ণনা হতে উপলব্ধি করা যায়। ইৎ-সিং তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন, বুদ্ধচরিত কাব্যখানি ভারতবর্ষে খুবই জনপ্রিয় ছিল এবং তা গীতাকারে বহুল পঠিত হত। যেহেতু গীতাকারেও পঠিত হতো সেহেতু পাঠকারীর যে অর্থ লাভ হত তা অনুমান করা যায়।

তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে কাম লাভ। ইতঃপূর্বে বলেছি, অশ্বঘোষ কবি হিসেবে পরিচিত হলেও ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। লোভ-দ্বেষ-কাম-মোহ ভিক্ষু জীবনের পরিপন্থি। ফলে, বুদ্ধচরিত কাব্য রচনা করে অশ্বঘোষের যে কাম প্রাপ্তি ঘটেনি তা স্পষ্ট। সাধারণত অর্থের মাধ্যমে কাম প্রাপ্তি ঘটে। যেহেতু বুদ্ধচরিত কাব্যখানি বহুল পঠিত হতো সেহেতু পাঠকারীর যে অর্থ লাভ হতো এবং তা দ্বারা কাম প্রাপ্তি ঘটতো তা সহজেই ধারণা করা যায়।

চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে মোক্ষ লাভ। মোক্ষোপযোগী বাক্যে জ্ঞান উৎপাদনের মাধ্যমে মহাকাব্য মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব করে। অশ্বঘোষ নিজেই স্বীকার করেছেন, মানুষকে দুঃখমুক্ত শান্তির পথে পরিচালিত করাই তাঁর কাব্য রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। নির্বাণ লাভ হচ্ছে বৌদ্ধধর্মে প্রধান উদ্দেশ্য, যাকে মোক্ষলাভ হিসেবে অভিহিত করা যায়। তৃষ্ণাজাত লোভ-দ্বেষ-মোহ এবং কামনা-বাসনা ধ্বংস এবং পারমির অনুশীলন ব্যতীত নির্বাণ লাভ সম্ভব নয়। বুদ্ধচরিত কাব্যের ছত্রে ছত্রে লোভ-দ্বেষ-মোহ এবং কামনা-বাসনা ধ্বংসকারী এবং পারমি

চর্চা বিষয়ক মোক্ষোপযোগী বাক্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যা জ্ঞান উৎপাদনপূর্বক মোক্ষ তথা নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটাতে সক্ষম। চতুর্বর্গের মধ্যে চতুর্থবর্গ বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রধান ফলদায়ক। অতএব, উদ্দেশ্য বিষয়ক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যও রক্ষিত হয়েছে।

৪.৭. ছন্দ-অলংকার বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্য হবে নানা ছন্দে রচিত এবং অলংকার বহুল। ছন্দ-অলংকার কাব্যের শোভা বৃদ্ধি করে। কাব্যের বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছন্দ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। শ্রুতিমাধুর্য সম্পাদন ছাড়াও কাব্যকে মৌখিকভাবে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে ছন্দ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। ছন্দ আনন্দের উৎস, সৃষ্টির প্রেরণা। আমাদের নিত্য দিনের জীবনচর্চাও ছন্দময়। ছন্দের পতনে বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গ বৈকল্য ঘটে, সৃষ্টি ধ্বংস হয়। অনুরূপভাবে, ছন্দের পতন ঘটলে কাব্যের সৌন্দর্যহানি ঘটে। তাই ছন্দকে মহাকাব্যের বলিষ্ঠ উপকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ই. এইচ. জনস্টন অশ্বঘোষ রচিত বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরনন্দ কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং কী কী ছন্দ ব্যবহার করেছেন তা চিহ্নিত করেছে। ই. এইচ. জনস্টনের [১৮] গবেষণা সমীক্ষা করলে দেখা যায় যায়, অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে সমবৃত্ত ছন্দ, অর্ধসমবৃত্ত এবং বিষমবৃত্ত হিসেবে তিনটি ছন্দই ব্যবহার করেছেন। বিস্তারিতভাবে বললে, তিনি অনুষ্টুভ্, উপজাতি, বংশস্থ, রুচিরা, প্রহর্ষিণী, মালিনী, শিখরিণী, অপরবক্ত্র, বৈতালীয়, পুষ্পিতাগ্রা এবং উদ্গাথা প্রভৃতি ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এছাড়াও, আলোচ্য কাব্যে বৈপুলা ছন্দের ব্যবহারও দৃষ্ট হয়। বুদ্ধচরিত কাব্যের ছন্দ বিশ্লেষণে দেখা যায়- অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রতিই কবির আকর্ষণ ছিল বেশী; এই ছন্দটি তিনি বুদ্ধচরিত কাব্যে সর্বাধিকবার (৩৭৭ বার) ব্যবহার করেছেন। প্রয়োগাধিক্যের ক্রমানুসারে ছন্দগুলিকে সাজালে প্রথমেই আসে অনুষ্টুপ্। তারপর উপজাতি (৩৬৭ বার), বংশস্থবিলম্ (১২৮ বার), ইন্দ্রবজ্রা (১২৪ বার), ঔপছন্দসিক (৭৮ বার), পুষ্পিতাগ্রা (২৩ বার), উপেন্দ্রবজ্রা (১০বার), রুচিরা (৬ বার), মালিনী (২ বার), শিখরিণী(১ বার) ও অপরবক্ত্র (১ বার)। নিম্নে সমীক্ষাপূর্বক বুদ্ধচরিত কাব্যে অশ্বঘোষ ব্যবহৃত ছন্দ চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হলো :

ছন্দঃ	সর্গ/শ্লোক	ব্যবহার সংখ্যা/বার
অনুষ্টুপ্	**চতুর্থ সর্গ : শ্লোক ১**-৯৬; ষষ্ঠ সর্গ : শ্লোক ১-৫৫; দ্বাদশ সর্গ : শ্লোক ১-১১৫; **চতুর্দশ সর্গ : ১-১১১**	৩৭৭
ইন্দ্রবজ্রা	**প্রথম সর্গ :** শ্লোক ১৭, ২২, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৪৮, ৫৩, ৬৩, ৬৭, ৬৮, ৭২, ৭৬, ৭৭; **দ্বিতীয় সর্গ :** শ্লোক ১১, ১২, ১৪, ২৫, ৩৫, ৩৭, ৪১, ৪৮, ৪৯; **তৃতীয় সর্গ :** শ্লোক ১২, ১৪, ১৫, ২৩, ২৫, ৩০, ৩৩, ৩৫, ৪৩, ৪৯; **ষষ্ঠ সর্গ :** শ্লোক ৫৯, ৬৫; **সপ্তম সর্গ :** শ্লোক ৭, ১২, ১৬, ২০, ২৩, ২৮, ৩১, ৪০, ৪৫, ৫১-৫৩, ৫৭; **নবম সর্গ :** শ্লোক ৬, ১৯, ২৩, ২৭-২৯, ৩৩, ৩৪, ৪২, ৪৬, ৪৭, ৫১-৫৪, ৫৭, ৬০, ৬৪, ৬৭; **দশম সর্গ :** শ্লোক ৫, ১৬, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩১, ৩৫; **একাদশ সর্গ :** শ্লোক ২, ৯, ১৩, ১৮-২০, ২২, ২৩, ২৫-২৭, ৩২, ৩৪-৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৫০, ৫২; **ত্রয়োদশ সর্গ :** শ্লোক ১, ২, ৬, ১০, ২১, ২৫, ৩৪, ৪১, ৪৭, ৫০, ৫১, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৮	১২৪
উপেন্দ্রবজ্রা	**প্রথম সর্গ :** শ্লোক ৫১; দ্বিতীয় সর্গ : শ্লোক ২, ৪৪, ৪৭; তৃতীয় সর্গ : শ্লোক ৩৯; **সপ্তম সর্গ :** শ্লোক ৩২; নবম সর্গ : শ্লোক ১১, ৬৯; দশম সর্গ : শ্লোক ৮, ১৩;	১০
উপজাতি	**প্রথম সর্গ :** শ্লোক ৫, ৮-১৬, ১৮-২১, ২৩-২৭, ৩০, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯-৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫২, ৫৪-৬২, ৬৪-৬৬, ৬৯-৭১, ৭৩-৭৫, ৭৮, ৭৯; **দ্বিতীয় সর্গ :** শ্লোক ১, ৩-১০, ১৩, ১৫-২৪, ২৬-৩৪, ৩৬, ৩৮-৪০, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৬, ৫০-৫৫; **তৃতীয় সর্গ :** শ্লোক ১-১১, ১৩, ১৬-২২, ২৪, ২৬-২৯, ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬-৩৮, ৪০-৪২, ৪৪-৪৮, ৫০-৬২; **ষষ্ঠ সর্গ :** শ্লোক ৫৬-৫৮, ৬০-৬৪; সপ্ত সর্গ : শ্লোক ১-৬, ৮-১১, ১৩-১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৪-২৭, ২৯, ৩০, ৩৩-৩৯, ৪১-৪৪, ৪৬-৫০, ৫৪-৫৬; **নবম সর্গ :** শ্লোক ১-৫, ৭-১০, ১২-১৮, ২০-২২, ২৪-২৬, ৩০-৩২, ৩৫-৪১, ৪৩-৪৫, ৪৮-৫০, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৫৯, ৬১-৬৩, ৬৫, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭১; **দশম সর্গ :** শ্লোক ১-৪, ৬, ৭, ৯-১২, ১৪, ১৫, ১৭-২৩, ২৫, ২৭, ৩০, ৩২-৩৪, ৩৬-৩৯; **একাদশ সর্গ :** শ্লোক ১, ৩-৮, ১০-১২, ১৪-১৭, ২১, ২৪, ২৮-৩১, ৩৩, ৩৮, ৪১-৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৩-৫৭; **ত্রয়োদশ সর্গ :** শ্লোক ৩-৫, ৭-৯, ১১-২০, ২২-২৪, ২৬-৩৩, ৩৫-৪০, ৪২-৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫২-৫৯, ৬১, ৬২, ৬৫, ৬৭, ৬৯	৩৬৭

বংশস্থবিলম্	**তৃতীয় সর্গ : শ্লোক** ৬৩; **চতুর্থ সর্গ** : শ্লোক ৯৭-১০২; **ষষ্ঠ সর্গ :** শ্লোক ৬৬, ৬৭, ৬৮; **অষ্টম সর্গ :** শ্লোক ১-৮৩; **নবম সর্গ :** শ্লোক ৭২-৮০; **দশম সর্গ :** শ্লোক ৪০; **একাদশ সর্গ** : শ্লোক ৫৮-৭৩; **দ্বাদশ সর্গ** : শ্লোক ১১৬-১২০; **ত্রয়োদশ সর্গ :** শ্লোক ৭০,৭১,৭৩; **চতুর্দশ সর্গ :** শ্লোক ১১২	১২৮
রুচিরা	**তৃতীয় সর্গ : শ্লোক** ৬৪, ৬৫; **নবম সর্গ :** শ্লোক ৮১, ৮২; **দশম সর্গ :** শ্লোক ৪১; **দ্বাদশ সর্গ :** শ্লোক ১২১	৬
মালিনী	**দ্বিতীয় সর্গ : শ্লোক** ৫৬; **ত্রয়োদশ সর্গ :** শ্লোক ৭২	২
শিখরিণী	**চতুর্থ সর্গ : শ্লোক** ১০৩	১
অপরবক্ত্র	**সপ্তম সর্গ : শ্লোক** ৫৮	১
ঔপছন্দসিক	**পঞ্চম শ্লোক** ১-৭৮;	৭৮
পুষ্পিতাগ্রা	**প্রথম সর্গ : শ্লোক** ৮০-৮৯; **পঞ্চম সর্গ :** শ্লোক ৭৯-৮৭; **অষ্টম সর্গ** : শ্লোক ৮৪-৮৭	২৩

বুদ্ধচরিত কাব্যের ছন্দোলক্ষণ বিচার :

অনুষ্টুপ্ ছন্দ :

লক্ষণ- শ্লোকে ষষ্ঠং গুরু জ্ঞেয়ং সর্বত্র লঘু পঞ্চমম্। প্র প্র

দ্বিচতুষ্পাদয়োর্হ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।। শ্রুতবোধে ১০

লক্ষণার্থ- শ্লোকে প্রতিপাদের পঞ্চমাক্ষর সর্বদা লঘু হবে, ষষ্ঠাক্ষর সর্বদা গুরু থাকবে। দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদে সপ্তমাক্ষর হ্রস্ব হবে কিন্তু অন্য দুটি পাদে গুরু থাকবে।(অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রতি অক্ষরের লঘুগুরুর বিধি নেই–¤)

যথা– ততস্তস্মাৎ পুরোদ্যানাৎ কৌতূহলছলেক্ষণাঃ ।

প্রত্যুজ্জগ্মুর্নৃপসুতং প্রাপ্তং বরমিব স্ত্রিয়ঃ।। বু.চ. ৪/১

অনুষ্টুপ্	
প্রথমপাদ	¤¤¤¤ᴗ – –¤
	ততস্তস্মাৎ পুরোদ্যানাৎ
দ্বিতীয়পাদ	¤¤¤¤ᴗ – ᴗ¤
	কৌতূহলছলেক্ষণাঃ।
তৃতীয়পাদ	¤¤¤¤ᴗ – –¤
	প্রত্যুজ্জগ্মুর্নৃপসুতং
চতুর্থপাদ	¤¤¤¤ᴗ – ᴗ¤
	প্রাপ্তং বরমিব স্ত্রিয়ঃ।।

ইন্দ্রবজ্রা

লক্ষণ- স্যাদিন্দ্রবজ্রা যদি তৌ জগৌ গঃ। ছন্দোমঞ্জরী **১**ম স্তবক/৪**১**শ সূত্র

লক্ষণার্থ- প্রতিপাদে যথাক্রমে" ততজগগ" গণ হলে ইন্দ্রবজ্রা হয়।

যথা– নাগৌরবো বন্ধুষু নাপ্যদাতা নৈবাব্রতো নানৃতিকো ন হিংস্রঃ ।

আসীৎ তদা কশ্চন তস্য রাজ্যে রাজ্ঞো যবাতেরিব নাহুষস্য।। বু.চ. ২/১১

ইন্দ্রবজ্রা	
প্রথমপাদ	– – ᴗ | – – ᴗ | ᴗ – | –
	নাগৌরবো বন্ধুষু নাপ্যদাতা
দ্বিতীয়পাদ	– – ᴗ | – – ᴗ | ᴗ – | –
	নৈবাব্রতো নানৃতিকো ন হিংস্রঃ।
তৃতীয়পাদ	– – ᴗ | – – ᴗ | ᴗ – | –
	আসীৎ তদা কশ্চন তস্য রাজ্যে
চতুর্থপাদ	– – ᴗ | – – ᴗ | ᴗ – | –
	রাজ্ঞো যবাতেরিব নাহুষস্য।।

উপেন্দ্রবজ্রা

লক্ষণ- উপেন্দ্রবজ্রা জ্তৌ জ্গৌ গ্। পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্- ৬/১৭

লক্ষণার্থ- জতজগগ গণ হলে উপেন্দ্রবজ্রা হয়।

যথা– যদা তু তত্রৈব ন শর্ম লেভে জরা জরেতি প্রপরীক্ষমাণঃ ।

তততো নরেন্দ্রানুমতঃ স ভূয়ঃ ক্রমেণ তেনৈব বহির্জগাম।। বু.চ. ৩/৩৯

<table>
<tr><td colspan="2">উপেন্দ্রবজ্রা</td></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রথমপাদ</td><td>⏑ - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>যদা তু তত্রৈব ন শর্ম লেভে</td></tr>
<tr><td rowspan="2">দ্বিতীয়পাদ</td><td>⏑ - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>জরা জরেতি প্রপরীক্ষমাণঃ।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">তৃতীয়পাদ</td><td>⏑ - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>ততো নরেন্দ্রানুমতঃ স ভূয়ঃ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চতুর্থপাদ</td><td>⏑ - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>ক্রমেণ তেনৈব বহির্জগাম।।</td></tr>
</table>

উপজাতি :

লক্ষণ- আদ্যন্তাবুপজাতয়ঃ। পিঙ্গলচ্ছন্দঃসূত্রম্- ৬/১৮

লক্ষণার্থ- ইন্দ্রবজ্রা উপেন্দ্রবজ্রার মিলনে যে ছন্দঃ তা উপজাতি।

যথা–বিপ্রাশ্চ গত্বা বহিরিধ্মহেতোঃ প্রাপ্তাঃ সমিৎপুষ্পপবিত্রহস্তাঃ ।

তপঃপ্রধানাঃ কৃতবুদ্ধয়োহপি তং দ্রষ্টুমীয়ুর্ন মঠানভীয়ুঃ।। বু.চ. ৭/৪

<table>
<tr><td colspan="2">উপজাতি</td></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রথমপাদ</td><td>- - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>বিপ্রাশ্চ গত্বা বহিরিধ্মহেতোঃ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">দ্বিতীয়পাদ</td><td>- - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>প্রাপ্তাঃ সমিৎপুষ্পপবিত্রহস্তাঃ।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">তৃতীয়পাদ</td><td>⏑ - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>তপঃপ্রধানাঃ কৃতবুদ্ধয়োহপি</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চতুর্থপাদ</td><td>- - ⏑ | - - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - | -</td></tr>
<tr><td>তং দ্রষ্টুমীয়ুর্ন মঠানভীয়ুঃ।।</td></tr>
</table>

বংশস্থবিলম্ :

লক্ষণ- বদন্তি বংশস্থবিলং জতৌ জরৌ। ছ.ম.- ২/৬৬

লক্ষণার্থ- জতজর গণক্রমকে বংশস্থবিল বা বংশস্থ বলে।

যথা– ইতি ব্রুবাণেহপি নরাধিপাত্মজে নিবর্তয়ামাস স নৈব তং রথম্ ।

বিশেষযুক্তং তু নরেন্দ্রশাসনাৎ স পদ্মখণ্ডং বনমেব নির্যযৌ।। বু.চ. ৩/৬৩

বংশস্থবিলম্	
প্রথমপাদ	⏑ – ⏑ | – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – ⏑ –
	ইতি ব্রুবাণেহপি নরাধিপাত্মজে
দ্বিতীয়পাদ	⏑ – ⏑ | – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – ⏑ –
	নিবর্তয়ামাস স নৈব তং রথম্।
তৃতীয়পাদ	⏑ – ⏑ | – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – ⏑ –
	বিশেষযুক্তং তু নরেন্দ্রশাসনাৎ
চতুর্থপাদ	⏑ – ⏑ | – – ⏑ | ⏑ – ⏑ | – ⏑ –
	স পদ্মখণ্ডং বনমেব নির্যযৌ।।

রুচিরা :

লক্ষণ- জভৌ সজৌ গিতি রুচিরা চতুর্গ্রহৈঃ। ছ.ম.- ২/৯৬

লক্ষণার্থ- জভসজগ গণক্রম থাকলে রুচিরা হয়। চতুর্থ ও নবম অক্ষরে যতি থাকে।

যথা– ইত্যেবং মগধপতির্বচো বভাষে যঃ সম্যগ্বলভিদিব ব্রুবন্ ববাসে।

তচ্ছ্রুত্বা ন স বিচচাল রাজসূনুঃ কৈলাসো গিরিরিব নৈকচিত্রসানুঃ।। বু.চ.১০/৪১

রুচিরা	
প্রথমপাদ	⏑ – ⏑ | –• ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | –•
	ইত্যেবং মগধপতির্বচো বভাষে
দ্বিতীয়পাদ	⏑ – ⏑ | –• ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | –•
	যঃ সম্যগ্বলভিদিব ব্রুবন্ ববাসে ।
তৃতীয়পাদ	⏑ – ⏑ | –• ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | –•
	তচ্ছ্রুত্বা ন স বিচচাল রাজসূনুঃ
চতুর্থপাদ	⏑ – ⏑ | –• ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ – | ⏑ – ⏑ | –•
	কৈলাসো গিরিরিব নৈকচিত্রসানুঃ।।

মালিনী :

লক্ষণ- ননময়য়যূতেয়ং মালিনী ভোগিলোকৈঃ। ছ.ম.- ২/১৩৪

লক্ষণার্থ- ননময়য় থাকলে মালিনী হয়। অষ্টম ও সপ্তম অক্ষরে যতি থাকে।

যথা– বনমনুপমসত্ত্বা বোধিসত্ত্বাস্তু সর্বে

বিষয়সুখরসজ্ঞা জগ্মুরুৎ পন্নপুত্রাঃ।

অত উপচিতকর্মা রূঢমূলেহপি হেতৌ

স রতিমুপসিষেবে বোধিমাপন্ন যাবৎ।। বু.চ. ২/৫৬

<table>
<tr><th colspan="2">মালিনী</th></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রথমপাদ</td><td>⏑⏑⏑|⏑ ⏑ ⏑|––•–|⏑––|⏑––•</td></tr>
<tr><td>বনমনুপমসত্ত্বা বোধিসত্ত্বাস্তু সর্বে</td></tr>
<tr><td rowspan="2">দ্বিতীয়পাদ</td><td>⏑⏑⏑|⏑ ⏑ ⏑|––•–|⏑––|⏑––•</td></tr>
<tr><td>বিষয়সুখরসজ্ঞা জগ্মুরুৎ পন্নপুত্রাঃ।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">তৃতীয়পাদ</td><td>⏑⏑⏑|⏑ ⏑ ⏑|––•–|⏑––|⏑––•</td></tr>
<tr><td>অত উপচিতকর্মা রূঢমূলেহপি হেতৌ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চতুর্থপাদ</td><td>⏑⏑⏑|⏑ ⏑ ⏑|––•–|⏑––|⏑––•</td></tr>
<tr><td>স রতিমুপসিষেবে বোধিমাপন যাবৎ।।</td></tr>
</table>

শিখরিণী :

লক্ষণ- রসৈরুদ্রৈশ্ছিন্না যমনসভলা গঃ শিখরিণী। ছ.ম.- ২/১৬৩

লক্ষণার্থ- যমনসভলগ গণক্রম থাকলে এবং প্রথমতঃ ষষ্ঠাক্ষরে ও পরে একাদশাক্ষরে যতি থাকলে শিখরিণী ছন্দ হয়।

যথা– ততঃ শ্রুত্বা রাজা বিষয়বিমুখং তস্য তু মনো

ন শিশ্যে তাং রাত্রিং হৃদয়গতশল্যে গজ ইব।

অথ শাস্ত্রে মন্ত্রে বহুবিধিমার্গে সসচিবো

ন সোহন্যৎকামেভ্যো নিয়মনমপশ্যৎ সুতমতেঃ।। বু.চ. ৪/১০৩

শিখরিণী	
প্রথমপাদ	⏑ - - | - - - •| ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ - | - ⏑ ⏑ | ⏑ | - •
	ততঃ শ্রুত্বা রাজা বিষয়বিমুখং তস্য তু মনো
দ্বিতীয়পাদ	⏑ - - | - - - •| ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ - | - ⏑ ⏑ | ⏑ | - •
	ন শিশ্যে তাং রাত্রিং হৃদয়গতশল্যে গজ ইব।
তৃতীয়পাদ	⏑ - - | - - - •| ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ - | - ⏑ ⏑ | ⏑ | - •
	অথ শাস্ত্রে মন্ত্রে বহুবিধিমার্গে সসচিবো
চতুর্থপাদ	⏑ - - | - - - •| ⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ - | - ⏑ ⏑ | ⏑ | - •
	ন সোহন্যৎকামেভ্যো নিয়মনমপশ্যৎ সুতমতেঃ।।

অপরবক্ত্রম্ :

লক্ষণ- অযুজি ননরলা গুরুঃ সমে তদপরবক্ত্রমিদং নজৌ জরৌ। ছ.ম.- ৩/৪

লক্ষণার্থ- বিষমপাদে ননরলগ ও সমপাদে নজজর থাকলে অপরবক্ত্রম্ ছন্দঃ হয়। এটি অর্ধসমবৃত্ত।

যথা– পরমমিতি ততো নৃপাত্মজ স্তমৃষিজনং প্রতিনন্দ্য নির্যযৌ।

বিধিবদনুবিধায় তেহপি তং প্রবিবিশুরাশ্রমিণস্তপোবনম্।। বু.চ. ৭/৫৮

অপরবক্ত্রম্	
প্রথমপাদ	⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ ⏑ | - ⏑ - | ⏑ | -
	পরমমিতি ততো নৃপাত্মজস্
দ্বিতীয়পাদ	⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - ⏑ -
	তমৃষিজনং প্রতিনন্দ্য নির্যযৌ।
তৃতীয়পাদ	⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ ⏑ | - ⏑ - | ⏑ | -
	বিধিবদনুবিধায় তেহপি তং
চতুর্থপাদ	⏑ ⏑ ⏑ | ⏑ - ⏑ | ⏑ - ⏑ | - ⏑ -
	প্রবিবিশুরাশ্রমিণস্তপোবনম্।।

ঔপছন্দসিক :

লক্ষণ- তত্রৈবান্তেঽধিকে গুরৌ স্যাদৌপচ্ছন্দসকং কবীন্দ্রহৃদ্যম্। ছ.ম.- ৬/১৪

লক্ষণার্থ- বৈতালীয় (বিষমপাদে ৬ টি মাত্রা এবং সমপাদে আটটি মাত্রা, ছয় ও আট মাত্রার অন্তে রলগ থাকলে বৈতালীয় ছন্দ হয়) ছন্দের অন্তে একটি গুরুবর্ণ অধিক থাকলে ঔপছন্দসক ছন্দ হয়। এটি মাত্রাবৃত্ত।

যথা– স তথা বিষয়ৈর্বিলোভ্যমানঃ পরমোর্হৈরপি শাক্যরাজসূনুঃ।

ন জগাম ধৃতিং ন শর্ম লেভে হৃদয়ে সিংহ ইবাতিদিগ্ধবিদ্ধঃ।। বু.চ. ৫/১

<table>
<tr><th colspan="2">ঔপছন্দসিক</th></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রথমপাদ</td><td>৬টি মাত্রা+ - ˘ - | ˘ | - | -</td></tr>
<tr><td>স তথা বিষয়ৈর্বিলোভ্যমানঃ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">দ্বিতীয়পাদ</td><td>৮টি মাত্রা+ - ˘ - | ˘ | - | -</td></tr>
<tr><td>পরমোর্হৈরপি শাক্যরাজসূনুঃ।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">তৃতীয়পাদ</td><td>৬টি মাত্রা+ - ˘ - | ˘ | - | -</td></tr>
<tr><td>ন জগাম ধৃতিং ন শর্ম লেভে</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চতুর্থপাদ</td><td>৮টি মাত্রা+ - ˘ - | ˘ | - | -</td></tr>
<tr><td>হৃদয়ে সিংহ ইবাতিদিগ্ধবিদ্ধঃ।।</td></tr>
</table>

পুষ্পিতাগ্রা :

লক্ষণ- অযুজি নযুগরেফতো যকারো যুজি চ নজৌ জরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা। ছ.ম.- ৩/৫

লক্ষণার্থ- বিষমপাদে ননরয এবং সমপাদে নজজরগ গণক্রম থাকলে পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ হয়। এটি অর্ধসমবৃত্ত।

যথা– অপি চ নিয়ত এষ তস্য ভাবঃ স্মর বচনং তদৃষেঃ পুরাসিতস্য।

ন হি স দিবি ন চক্রবর্তিরাজ্যে ক্ষণমপি বাসয়িতুং সুখেন শক্যঃ।। বু.চ. ৮/৮৪

<table>
<tr><th colspan="2">পুষ্পিতাগ্রা</th></tr>
<tr><td rowspan="2">প্রথমপাদ</td><td>˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ | - ˘ - | ˘ - -</td></tr>
<tr><td>অপি চ নিয়ত এষ তস্য ভাবঃ</td></tr>
<tr><td rowspan="2">দ্বিতীয়পাদ</td><td>˘ ˘ ˘ | ˘ - ˘ | ˘ - ˘ | - ˘ - | -</td></tr>
<tr><td>স্মর বচনং তদৃষেঃ পুরাসিতস্য ।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">তৃতীয়পাদ</td><td>˘ ˘ ˘ | ˘ ˘ ˘ | - ˘ - | ˘ - -</td></tr>
<tr><td>ন হি স দিবি ন চক্রবর্তিরাজ্যে</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চতুর্থপাদ</td><td>˘ ˘ ˘ | ˘ - ˘ | ˘ - ˘ | - ˘ - | -</td></tr>
<tr><td>ক্ষণমপি বাসয়িতুং সুখেন শক্যঃ ||</td></tr>
</table>

বুদ্ধচরিত কাব্যে অলংকারের ব্যবহার

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ২নং অনুচ্ছেদে 'অশ্বঘোষের রচনাশৈলী" অংশে বুদ্ধচরিত কাব্যের অলংকার সমীক্ষা করা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে প্রচুর অলংকার প্রয়োগ করেছেন। বিশেষত, উপমা, রূপক এবং অনুপ্রাস প্রভৃতি অলংকারে বুদ্ধচরিত কাব্য ঋদ্ধ (পূর্ববর্তী অধ্যায়ের বর্ণিত অলংকারের ব্যবহার উদাহরণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে)। শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য এবং ই. এইচ. জনস্টনও তাঁদের গবেষণাকর্মে বুদ্ধচরিত কাব্যে ব্যবহৃত অংলকারসমূহ স্পষ্ট নির্দেশ করেছেন।[১৯] অলংকারের ব্যবহার বুদ্ধচরিত কাব্যকে একদিকে যেমন সরলতা দান করেছে, অপরদিকে কাব্যের সৌষ্ঠবও বৃদ্ধি করেছে বহুগুণে। ফলে ছন্দ পতনের কারণে যে বিরক্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তা বুদ্ধচরিত কাব্যে তেমন একটা লক্ষ্য করা যায় না। এ প্রসঙ্গে শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্যের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে, "মহাকাব্যে শ্লোকের-পর-শ্লোক একই ছন্দে রচিত হয়ে যে ধারাবাহিক বারিপতন-ধ্বনির মতো ক্লান্তিকর সুরজাল বিস্তার করে, 'বুদ্ধচরিত' তা থেকে বহু অংশে মুক্ত।"[২০]

অতএব, বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে ছন্দোলংকার বিষয়ক বৈশিষ্ট্যও রক্ষিত হয়েছে।

৪.৮. রস বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

রস কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান। রসবাদিগণের মতে, "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।" অর্থাৎ রস হচ্ছে কাব্যের আত্মা। কারণ রস কাব্যার্থকে আস্বাদিত করায় পাঠককে আনন্দ দান করে। আলংকারিক বৈশিষ্ট্য মতে, মহাকাব্য হবে রস ও ভাবপূর্ণ। রস ও ভাবের দ্বারা মহাকাব্য নিরন্তর পরিপূর্ণ হবে। কারণ এ দু'টি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। ভাবহীন রস এবং রসহীন ভাব হয় না। কাব্যদর্শ [২১] মতে, রস সাধারণত নয় প্রকার: শৃঙ্গার, করুণ, হাস্য, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত। তবে শৃঙ্গার, বীর, শান্তাদির কোন একটি রস অঙ্গীরস হবে এবং অন্যান্য অঙ্গরস হবে। বুদ্ধচরিত কাব্যে নববিধ রসের মধ্যে শৃঙ্গার, বীর এবং শান্তরসের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়, তবে শান্তরস অঙ্গীরস হিসেবে প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্যান্য রসগুলো অঙ্গরস হিসেবে বুদ্ধচরিত কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে।

৪.৮.১. বীররস

বীররসের সংজ্ঞায় ভরতের নাট্যশাস্ত্রের রসবিকল্প নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ে বলা হয়েছে -

"উৎসাহাধ্যবসায়াদবিষাদিত্বাদবিস্ময়ান্মোহাৎ।

বিবিধাদর্থবিশেষাদ্বীররসো নাম সম্ভবতি।।" র. বি. ৬/১২

অর্থাৎ উৎসাহ, অধ্যবসায়, বিষাদহীনতা, বিস্ময় ও মোহহীনতা- এই বিবিধ ভাববিশেষ থেকে বীররস উদ্ভূত হয়।

বুদ্ধচরিত কাব্যখানি সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবনীর আলোকে রচিত, যিনি সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনা করে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। লোভ-দ্বেষ-মোহ সন্ন্যাস জীবনের পরিপন্থি। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, সিদ্ধার্থ গৌতম দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য রাজকীয় ভোগ-বিলাস, ঐশ্বর্য, পরিবার-পরিজন ত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর চিত্তে লোভ-দ্বেষ-মোহ এবং বিষাদের স্থান ছিল না বলে বিলাসী জীবন ছেড়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া, উৎসাহ অধ্যাবসায় ব্যতীত বুদ্ধত্ব লাভ সম্ভব ছিল না। ফলে বুদ্ধচরিত কাব্যে বীররসের যথেষ্ট সন্ধান লাভ করা যায়, বিশেষত, একাদশ এবং ত্রয়োদশ সর্গে। নিম্নে বীররসের সিক্ত কতিপয় শ্লোক তুলে ধরা হলো :

উৎসাহ ও অধ্যাবসায় : বুদ্ধত্ব লাভের সংকল্পে অটল সমাসীন শাক্যমুনি গভীর ধ্যানে মগ্ন। লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য মার কন্যা এবং মারসৈন্যরা তাঁকে নানা রকম প্রলোভন ও ভয় দেখাতে লাগল। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা নিকট মারের সকল প্রচেষ্টা একে একে ব্যর্থ হলো। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের অধ্যবসায়ের কথা নিম্নোক্তভাবে ব্যক্ত করেছেন :

অপ্যুষ্ণভাবং স্খলনঃ প্রজহ্যাদাপো দ্রবত্বং পৃথিবী স্থিরত্বম্।

অনেক কল্পাচিত পূণ্যকর্ম্মা ন ত্বেব জহ্যাদ্ ব্যবসায়মেষঃ।। বু. চ. ১৩/৫৮

যো নিশ্চয়ো হাস্য পরাক্রমশ্চ তেজশ্চ যদ্ যা চ দয়া প্রজাসু।

অপ্রাপ্য নোত্থাস্যতি তত্ত্বমেষ তমাংস্যহত্বেব সহস্ররশ্মিঃ।। বু.চ. ১৩/৫৯

অনুবাদ : অগ্নি তার উষ্ণতা ত্যাগ করতে পারে, জল তার তরলতা ত্যাগ করতে পারে , আর পৃথিবীও তার স্থিরতা ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু বহুকল্প সঞ্চিত পূণ্যের অধিকারী এই মুনি তাঁর সংকল্প ত্যাগ করবেন না। কারণ, তাঁর যে সংকল্প, যে পরাক্রম, যে তেজ, প্রাণীদের প্রতি যে দয়া, তাতে সত্য লাভ না করে তিনি উঠবেন না, যেমন অন্ধকার নাশ না করে সূর্য উঠে না।

বিষাদ-মোহহীনতা : রাজকুমার সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতেন। একদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য তিনি মগধরাজ্যে গমন করেন। তাঁর গাম্ভীর্য, প্রভাব, দেহ এবং দীপ্তি দেখে মগধের জনসাধারণ বিমোহিত হলেন এবং নতশিরে তাঁকে বন্দনা জ্ঞাপনসহ নানা উপোকরণে পূজা করেন। অতপর তিনি ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে পাণ্ডব পর্বতে ফিরে যান। মগধরাজ বিম্বিসার রাজপ্রাসাদ বর্হিভাগে বিপুল জনতার ভিড় দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করে সন্নাসীর গুণকথা জ্ঞাত হন এবং অমাত্যসহ সেই পর্বতে গমন করেন। রাজাও সন্ন্যাসীর রূপের শোভায় এবং শমগুণে বিমোহিত হয়ে তাঁকে মগধ রাজ্যের সেনাপতির পদ অলংকৃত করার এবং মগধ রাজ্যের অর্ধেক উপভোগ করার আহ্বান জানান। কিন্তু দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণের সংকল্পে অটল সিদ্ধার্থ তা বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন এবং মগধরাজ বিম্বিসারকে বলেন, বিষয়ের প্রতি তাঁর কোনো মোহ নেই। অশ্বঘোষ তাঁর মোহহীনতার কথা নিম্নরূপভাবে তুলে ধরেন :

নাশীবিষেভ্যো হি তথা বিভেমি নৈবাশনিভ্যো গগনাচ্চ্যুতেভ্যঃ।
ন পাবকেভ্যোহনিলসংহিতেভ্যো যথা ভয়ং মে বিষয়েভ্য এব।। বু. চ. ১১/৮

অনুবাদ : বিষয়কে আমি যেমন ভয় করি, বিষাক্ত সর্প, আকাশ থেকে বিচ্যুত বজ্র কিংবা বায়ুযুক্ত অগ্নিকেও তেমন ভয় করি না।

কামা হ্যনিত্যাঃ কুশলার্থচৌরা রিক্তাশ্চ মায়াসদৃশাশ্চ লোকে।
আশাস্যমানা অপি মোহয়ন্তি চিত্তং নৃণাং কিং পুনরাত্মসংস্থাঃ।। বু.চ. ১১/৯

অনুবাদ : ভোগ্য বিষয়গুলো জগতে অনিত্য; এরা মানুষের কল্যাণ ও অর্থ হরণ করে। এরা শূন্য এবং মায়াবৎ। কেবলমাত্র আশা করলেই এরা মানুষের চিত্ত মোহগ্রস্থ করে; ব্যক্তির জীবনে অবস্থিত হলে আর কথা কি?

৪.৮.২ শৃঙ্গার রস

আলংকারিক দণ্ডীর মতে, কান্তাবিষয়ক ব্যক্ত রতিকে শৃঙ্গার রস বলে। বুদ্ধচরিতের চতুর্থ, একাদশ এবং ত্রয়োদশ সর্গে শৃঙ্গার রসের সন্ধান লাভ করা যায়। অধ্যায়সমূহে যৌবনবতী নারীর দেহ-সৌষ্ঠব, কমনীয় আহ্বান এবং কলা-কৌশলের বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছে অশ্বঘোষের বর্ণনায়, যা প্রাণস্পর্শী, তীব্র ইঙ্গিতপূর্ণ এবং সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। চতুর্থ সর্গে শৃঙ্গার রসে পরিপুষ্ট উক্তিগুলোর প্রাণঘাতক প্রয়োগ লক্ষ্য করে তারাপদ ভট্টাচার্য[২২] অশ্বঘোষকে 'রতিপণ্ডিত' অভিধায় ভূষিত করেছেন। নিম্নে শৃঙ্গার রসে সিক্ত বুদ্ধচরিতের কতিপয় উক্তি তুলে ধরা হলো :

মদেনাবর্জিতা নাম তং কাশ্চিত্তত্র যোষিতঃ।
কঠিনৈঃ পস্পৃশুঃ পীনৈঃ সংহতৈর্বল্গুভিঃ স্তনৈঃ।। ৪/২৯

অনুবাদ : কোন-কোন নারী মদমত্ত হয়ে তাদের কঠিন ও পুরপুষ্ট সংহত ও উন্নত স্তন দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করল।

স্রস্তাংসকোমলালম্বমৃদুবাহুলতাবলা।
অনৃতং স্খলিতং কাচিৎ কৃত্বৈনং সস্বজে বলাৎ।। ৪/৩০

অনুবাদ : কোন-কোন নারীর শিথিল স্কন্ধ থেকে লম্বিত কোমল বাহুলতা। তারা মিথ্যে পদস্খলনের অভিনয় করে তাঁকে বলপূর্বক আলিঙ্গন করল।

কাচিৎ তাম্রাধরোষ্ঠেন মুখেনাসবগন্ধিনা।
বিনিশশ্বাস কর্ণেঽস্য রহস্যং শ্রূয়তামিতি।। ৪/৩১

অনুবাদ : কোন রমণীর রক্তাধর মদিরাগন্ধী, সে তাঁর কর্ণে নিঃশ্বাস ফেলে বলল - 'গোপন কথা শুনুন'।

মুহুর্মুহুর্মদব্যাজস্রস্তনীলাংশুকাপরা।

আলক্ষ্যরশনা রেজে স্ফুরদ্‌বিদ্যুদিব ক্ষপা।। ৪/৩৩

অনুবাদ : কোন নারী মত্ততার ছলে বারবার তার নীল শাড়ী শিথিল করে দিতে লাগল, তাতে ঈষৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ল কোমরের কাঞ্চিমালা। রমণীকে মনে হলো বিদ্যুত-বিকশিত রাত্রি।

কাশ্চিৎকনককাঞ্চীভির্মুখরাভিরিতস্ততঃ।

বভ্রমুর্দর্শয়ন্ত্যোঽস্য শ্রোণীস্তম্বংশুকাবৃতাঃ।। ৪/৩৪

অনুবাদ : কোন-কোন রমণী তাদের সুক্ষ্ম বসনে আবৃত নিতম্ব এঁকে দেখিয়ে ঝঙ্কৃত কণক-কাঞ্চী নিয়ে ইতস্তত ভ্রমণ করতে লাগল।

চূতশাখাং কুসুমিতাং প্রগৃহ্যান্যা ললম্বিরে।

সুবর্ণকলশপ্রখ্যান্দর্শয়ন্ত্যঃ পয়োধরান্।। ৪/৩৫

অনুবাদ : অন্য নারীরা তাদের স্বর্ণকলসের মতো স্তনসমূহ দেখাতে দেখাতে কুসুমিত আম্রশাখা অবলম্বন করে ঝুলতে লাগল।

বুদ্ধচরিত কাব্যে নায়ক সিদ্ধার্থকে আসক্ত করার জন্য রমণীদের নানা রকম কলা-কৌশল ও দেহ-সৌষ্ঠব প্রদর্শন শৃঙ্গাররস সৃষ্টি করলেও তা নায়কের অনুষ্ণভাবে দ্রুত শীতল হয়ে পড়ে। ফলে বুদ্ধচরিতে শৃঙ্গার রস পাঠককে শিহরিত করলেও তা ক্ষণকাল পরে গতি হারিয়ে ফেলে।

অশ্বঘোষ কবি হলেও মূলত ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। বৈরাগ্য ব্রত ছিল তাঁর জীবনচর্যা। তাঁর কাব্যের আলোচ্য বিষয়ও বৈরাগ্য জীবন। ফলে সেখানে পার্থিব লাভের হিসাব-নিকাশ নেই; অনিত্য রূপের মোহজালে আবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্খা নেই। তাই অন্যান্য মহাকাব্যে সম্ভোগ যেখানে শৃঙ্গাররসের মধুক্ষরণ করে, বুদ্ধচরিতে তা ততটা পারে নি।

৪.৮.৩. শান্তরস

গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবন-চরিতই বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল আলোচ্য বিষয়। সর্ব প্রাণীর দুঃখ-মুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য রাজ-প্রাসাদের ভোগ-বিলাসী জীবন, অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীর সান্নিধ্য এবং সদ্যজাত স্নেহময়ী সন্তানের আকর্ষণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেছিলেন। তাই বুদ্ধচরিত কাব্যের নায়কের নিকট জাগতিক কামনা-বাসনা, রতি-মিলন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতি ছিল অপ্রত্যাশিত। বরং শান্ত, সমাহিত, সংযত, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এবং ত্যাগের মহিমায় সুষমামণ্ডিত ছিল তাঁর জীবন। ফলে বুদ্ধচরিত কাব্যে শৃঙ্গাররস অপেক্ষা বীররস ও শান্তরস প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে করুণরস এবং হাস্যরসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। পঞ্চম সর্গে নায়কের গৃহত্যাগের কাহিনি করুণরসে সিক্ত। ত্রয়োদর্শ সর্গে বিভিন্ন মূর্তির অসামঞ্জস্য দেহভঙ্গি, নানা মুখাবয়বধারী নানা প্রাণির নানা রকম অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন কিছুটা হাস্যরসের স্বাক্ষর বহন করে। এ প্রসঙ্গে দিলীপ কুমার বড়ুয়ার অভিমত প্রণিধানযোগ্য,

"এ কাব্যে (বুদ্ধচরিত) আদি থেকে অন্ত অবধি অনিত্যতার যে সুরঝংকার তা করুণরসে সিক্ত। হাস্যরসেরও সন্ধান পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ সর্গে বিকট-বিকট মূর্তির অসমাঞ্জস্য দেহভঙ্গি এবং আস্ফালনের (শূকর, গদর্ভ, মৎস্য, কারও একটি চোখ, কারও অনেক মুখ---) মাধ্যমে হাস্যরসের যে প্রচেষ্টা তা কিছুটা হাস্যরসের উদ্রেক করলেও ব্যক্তির অনুভূতির উপরই নির্ভর করে।" [২৩]

৪.৯. ভাষা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

আলংকারিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে মহাকাব্যের ভাষা হবে ওজস্বী ও গাম্ভীর্য-ব্যঞ্জক। বুদ্ধচরিত ধার্মিক ব্যক্তির জীবন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে রচিত। অশ্বঘোষ তাত্ত্বিক হলেও মূলত কবি, যিনি বস্তুর রূপময় বিশ্লেষণে পারদর্শী। তিনি ভাষাপ্রিয় কবি। স্বল্প কথায় বহুর আয়োজন এবং ভাষার মাধ্যমে ভাবের মূর্ত প্রকাশ ঘটাতে অশ্বঘোষ অদ্বিতীয়। বুদ্ধচরিত বৈদর্ভ রীতিতে রচিত। শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি এবং সমাধি - আলংকারিক নির্দেশিত এই দশবিধ গুণ

বুদ্ধচরিত কাব্যে রক্ষিত আছে। রচনার শৈথিল্যভাবই হচ্ছে শ্লেষ। মহাপ্রাণ ও সংযুক্ত অক্ষরের ব্যবহার অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যকে শৈথিল্যযুক্ত করেছে। প্রসিদ্ধার্থ শব্দে সহজবোধ্য বাক্যই প্রসাদগুণের পরিচায়ক। আন্তরিকতা এবং প্রসাদগুণ সমৃদ্ধ বাক্য অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যকে সারল্য দিয়েছে। বাক্যে বর্ণবিন্যাসের সমতা বুদ্ধচরিত কাব্যের সৌকর্য বৃদ্ধি করেছে। কখনো বর্ণের বা কখনো অর্থের উৎকর্ষ সাধনই হচ্ছে মাধুর্য গুণ। এ গুণটি অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের পরিপুষ্টি সাধন করেছে। উগ্রাক্ষর মিশ্রিত কোমল বর্ণবিন্যাসই সুকুমারতা। বুদ্ধচরিতের শ্লোকে এ গুণটিও যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধচরিতের বাক্যগুলি দুবোর্ধ্যতার ভারে জর্জরিত নয় এবং কষ্টকল্পনার মাধ্যমে বাক্যের অর্থোদ্ধার করতে হয় না, শ্লোকে ব্যবহৃত ঘটক পদগুলি থেকে অর্থের প্রতীতি জন্মে, যা বুদ্ধচরিতে অর্থব্যক্তি গুণটি প্রকাশ করে। অশ্বঘোষের অপরূপ বর্ণনাভঙ্গি ও চমৎকার ব্যঞ্জনায় বর্ণিত বস্তুর শৌর্যবীর্যাদির উৎকর্ষ প্রকাশ করেছে, যা বুদ্ধচরিতে কাব্যের উদারত্ব ঘোষণা করে। সমাসবাহুল্য অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধচরিত কাব্যের ব্যবহৃতবাক্যে সমাসবাহুল্য লক্ষ করা যায়, যা বুদ্ধচরিত কাব্যের ওজঃ গুণ। অশ্বঘোষের বর্ণনা নিপুণতায় বুদ্ধচরিত কাব্যের প্রতিটি আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে, যা বুদ্ধচরিত কাব্যের অন্যতম কান্তি গুণ। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর গুণ ও ক্রিয়া আরোপে অশ্বঘোষ অদ্বিতীয়। বুদ্ধচরিত কাব্যে ছত্রে ছত্রে এ গুণটি লক্ষ্য করা যায়, যা বুদ্ধচরিতে কাব্যের সমাধি গুণের স্বাক্ষর বহণ করে। আলোচ্য দশবিধ গুণ বুদ্ধচরিত কাব্যের ভাষাকে ওজস্বী ও গাম্ভীর্য ব্যঞ্জক করে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে,

"শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা, অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, ওজঃ, কান্তি এবং সমাধি এই দশটি কাব্যের গুণ। বৈদর্ভমতে এ গুণগুলি কাব্যের প্রাণস্বরূপ। কাব্যে এই সকল গুণের অস্তিত্ব না থাকলে বৈদর্ভবাসীগণ তাহাকে কাব্য বলিয়াই স্বীকার করেন না, অশ্বঘোষের রচনায় এই দশবিধ গুণের সমাবেশ দেখা যায়। বিশেষতঃ, প্রাসাদ এবং মাধুর্য তাঁহার কাব্যকে সত্যই মাধুর্যমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।"[২৪]

অতএব, উপরে বর্ণিত বিষয় পর্যালোচনা করে বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে ভাষা বিষয়ক বৈশিষ্ট্যও রক্ষিত হয়েছে।

৪.১০. নানা বৃত্তান্ত বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

মহাকাব্যে লোকরঞ্জনকারী বিভিন্ন প্রকার বৃত্তান্ত থাকে। বুদ্ধচরিত কাব্যেও সিদ্ধার্থ গৌতম তথা গৌতম বুদ্ধের জীবন চরিত বর্ণনায় নানা প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। বুদ্ধচরিত কাব্যে দুষ্ট ব্যক্তির নিন্দা যেমন রয়েছে, তেমনি সৎব্যক্তির গুণকীর্তনও রয়েছে এবং প্রসঙ্গক্রমে সন্ধ্যা, চাঁদ, সূর্য, রাত, প্রদোষ, অন্ধকার, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ব, মুনি, স্বর্গ, যুদ্ধ, মৃত্যু, মন্ত্র, জন্মাদি প্রভৃতির বর্ণনাও লক্ষ্য করা যায়। এ কাব্যের পটভূমি বিশাল। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটিয়ে কবি কাব্যের বিষয়বস্তুকে বিস্তার করেছেন নানা পরিবেশে। নায়কের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনায় কবি বিস্তার আয়োজন ঘটিয়েছেন। তিনি তাঁকে দেখিয়েছেন পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন, রাজপরিষদ, ঋষি-মহাঋষি, সাধারণ মানুষ প্রভৃতির সান্নিধ্যে; সুত-মিত, রূপ যৌবন সম্পন্ন ললনা বেষ্ঠিত; পরিব্রাজক বেশে; পুষ্পিত কাননে, রাজ প্রাসাদে, বনে গুহায়, নদী তীরে, মার ও মার কন্যাদের বাণতলে, ধ্যানাসনে, সর্ব প্রাণীর হিতকামী হিসেবে, দুঃখমুক্তির পথ প্রদর্শক হিসেবে। এসব নানা বৃত্তান্তের বর্ণনা বুদ্ধচরিত কাব্যেকে ব্যাপকতা ও বৈচিত্রতা দান করেছে। একাদশ সর্গে লোভ, দ্বেষ, মোহ, তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা যুক্ত ব্যক্তির নিন্দা এবং সজ্জন বন্দনার অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন :

অসৎসু মৈত্রী স্বকুলানুবৃত্তা ন তিষ্ঠতি শ্রীরিব বিক্লবেষু।
পূর্বৈঃ কৃতাং প্রীতিপরংপরাভিস্তামেব সন্তস্তু বিবর্ধয়ন্তি।। বু. চ. ১১/৩

অনুবাদ : ভীরু ব্যক্তিতে যেমন লক্ষ্মী বাস করেন না কুলপরম্পরাগত মৈত্রী ও অসৎ ব্যক্তিতে অবস্থান করেন না। সজ্জনগণ প্রীতিপরম্পরা দ্বারা পূর্ব পুরুষের স্থাপিত সেই মৈত্রীকে বৃদ্ধি করেন।

জ্ঞেয়া বিপৎকামিনি কামসংপৎসিদ্ধেষু কামেষু মদং হ্যুপৈতি।
মদাদকার্যং কুরুতে ন কার্যং যেন ক্ষতো দুর্গতিমভ্যুপৈতি।। বু. চ. ১১/২১

অনুবাদ : বিষয়-সম্পদকে বিষয়ী ব্যক্তির বিপদ বলেই জানা প্রয়োজন। কামনা সিদ্ধ হলে মত্ততা আসে; মত্ততা বশত মানুষ কাজ না করে অকাজ করে এবং তাতে নষ্ট হয়ে দুর্গতি লাভ করে।

যত্নেন লব্ধাঃ পরিরক্ষিতাশ্চ যে বিপ্রলভ্য প্রতিযান্তি ভূয়ঃ।

তেষ্বাত্মবান্ যাচিতকোপমেষু কামেষু বিদ্বানিহ কো রমেত।। বু. চ. ১১/২২

অনুবাদ : যত্নের দ্বারা লব্ধ এবং রক্ষিত হয়ে যারা ছলনা করে পুনরায় অদৃশ্য হয় সেই বিষয়গুলি তো ঋণতুল্য (অর্থাৎ ঋণলব্ধ বস্তুর মতো অস্থায়ী); তাতে কোন্ সংযমী বিদ্বান আনন্দ লাভ করবে?

প্রথম সর্গে চন্দ্র, সূর্য, রাত্রি, নক্ষত্র (১২ ও ১৩ সংখ্যক শ্লোকে); চতুর্দশ সর্গে রাত্রি; দ্বিতীয় সর্গে সম্ভোগ ও সন্তান জন্ম; তৃতীয় সর্গে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু; চতুর্দশ সর্গে জপ-মন্ত্র, সর্গ সুখ, নরক যন্ত্রণা এবং পঞ্চম সর্গে পাহাড় পর্বত প্রভৃতির অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ সর্গে যুদ্ধের বর্ণনাও পাওয়া যায়। তবে সেই যুদ্ধ অশুভ প্রবৃত্তি নিবৃত্তির যুদ্ধ। লক্ষ্য অর্জনে কু-মনোবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও বাধাকে জয় করার যুদ্ধ। সেখানে অস্ত্র ও নরহত্যার দৃষ্টান্ত নেই। সমীক্ষায় দেখা যায়, নায়ক সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের প্রত্যাশায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। বুদ্ধত্ব লাভ আসন্ন জেনে সদ্ধর্মের শত্রু কু-প্রবৃত্তির অনুচর মার ও মার কন্যাগণ তাঁকে ধ্যানচ্যুত করার মানসে ভুত-প্রেত এবং নানা রকম ভীতিকর প্রাণীর অবয়ব ধারণ করে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, অপূর্ব দেহ-সৌষ্ঠব প্রদর্শন পূর্বক কাম-লালসায় বশবর্তী করার তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু নায়কের দৃঢ়তার নিকট মারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ত্রয়োদশ সর্গে যুদ্ধের কতিপয় চিত্র তুলে ধরা হলো :

সস্মার মারশ্চ ততঃ স্বসৈন্যং বিঘ্নং শমে শাক্যমুনেশ্চিকীর্ষন্।

নানাশ্রয়াশ্চানুচরাঃ পরীয়ুঃ শৈলদ্রুমপ্রাসগদাসিহস্তা।। বু. চ. ১৩/১৮

অনুবাদ : তারপর মার শাক্যমুণির শান্তিতে বাধা সৃষ্টি করবার ইচ্ছায় নিজের সৈন্যগণকে স্মরণ করলেন। তখন পাহাড়, বৃক্ষ, বর্শা, গদা ও তরবারি হাতে নিয়ে নানা আকারের অনুচরদল তার চারদিকে এসে দাঁড়াল।

কশ্চিত্ততো রোষবিবৃত্তদৃষ্টিস্তস্মৈ গদামুদ্যময়াংচকার।

তস্তম্ভ বাহুঃ সগদস্ততোহস্য পুরন্দরস্যেব পুরা সবজ্রঃ।। বু. চ. ১৩/৩৭

অনুবাদ : তারপর একজন ক্রোধে চোখ ঘুরিয়ে গদা নিয়ে এগিয়ে এল তাঁর দিকে; তখন তার গদাশুদ্ধ হাত অতীতে ইন্দ্রের বজ্রধারী হাতের মতোই নিশ্চল হয়ে রইল।

কেচিৎ সমুদ্যম্য শিলাস্তরুংশ্চ বিষেহিরে নৈব মুনৌ বিমোক্তুম্।

পেতুঃ সবৃক্ষাঃ সশিলাস্তথৈব বজ্রবভগ্না ইব বিন্ধ্যপ্যদাঃ।। বু. চ. ১৩/৩৮

অনুবাদ : কেউ কেউ বহু প্রস্তর, বৃক্ষ তুলেও মুনির প্রতি নিক্ষেপ করতে পারল না, বজ্রভগ্ন বিন্ধ্যাচলের মতোই তারা বৃক্ষ ও প্রস্তর নিয়ে মাটিতে পড়ে গের।

কৈশ্চিৎ সমুৎপত্য নভো বিমুক্তাঃ শিলাশ্চ বৃক্ষাশ্চ পরশ্বধাশ্চ।

তস্থুর্নভস্যেব ন চাবপেতুঃ সন্ধ্যাভ্রপাদা ইব নৈকবর্ণাঃ।। বু. চ. ১৩/৩৯

অনুবাদ : কেউ কেউ আকাশে উঠে প্রস্তর, বৃক্ষ আর কুঠার নিক্ষেপ করল; কিন্তু সেগুলো নিচে পড়ল না, সন্ধ্যার নানা রং-এর মেঘখণ্ডের মতো আকাশেই রয়ে গেল।

অথাপরে নির্জিগিলুমুর্খেভ্যঃ সর্পন্বিজীর্ণেভ্য ইব দ্রুমেভ্যঃ।

তে মন্ত্রবদ্ধা ইব তৎসমীপে ন শশ্বসুর্নোৎসসৃপুর্ন চেলুঃ।। বু. চ. ১৩/৪৪

অনুবাদ : অন্য ভুতেরা জীর্ণ বৃক্ষরাজির মতো মুখ থেকে সর্প উদ্গীরণ করল। সেই সর্প মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কাছে এল, তারা নিঃশ্বাস নিল না, মাথা তুলল না, নড়লও না।

অতএব, উপরের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে প্রসঙ্গক্রমে নানা বৃত্তান্ত বর্ণনার শর্তও রক্ষিত হয়েছে।

৪.১১. বিরহ-মিলন বিষয়ক বৈশিষ্ট্য

বিরহ-মিলন মহাকাব্যের চুম্বক অংশ। নায়িকার সাথে নায়কের প্রেম, ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদের ফলে বিরহের সৃষ্টি এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে নায়িকার সাথে নায়কের মিলন মহাকাব্যের আকর্ষণীয় প্রেক্ষাপট। বুদ্ধচরিত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর জীবন নিয়ে রচিত। তাই এ কাব্যে নায়কের সাথে নায়িকার বিরহ-মিলন পর্ব না থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে পঞ্চম সর্গে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কাহিনি কিছুটা বিরহ সৃষ্টি করলেও তাতে নায়ক-নায়িকার সংযোগ না থাকায় তেমন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করতে পারে নি। ফলে বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে আলোচ্য শর্তটি পূরণ হয়নি।

৪.১২. নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠা বিষয়ক শর্ত

সাধারণত মহাকাব্যে ট্র্যাজেডির স্থান নেই। নায়কের জয় বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মূলত মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটে। বুদ্ধচরিত কাব্যখানি ধর্ম ও ধার্মিকের জীবন-চরিত নিয়ে রচিত। ফলে, সেখানে নায়ক-নায়িকার মিলন-বিরহ নেই, সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে জয় করে নায়িকার সাথে মিলনে নায়কের আকাঙ্খা নেই। আছে সর্ব প্রাণীর দুঃখ মুক্তির পথ সন্ধানের অভীপ্সা, দুঃখমুক্ত নির্বাণ লাভের প্রত্যাশা এবং দুঃখ সত্য ও দুঃখনিরোধ এবং কার্য-কারণ তত্ত্বের পরম জ্ঞান 'বোধি' লাভের সংকল্প। ফলে ধারণা করা যায় যে, অন্যান্য মহাকাব্য হতে বুদ্ধচরিত একটু ভিন্ন আঙ্গিকের। তাই এ কাব্যে নায়কের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিকে নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমীক্ষায় দেখা যায়, নায়ক সিদ্ধার্থ দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য ২৯ বছর বয়সে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, রাজকীয় ঐশ্বর্য, রাজ্য প্রভৃতির মায়া ত্যাগপূর্বক বুদ্ধত্ব লাভের আশায় গৃহত্যাগ করেছিলেন। অতপর, তিনি সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় 'বোধি' জ্ঞান লাভ করে জগতে 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন। তিনি আবিষ্কার করেন দুঃখমুক্তির পথ 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ', কর্ম ও দুঃখ জাগানিয়া জীবন-প্রবাহের কারণ 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' তত্ত্ব। এভাবে বুদ্ধচরিতের নায়ক জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ফলে বলা যায়, বুদ্ধচরিত কাব্যে নায়ক জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠা বিষয়ক বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন আঙ্গিকে রক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. উপসংহার

সংস্কৃত ভাষায় রচিত বুদ্ধচরিত কাব্যের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়নি। কেবল মাত্র ১৭টি সর্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। তিব্বতি ও চৈনিক ভাষায় বুদ্ধচরিতের যে অনুবাদ কর্ম পাওয়া যায় তাতে ২৮টি সর্গ রয়েছে এবং বুদ্ধের জন্ম হতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত জীবন-চরিত বর্ণিত আছে। এছাড়া, সম্রাট অশোকের সময়কাল পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলিও উল্লেখ রয়েছে। এ কারণে মূল বুদ্ধচরিত কাব্যখানিও ২৮টি সর্গে বিভক্ত ছিল বলে ধারণা করা যায়। বর্তমানে সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির যে ১৭টি সর্গ পাওয়া গিয়েছে, তন্মধ্যে শেষের চারটি অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৭ তম সর্গ অশ্বঘোষের রচনা নয়, তা নেপালী কবি অমৃতানন্দ তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদের ভিত্তিতে রচনা করেছেন। কারণ এ বিষয়ে পাণ্ডুলিপিতে নেপালী কবি অমৃতানন্দের স্বহস্তে লিখিত স্বীকারোক্তি রয়েছে। রচনাশৈলীর বিচারে পণ্ডিতগণও শেষের চারটি সর্গ অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে স্বীকার করেননি। ১৭টি সর্গের মধ্যে ১৩টি সর্গ অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে ধরে নিলেও গ্রন্থটি মহাকাব্য পদবাচ্য। কারণ, গ্রন্থটি সর্গ বিষয়ক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। বুদ্ধচরিত কাব্যখানি অন্যান্য মহাকাব্য হতে ভিন্ন। ধর্ম ও সংসার ত্যাগী ধার্মিকের জীবনী তথা গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। আনন্দদান অশ্বঘোষের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নয়, দুঃখমুক্তির পথ বিশ্লেষণই ছিল তাঁর কাব্য রচনার প্রধান লক্ষ্য। ফলে অন্যান্য ভারতীয় মহাকাব্য তথা রামায়ণ, মহাভারত, কিরাতার্জুনীয়ম্ প্রভৃতি গ্রন্থের মতো আলংকারিকের সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। গৌতমবুদ্ধের জীবন-চরিত প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় শৃঙ্গাররস, বিরহ-মিলন এবং নায়কের জয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। তবে, কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও বুদ্ধচরিতের সকল ক্ষেত্রে সংস্কৃত আলংকারিক নির্দেশিত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অশ্বঘোষ সুনিপুণ রচনাশৈলী দ্বারা কাব্যখানিকে উচু মানের মহাকাব্যের মর্যাদা দান করেছে। ফলে অশ্বঘোষকে কালজয়ী এবং ঋদ্ধ মহাকবি হিসেবে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না। তাছাড়া, বুদ্ধচরিত গ্রন্থের প্রতিটি সর্গের শেষে গ্রন্থটিকে যে মহাকাব্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে সংস্কৃত আলংকারিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে তা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. (নির্বাহী সম্পাদক) প্রসূন বসু, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ৯ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ১৮৭।

২. (নির্বাহী সম্পাদক) প্রসূন বসু, সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, ১ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১১৬।

৩. বিভিন্ন সংস্কৃত আলংকারিক নির্দেশিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য :

ক) অগ্নিপূরাণে (৩৩৭/২৪-২৫) বর্ণিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য :

সর্গবন্ধো মহাকাব্যমারব্ধং সংস্কৃতেন যৎ।।

তাদাত্ম্যমজহৎ তত্র তৎসমং নাতিদুষ্যতি।

ইতিহাসকথোদ্ভূতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম্।।

মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনিয়তং নাতিবিস্তরম্।

শক্কর্য্যাতিজগত্যাতিশক্কয্যা ত্রিষ্ঠুভা তথা।।

পুষ্পিতাগ্রাদিভির্বক্ত্রাভির্জনৈশ্চারুভিঃ সমৈঃ।

মুক্তা তু ভিন্নবৃত্তান্তা নাতিসংক্ষিপ্তসর্গকম্।।

অতিশক্করিকাষ্টিভ্যামেকসংকীর্ণ কৈঃ পরঃ।

মাত্রয়াপাপরঃ সর্গঃ প্রাশস্ত্যেষু চ পশ্চিমঃ।।

কল্প্যোহতিনিন্দিতস্তস্মিন্ বিশেষানাদরঃ সত্যম্।

নগরার্ণবশৈলর্ত্তুচন্দ্রার্কাশ্রমপাদপৈঃ।।

উদ্যানসলিলক্রীড়ামধুপানরতোৎসবৈঃ।

দূতীবচনবিন্যাসৈরসতীচরিতাদ্ভূতৈঃ।।

তমসামরুতাপ্যন্যৈ বিভাবৈরতিনির্ভরৈঃ।

Dhaka University Institutional Repository

সর্ববৃত্তিপ্রবৃত্তঞ্চ সর্বভাবপ্রভাবিতম্॥

সর্বরীতিরসৈর্জুষ্টং পুষ্টং গুণবিভূষণৈঃ।

অত এব মহাকাব্যং তৎকর্ত্তা চ মহা কবিঃ।।

বাগ্বদন্ধ্যপ্রধানেহপি রস এবাত্র জীবিতম্।

পৃথক্প্রযত্ননির্বর্ত্ত্যং বাগ্বক্রিন্নিরসাদ্বপুঃ।।

চতুর্বর্গফলং বিস্বগ্ ব্যাখ্যাতং নায়কখ্যায়া।

সমানবৃত্তিনির্ব্যূঢ়ঃ কৌশিকীবৃত্তিকোমলঃ।।

কলাপোঽত্র প্রবাসঃ প্রাগনুরাগাহ্বয়ো রসঃ

সবিষেষকং প্রাপ্ত্যাদি সংস্কৃতেনেতরেণ চ।।

খ) ভামহ এর কাব্যালংকার (১/১৯-২২) গ্রন্থে বর্ণিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য :

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং মহতাঞ্চ মহচ্চ তৎ।

অগ্রাম্যশব্দমর্থ্যঞ্চ সালংকারং সদাশ্রয়ম্॥

মন্ত্রদূতপ্রয়াণাজিনায়কাভ্যুদয়ৈশ্চ যৎ।।

পঞ্চভিঃ সন্ধিভির্যুক্তং নাতিব্যাখ্যেয়মৃদ্ধিমৎ।।

চতুবর্গাভিধানেহপি ভূয়সার্থোপদেশকৃৎ।

যুক্তং লোক স্বভাবেন রসৈশ্চ সকলৈঃ পৃথক্।।

নায়কং প্রাগুপন্যস্য বংশীবীর্য্যশ্রুতাদিভিঃ।

ন তস্যৈব বধং ব্রয়াদান্যোৎকর্ষাভিধিৎসয়া।।

গ) দণ্ডীর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে বর্ণিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য :

সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্।

আশীর্নমক্রিয়াবস্তুনির্দেশো বাঽপি তন্মুখম্।

ইতিহাসকথোদ্ভুতমিতরদ্বা সদাশ্রয়ম্ ।

চতুর্বর্গফলায়ত্তং চতুরোদাত্তনায়কম্ ।

নগরার্ণব শৈলর্তুচন্দ্রার্কোদয়বর্ণনৈঃ ।

উদ্যানসলিলক্রীড়া মধুপানরতোসবৈঃ ।।

বিপ্রলম্ভৈর্বিবাহৈশ্চ কুমারোদয়বর্ণনৈঃ ।

মন্ত্রদূতপ্রয়াণজিনোয়কাভ্যুদয়ৈরপি ।।

অলঙ্কৃতমসংক্ষিপ্তং রসভাবনিরন্তরম্

সগৈরণাতিবিস্তীর্ণৈঃ ত্রব্যবৃত্তৈঃ সুসন্ধিভিঃ ।

সর্বত্র ভিন্নবৃত্তান্তৈরূপেতঃ লোকরঞ্জনম্

কাব্যং কল্পান্তরস্থায়ি জায়েত সদলংকৃতি ।

ঘ) নিম্নে বিশ্বনাথ কবিরাজ নির্দেশিত মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

সর্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রৈকো নায়কঃ সুরঃ ।

সদ্বংশঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি ধীরোদাত্তগুণান্বিতাঃ ।।

একবংশভবা ভূপাঃ কুলজা বহবেঽপি ।

শৃঙ্গারবীরশান্তানামেকেঽঙ্গী রস ইষ্যতে ।।

অঙ্গানি সর্বেঽস্য রসাঃ সর্বে নাটকসন্ধয়ঃ ।

ইতিহাসোদ্ভবং বৃহত্তমন্যদ্বা সজ্জনাশ্রয়ম ।।

চত্বারস্তস্য বর্গাঃ স্যু স্তদ্বেকং চ ফলং ভবেৎ ।

আদৌ নমস্ক্রিয়াশী র্বা বস্তুনির্দ্দেশ এব বা ।।

ক্বচিন্নন্দা খলাদীনাং সতাং চ গুণকীর্ত্তণম ।

একবৃত্তময়ৈঃ পদ্যৈর্বসান্তেঽন্যবৃত্তকৈঃ ।।

Dhaka University Institutional Repository

নাতিস্বল্পা নাতিদীর্ঘাঃ সর্গা অষ্টাধিকা ইহ।

নানাবৃত্তময়ঃ ক্বাপি সর্গঃ কশ্চন দৃশ্যতে।।

সর্গান্তে ভাবিসর্গস্য কথায়াঃ সূচনং ভবেঃ।

সন্ধ্যাসূর্য্যেন্দুরজনীপ্রদোষধ্বান্তবাসরাঃ।।

প্রাতর্মধ্যাহ্নমৃগয়াশৈলর্ত্তুবনসাগরাঃ।

সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মুনিস্বর্গপুরাধ্বরাঃ।।

রণপ্রয়াণোপযমমন্ত্রপুত্রোদয়াদয়ঃ।

বর্ণনীয়া যথাযোগ্য সাঙ্গোপাঙ্গা অমী ইহ।।

কবের্বৃত্তস্য বা নাম্না নায়কস্যেতরস্য বা।

নামাস্য সর্গোপাদেয়কথয়া সর্গনাম তু।। (৬:৩১৫-৩২৫)

(অর্থাৎ, মহাকাব্য হবে সর্গবন্ধ; সেখানে নায়ক হবে একজন সুর, সৎবংশজাত বা ক্ষত্রিয়, ধীরোদাত্ত গুণান্বিত, এক বংশে জাত রাজা বা ঐ বংশের বা অন্য বংশের বহুব্যক্তি নায়ক হতে পারে; শৃঙ্গার, বীর, শান্তাদির কোন একটি রস অঙ্গীরস হবে; কথা হবে ঐতিহাসিক বা কোন সজ্জনকে আশ্রয় করে; চারটি বর্গ থাকবে, কোন একটির ফল দেখা যাবে; প্রথমে নমস্কার, আশীর্বাদ বা বস্তুনির্দেশ থাকবে; কোথাও দুষ্টব্যক্তির নিন্দা থাকবে, কোথাও বা সৎব্যক্তির গুণকীর্তন থাকবে; সম্পূর্ণ সর্গ এক প্রকার ছন্দোবদ্ধ থাকবে কিন্তু প্রতি সর্গের শেষে অন্য ছন্দ ব্যবহৃত হবে, সর্গসমূহ বেশি বড় হবে না, বেশি ছোটও হবে না, মহাকাব্যের সর্গ হতে হবে আটটির অধিক, কোথাও বা সর্গে বহু ছন্দের ব্যবহার দেখা যায়, সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের কথার সূচনা থাকবে; সন্ধ্যা, চাঁদ, সূর্য, রাত, প্রদোষ, অন্ধকার, সম্ভোগ, বিপ্রলম্ব, মুনি, স্বর্গ, যুদ্ধ, মৃত্যু, মন্ত্র, জন্মাদি যথাসাধ্য বর্ণিত থাকবে; কবির বা বৃত্তের নামে বা নায়কের নামে মহাকাব্যের নামকরণ হবে, সর্গস্থ কথার নামে সর্গের নাম হবে)।

৪. E. B. Cowel (ed.), *The Buddha-Carita or Life of Buddha by Asvaghosa*, Oriental Press, Amsterdam, 1970, p. ix.

৫. মনীন্দ্রনাধ চক্রবর্তী (অনু.), *বুদ্ধচরিত*, ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৮০, পৃ. ভূমিকা।

৬. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; মুনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (অনু.), বুদ্ধচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

৭. E. H. Jonston, *Asvaghosa's Buddhacarita or Acts of the Buddha*, Motilal Baranasidass, Delhi 1995 (rep.), p. viii.

৮. *Asvaghosa's Buddhacarita or Acts of the Buddha*, op. cit., p. ix.

৯. *The Buddha-Carita or Life of Buddha by Asvaghosa*, op. cit., p. ixf.

১০. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১১. A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Motilal Baranasidass, Delhi 1965, p. viii; G. K. Nariman, *Literary History of Sanskrit Buddhism*, Indological Book House,varanasi 1973, p. 31.

১২. *History of Indian Literature*, op.cit., p. 259f.

১৩. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *সংস্কৃত আলঙ্কারিকের বিচারে মহাকাব্য হিসেবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল্যায়ন*, *কলা অনুষদ পত্রিকা*, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬, পৃ. ৮৩।

১৪. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫-১১৬।

১৫. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

১৬. অধ্যাপক যুধিষ্ঠির গোপ, *দণ্ডিকৃতঃ কাব্যাদর্শ (প্রথম পরিচ্ছেদঃ)*, সদেশ, কোলকাতা, ২০০৪, পৃ. ১২।

১৭. 'সৌন্দরনন্দম্' *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. *Asvaghosa's Buddhacarita or Acts of the Buddha*, op. cit., pp. lxii-lxv.

১৯. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; *Asvaghosa's Buddhacarita or Acts of the Buddha*, op. cit., p. lxiii.

২০. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.২৯।

২১. চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, *কাব্যাদর্শ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৬২।

২২. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

২৩. '*সংস্কৃত আলঙ্কারিকের বিচারে মহাকাব্য হিসেবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল্যায়ন*,' *কলা অনুষদ পত্রিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪।

২৪. 'বুদ্ধচরিতম্', *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা।

উপসংহার

'বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি অশ্বঘোষের অবদান মূল্যায়ন' আমার অভিসন্দর্ভের প্রস্তাবিত প্রধান আলোচ্য বিষয়। মূল আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে প্রকটিত করার চেষ্টা করেছি। প্রথম অধ্যায়ে অশ্বঘোষের জীবন-চরিত সমীক্ষা করেছি। কারণ তিনি কোন্ পরিবার ও পরিবেশ হতে এসে কীভাবে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তা স্পষ্ট করার জন্য তাঁর জীবন-চরিত পর্যালোচনা করা দরকার। তাই প্রথম অধ্যায়ে অশ্বঘোষের সময়কাল, জন্ম ও বংশ পরিচয়, নামকরণ, বাল্য ও যৌবনকাল, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা, নিকায়, দীক্ষা-উত্তর জীবন, পাণ্ডিত্য ও অর্জিত অভিধা প্রভৃতি সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রাচীন ভারতীয় অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকের মতো অশ্বঘোষের জীবন-চরিতও অস্পষ্ট এবং জীবনী সংক্রান্ত অধিকাংশ তথ্যই অতিরঞ্জিত এবং জনশ্রুতি নির্ভর। ফলে অশ্বঘোষের জীবন-চরিতের বিভিন্ন দিক, বিশেষত, সময়কাল, বংশ-পরিচয়, বাল্য ও যৌবনকাল, দীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে তাঁর সময়কাল সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে চৈনিক, তিব্বতি এবং ভারতীয় সকল ঐতিহ্যই সাক্ষ্য দেয় যে, অশ্বঘোষ ও সম্রাট কণিষ্ক সমসাময়িক ছিলেন। বৌদ্ধ সাহিত্যের তথ্যও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য সমর্থন করে। গবেষকগণ তথ্যটি সত্যস্পর্শী বলে গণ্য করে থাকেন। ফলে সম্রাট কণিষ্কের সময়কালের ভিত্তিতে অশ্বঘোষের সময়কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি এবং ঐতিহ্য ও গবেষকদের তথ্য সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, মহাকবি অশ্বঘোষ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক হতে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। অশ্বঘোষ রচিত সৌন্দরনন্দ কাব্যের 'কবি কথা' (Colophon) অংশে অশ্বঘোষের জন্মস্থান 'সাকেত' এবং মাতার নাম 'সুবর্ণাক্ষী' বলে উল্লেখ আছে। চৈনিক ও তিব্বতি ঐতিহ্যেও অশ্বঘোষের জন্মস্থান এবং মাতার নাম সম্পর্কে একই রকম তথ্য পাওয়া যায়। সৌন্দরনন্দ কাব্যের 'কবি-কথা' অংশটি গ্রন্থ রচনাকালে রচিত হওয়ায় এবং অন্যান্য

ঐতিহ্যেও সৌন্দরনন্দ কাব্যের কবি-কথা অংশে বর্ণিত তথ্যের সমর্থন পাওয়া যাওয়ায় তথ্যটি সত্যস্পর্শী বলে গণ্য করা যায়। তাছাড়া, এ বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে কোনো বিতর্ক লক্ষ্য করা যায় না। 'সাকেত' নামক প্রাচীন স্থানটি বর্তমান ভারতের গোণ্ডা জেলায় বা অযোধ্যায় অবস্থিত। সৌন্দরনন্দ কাব্যে মাতার নাম ও জন্মস্থান উল্লেখ থাকলেও পিতার নাম, বংশ পরিচয় এবং পারিবারিক ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রভৃতি সম্পর্কে নীরব। অশ্বঘোষের অন্যান্য গ্রন্থেও এ বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সৌন্দরনন্দ কাব্যে অশ্বঘোষের বংশ সম্পর্কে একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উক্ত কাব্যে অশ্বঘোষের মাতাকে 'আর্য সুবর্ণাক্ষী' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। 'আর্য' শব্দটি কুলীন, ব্রাহ্মণ বা সদ্বংশ প্রভৃতি নির্দেশ করে। এর থেকে প্রতীতি জন্মে যে, অশ্বঘোষ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। এ ধারণাটি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মের তথ্য পর্যালোচনায়ও সত্য বলে প্রতীয়মান হয়। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যে বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত হতে বহু উদাহরণ ও উপমা প্রয়োগ করতে দেখা যায়, যা ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতার সাক্ষ্য বহন করে। চৈনিক ও তিব্বতি ঐতিহ্যেও অশ্বঘোষকে বেদে পারঙ্গম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ ব্যতীত তৎকালীন সময়ে বেদে পারঙ্গমতা অর্জন অসম্ভব ছিল। ফলে অশ্বঘোষ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ধারণা সত্য বলে ধরে নেয়া যায়। গবেষকগণও এ বিষয়ে একমত।

নামকরণ বিষয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন উৎস বা গ্রন্থে অশ্বঘোষের নামকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোল্গা থেকে গঙ্গা* গ্রন্থে অশ্বঘোষ ও প্রভার প্রেম কাহিনির বিবরণ হতে 'অশ্বঘোষ' নামটি তাঁর পিতা-মাতা কর্তৃক প্রদত্ত ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। তবে চৈনিক উৎসে অশ্বঘোষ নামকরণ সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য পাওয়া যায় :

ক. তাঁর ধর্মদেশনা অশ্বও বুঝতে পারতেন বলে তাঁকে অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয়।

খ. তাঁর জন্মের সময় ঘোড়া হ্রেষা ধ্বনি করেছিল বিধায় তাঁর নাম রাখা হয় অশ্বঘোষ।

গ. অথবা একদা তিনি ধর্ম দেশনা করার সময় এক ক্ষুধার্ত ঘোড়া খাবার কথা ভুলে যায় এবং

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম দেশনা শুনে আনন্দ সহকারে হ্রেষা ধ্বনি দিতে থাকেন, তাই তাঁকে অশ্বঘোষ বলা হতো।

ঘ. বীণা বাজিয়ে তিনি ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন, তাই তাঁকে অশ্বঘোষ নামে অভিহিত করা হয়।

কিন্তু অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে এবং অন্যান্য উৎসে উপর্যুক্ত নামকরণ সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে উক্ত তথ্যের সত্যতা নির্ণয় এবং নামকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা কঠিন।

যৌবনকাল ও দীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিভিন্ন উৎসে যৌবনকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও বাল্যকাল সম্পর্কে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। তাছাড়া, যৌবনকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। রাহুল সাংকৃত্যায়নের *ভোল্গা থেকে গঙ্গা* গ্রন্থে অশ্বঘোষের যৌবনকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে বর্ণিত তথ্য পাঠে জানা যায় যে, অশ্বঘোষ যৌবন কালে নাটক রচনা, নির্দেশনা, নাট্যাভিনয় ও স্বরচিত গান পরিবেশন করে বেড়াতেন। ঝাঁঝ-করতাল, ঢাক-ঢোল, বাঁশি এবং গিটার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার সময় তিনি বৈশ্য তরুণী প্রভার প্রেমাসক্ত হয়ে পড়েন। অশ্বঘোষ পিতা-মাতার নিকট প্রভাকে বিবাহ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। মাতা কিছুটা নমনীয় হলেও পিতা কুল ধর্ম রক্ষার জন্য উক্ত প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় প্রভা সরযূ নদীতে জীবন বিসর্জন দেন। শোকে মূহ্যমান অশ্বঘোষ মহাস্থবির ধর্মসেনের উপধ্যায়ত্বে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষিত হন এবং ভদন্ত ধর্মরক্ষিত ছিলেন তাঁর আচার্য। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে চৈনিক ঐতিহ্যে ভিন্ন কাহিনি পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কুমারজীব কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনূদিত অশ্বঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত পাওয়া যায়। এ জীবন-চরিতে বাল্যজীবন ও দীক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা অন্যান্য খ্যাতিমান প্রাচীন বৌদ্ধ দার্শনিক ও সাহিত্যিকের, বিশেষত নাগার্জুন, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, বুদ্ধঘোষ, ধর্মকীতি প্রমুখের দীক্ষা কাহিনির সঙ্গে প্রায় মিল রয়েছে। উক্ত জীবন-চরিত পাঠে জানা যায়, অশ্বঘোষ ছিলেন ত্রিবেদজ্ঞ, পার্থিব জ্ঞানে ঋদ্ধ এবং যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী। যৌবনকালে তিনি বিতর্ক করে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করে বেড়াতেন এবং খ্যাতিমান পণ্ডিতদের পরাভূত করে প্রভূত যশ-খ্যাতি অর্জন করেন। একদা তিনি পার্শ্ব থেরর সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

বিতর্কে লিপ্ত হন এবং বিতর্কে পরাজিত হয়ে শর্তানুযায়ী পার্শ্ব থেরর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। অপর এক চৈনিক ঐতিহ্যে এবং তিব্বতি উৎসে দীক্ষা গুরু হিসেবে পূণ্যযশ স্থবিরের নামোল্লেখ আছে। আবার, মহাযানীদের মতে, অশ্বঘোষ আর্যদেবের শিষ্য ছিলেন। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে দীক্ষা সম্পর্কিত তথ্য উল্লেখ না থাকায় তিনি কাঁর নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা দুষ্কর। তবে সকল ঐতিহ্য একমত যে, তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন দীক্ষাগুরুর নামোল্লেখ থাকলেও গবেষকগণ মনে করেন, অশ্বঘোষ পার্শ্ব থের বা তাঁর শিষ্য পূণ্যযশের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন। তবে অশ্বঘোষের জীবনী সংক্রান্ত তথ্যের মধ্যে সর্বাপ্রেক্ষা প্রাচীন হচ্ছে চৈনিক ভাষায় কুমারজীব অনূদিত জীবন-চরিত। ফলে প্রাচীন ঐতিহ্য বিবেচনায় অশ্বঘোষ পার্শ্ব থেরর নিকটই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন - এরূপ ধারণা করলে অত্যুক্তি হবে না। অশ্বঘোষের স্বরচিত নাটকের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং চৈনিক ভাষায় অশ্বঘোষের নিজের লেখা ও সুরাপোতি গান সংরক্ষিত আছে। ফলে যৌবনকালে তিনি নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ছিলেন তা সত্য হিসেবে গণ্য করা যায়।

অশ্বঘোষের নিকায় সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষের সময়কালে বৌদ্ধসংঘ নানা নিকায়ে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তিনি কোন্ নিকায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা তাঁর সাহিত্যকর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই। তাছাড়া, বিভিন্ন উৎসে তাঁকে বিভিন্ন নিকায়ের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন বৌদ্ধ নিকায়ের দার্শনিক তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাওয়ায় পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁর নিকায় বিষয়ে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। অশ্বঘোষ বৌদ্ধ ভিক্ষু হলে মূলত কবি। কবির লেখায় নানা জাতি, ধর্ম এবং দর্শনের কথা থাকতে পারে। তা দিয়ে কবির পরিচয় নির্ধারণ করা যথার্থ নয়। তবে অশ্বঘোষ দীক্ষাগুরু হিসেবে যাঁদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় তাঁরা সকলেই সর্বাস্তিবাদ নিকায়ের অধিভুক্ত ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষত, পার্শ্ব থের এবং পূণ্যযশ থের উভয়ে সর্বাস্তিবাদী নিকায়ের অনুসারী ছিলেন বলে বিভিন্ন ঐতিহ্য সাক্ষ্য দেয়। সাধারণত, শিষ্যগণ গুরুর আদর্শ অনুসরণ করেন। তাছাড়া, অশ্বঘোষের দু'টি

প্রধান গ্রন্থ বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যদ্বয়ে ভক্তিবাদের কিছুটা ছোঁয়া থাকলেও মূলত হীনযানী ভাবাদর্শে রচিত এবং অশ্বঘোষের সময়কালে মহাযানী ভাবধারা পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হয়নি। ফলে ধারণা করা যায় যে, অশ্বঘোষ হীনযানী ঐতিহ্যের অন্তর্গত সর্বাস্তিবাদ নিকায়ের অনুসারী ছিলেন।

অশ্বঘোষের দীক্ষা-উত্তর জীবন ও পাণ্ডিত্য অনুধ্যানে দেখা যায়, এ বিষয়ে বিভিন্ন উৎসে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায় এবং তথ্যসমূহের মধ্যে মিল-অমিল উভয়ই লক্ষ্য করা যায়। তবে দীক্ষা-উত্তর জীবনের দালিলিক প্রমাণ হচ্ছে তাঁর রচিত সাহিত্যকর্ম। দীক্ষার পর তিনি যে গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর রচিত সকল গ্রন্থই বুদ্ধের জীবন-দর্শন ভিত্তিক। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনে গভীর পাণ্ডিত্য না থাকলে বুদ্ধের জীবন-দর্শন ভিত্তিক নানা আঙ্গিকের এবং উন্নত মানের সাহিত্যকর্ম রচনা সম্ভব হতো না। ফলে ধারণা করা যায় যে, দীক্ষার পর তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে বহু বৌদ্ধ তত্ত্বের, বিশেষত চতুরার্য সত্য, আর্য-অষ্টাঙ্গিকমার্গ, প্রতীত্যসমুৎপাদ এবং কর্মবাদ তত্ত্বের অপূর্ব বর্ণনা পাওয়া যায়, যা অশ্বঘোষকে কবি অপেক্ষা ধর্মপ্রচারক হিসেবেই অধিক উপস্থাপন করে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, পুরাণশাস্ত্র প্রভৃতি হতে উদ্ধৃত বহু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্রের উপমা প্রদান করতে দেখা যায়। তাছাড়া, কাব্যদ্বয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সম্পর্কিত বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ছাড়াও অশ্বঘোষ যে সার্বজনীন বিদ্যা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা অধ্যয়ন করেছিলেন তা প্রমাণ করে। চৈনিক ঐতিহ্যের তথ্য হতেও এই ধারণার সত্যতা পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে পরমার্থ কর্তৃক চৈনিক ভাষায় অনূদিত বসুবন্ধুর জীবনীতে প্রসঙ্গক্রমে অশ্বঘোষ সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। তাতে অশ্বঘোষের পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, তিনি অষ্টাঙ্গ ব্যাকরণে, চারি বেদে, ষড় দর্শনে, আঠার (১৮) নিকায়ের ত্রিপিটকে পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম সকল বিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। চৈনিক ভাষায়

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কুমারজীব অনূদিত অশ্বঘোষের জীবন চরিত সাক্ষ্য দেয় যে, অশ্বঘোষ মধ্যভারতে অবস্থান করে সকল বৌদ্ধ সূত্র আয়ত্ব করেন এবং অবৌদ্ধ বিষয়েও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। বিতর্কে অতুলনীয় যুক্তি প্রদর্শন এবং অপরিসীম প্রজ্ঞার কারণে তিনি ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক এবং উপাসিকা - এই চারি পরিষদের নিকট তিনি পূজিত হতেন এবং বিতর্কে পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের কারণে ভারতবর্ষের রাজাগণও তাঁকে গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষত, মগধরাজ বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র এবং অশ্বঘোষকে অতি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করতেন। আলোচনায়, দেশনায়, বাগ্মীতায় তাঁর ব্যাপ্তি ও খ্যাতির প্রসার ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য কুশান সম্রাট কণিষ্ক তাঁকে সভাকবি পদে অভিষিক্ত করেছিলেন। সম্রাট কণিষ্কের আমলে কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত মহাসঙ্গীতিতে তিনি সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রখ্যাত মহাবিভাষাশাস্ত্র রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিব্বতি ঐতিহ্য মতে, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর অশ্বঘোষ কেবল ধর্মপ্রচারক হিসেবে নয়, কবি এবং সঙ্গীত শিল্পী হিসেবেও কুসুমপুর নামক স্থানে (বর্তমান পাটনা) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ভিক্ষু আচার্য, ভদন্ত, মহাকবি, মহাবাগ্মী প্রভৃতি অভিধা লাভ করেন।

অশ্বঘোষের জীবনী পর্যালোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম অর্থাৎ দু'টি পরস্পর বিরোধী ভাবাদর্শকে আপন মহিমায় ধারণ করেছিলেন, যা তাঁর মনোজগতকে বৈচিত্র্য অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞায় ঋদ্ধ করেছিল। বৈচিত্র্যময় জীবন চর্চায় সঞ্চিত বিচিত্র অভিজ্ঞতার কারণেই তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যকে নানামুখী অবদানে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম সমীক্ষা পূর্বক প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ করেছি। কারণ, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের কোন্ কোন্ শাখাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে অশ্বঘোষ অবদান রেখেছিলেন তা নির্ণয়ের জন্য প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণ একান্ত আবশ্যক। সমীক্ষায় দেখা যায়, ভারতীয়, তিব্বতি এবং চৈনিক উৎসে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া যায় :

Dhaka University Institutional Repository

১) বুদ্ধচরিতম্ ২) সৌন্দরনন্দম্ ৩) শারিপুত্রপ্রকরণম্ ৪) রাষ্ট্রপাল ৫) কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ৬) খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর ৭) নাম বিহীন প্রতীকী নাটক ৮) শত-পঞ্চশতক-নাম-স্তোত্র ৯) গণ্ডি-স্তোত্র-গাথা ১০) মহাকাল-কন্ত্র-রুদ্র-কল্প-মহাশ্মশান-নাম-টীকা ১১) বজ্রযান-মূলাপত্তি-সংগ্রহ ১২) স্থূলাপত্তি ১৩) মণিদ্বীপ-মহাকারুণিক-পঞ্চ-দেব-স্তোত্র ১৪) গুরু-পঞ্চাশিকা ১৫) দশ-অকুশল-কর্ম-পথ-নির্দেশ ১৬) শোক-বিনোদন ১৭) অষ্টাক্ষণ-কথা ১৮) পরিণামসা-সংগ্রহ ১৯) বজ্র-সত্ত্ব-প্রশ্নোত্তর ২০) সূত্রালংকারশাস্ত্র ২১) শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র ২২) বজ্রসূচি ২৩) ষড়গতিকারিকাহ্ ২৪) দশদুষ্টকর্মমার্গসূত্র ২৫) মহাযান ভূমিগুহ্যবাচামূলশাস্ত্র ২৬) Lai-cha-huo-lo (A song) ২৭) Ni-kan-tzu-wen-wi-i-ching (A sutra on a Jaina's asking about the theory of non-ego) ২৮) Shi-shih-fa-wu-shin-sung (Fifty verses on the rules of serving a teacher) ২৯) Ta-sung-ti-hsuan-wen-pen-lun (A fundamental treatise on the spiritual States fr Reaching final deliverance) ৩০) Shih-pu-shan-yeh-tao-ching (A sutra on the ten no good deeds)

অশ্বঘোষ সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করলেও উপরোক্ত সকল গ্রন্থের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি বা মূল সংস্কৃত ভার্সন আবিষ্কৃত হয়নি। আবার, কোনো গ্রন্থের তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া গেলেও চৈনিক অনুবাদ পাওয়া যায় না বা চৈনিক উৎসে তা অন্যজনের রচনা হিসেবে উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে কোনো গ্রন্থের চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গেলেও তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া যায় না বা তিব্বতি অনুবাদে লেখক হিসেবে অন্যজনের নামোল্লেখ আছে। কোনো কোনো গ্রন্থে লেখকের নামোল্লেখ থাকলেও অনেক গ্রন্থে লেখকের নামোল্লেখ নেই। তাছাড়া, গ্রন্থসমূহের মধ্যে রচনাশৈলী এবং বিষয়বস্তু ধরনের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। তবে কিছু গ্রন্থ আছে যেগুলো সংস্কৃত, তিব্বতি এবং চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গেছে এবং লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে। উপরোক্ত কারণে অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম নিয়ে গবেষকদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। অশ্বঘোষের প্রকৃত সাহিত্যকর্ম নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করেছি :

Dhaka University Institutional Repository

১) যেসব গ্রন্থের মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে এবং লেখক পরিচিতি অংশে রচয়িতা হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে;

২) যেসব গ্রন্থে মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু ভারতীয় একাধিক ভাষায় এবং অন্যান্য বিদেশি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে;

৩) রচনাশৈলী, বিষয়-বিন্যাস এবং ভাবাদর্শ বিচারে যেসব গ্রন্থ অশ্বঘোষের রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে, সেসব গ্রন্থ অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে গণ্য করেছি।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে বিভিন্ন উৎসে বর্ণিত অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায় : ক) বিতর্কমুক্ত খ) আংশিক বিতর্কিত গ) বিতর্কিত এবং ঘ) অমীমাংসিত।

ক) বিতর্কমুক্ত গ্রন্থ : বিতর্কমুক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, শারিপুত্রপ্রকরণ এবং নাম বিহীন প্রতীকী নাটক হচ্ছে অন্যতম। বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ এবং শারিপুত্রপ্রকরণ - এ তিনটি গ্রন্থের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি বিভিন্ন দেশের ভাষায় সংরক্ষিত অনুবাদকর্মেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। এই তিনটি গ্রন্থের লেখক পরিচিতি অংশে বা Colophon-এ লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নাম উল্লেখ আছে। ফলে এই তিনিটি গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো বিতর্ক নেই এবং গ্রন্থত্রয় অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে গণ্য করা যায়। প্রতীকী নাটকটির সামান্য অংশমাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে লেখক পরিচিতি অংশ যেমন নেই, তেমনি এর পাঠযোগ্যতাও নেই। কিন্তু রচনাশৈলী, বিষয়বস্তু, ভাব-ভাষা ও লেখতত্ত্বের বিচারে প্রতীকী নাটকটিও অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে গণ্য করা যায়।

খ) আংশিক বিতর্কিত গ্রন্থের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে : রাষ্ট্রপাল নাটক এবং গণ্ডীস্তোত্রগাথা। রাষ্ট্রপাল নাটকের সংস্কৃত পুথি যেমন আবিষ্কৃত হয়নি, তেমনি অন্য ভাষায় এর অনুবাদকর্মও পাওয়া যায় নি। কিন্তু খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তি রচিত *বাদন্যায়* গ্রন্থে নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে বর্ণিত আছে। তাছাড়া, নাটকটির বিষয়বস্তু শারিপুত্রপ্রকরণের সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বুদ্ধশিষ্য শারিপুত্রের ন্যায় এ নাটকে বুদ্ধশিষ্য রাষ্ট্রপালের দীক্ষা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ফলে, বিতর্ক

Dhaka University Institutional Repository

থাকলেও এবং পুথি আবিষ্কৃত না হলেও এ নাটকটি অশ্বঘোষের রচনা তালিকায় স্থান দেওয়া যেতে পারে। গণ্ডীস্তোত্রগাথা গ্রন্থের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে তিব্বতি ও চৈনিক অনুবাদ পাওয়া গেছে এবং তাতে লেখক হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ আছে। ফলে সামান্য বিতর্ক থাকলেও গ্রন্থদ্বয় অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গ) বিতর্কিত গ্রন্থ : সূত্রালংকার, বজ্রসূচী, শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র, কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়, ষড়গতিকারিকাহ্ এবং শতপঞ্চশতকনামস্তোত্র প্রভৃতি গ্রন্থের মূল সংস্কৃত ভার্সন আবিষ্কৃত হয়নি। তাছাড়া, লেখক সম্পর্কে উৎসসমূহের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এক উৎসে রচয়িতা হিসেবে অশ্বঘোষের নামোল্লেখ পাওয়া গেলে অন্য উৎসে সেই গ্রন্থের লেখক হিসেবে অন্য জনের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া, গ্রন্থসমূহের রচনাশৈলী, ভাব-ভাষা এবং বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকৃত গ্রন্থসমূহ হতে ভিন্ন। এসব কারণে গ্রন্থসমূহ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়।

ঘ) অমীমাংসিত : খ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর, মহাকাল-কন্ত্র-রুদ্র-কল্প-মহাশ্মশান-নাম-টীকা, বজ্রযান-মূলাপত্তি-সংগ্রহ, স্থূলাপত্তি, মণিদ্বীপ-মহাকারুণিক-পঞ্চ-দেব-স্তোত্র, গুরু-পঞ্চাশিকা, দশ-অকুশল-কর্ম-পথ-নির্দেশ, শোক-বিনোদন, অষ্টাক্ষণ-কথা, পরিণামসা-সংগ্রহ এবং বজ্র-সত্ত্ব-প্রশ্নোত্তর, দশদুষ্টকর্মমার্গসূত্র, মহাযান ভূমিগুহ্যবাচামূলশাস্ত্র, Ni-kan-tzu-wen-wi-i-ching (A sutra on a Jaina's asking about the theory of non-ego), Shi-shih-fa-wu-shin-sung (Fifty verses on the rules of serving a teacher), Ta-sung-ti-hsuan-wen-pen-lun (A fundamental treatise on the spiritual States for Reaching final deliverance), Shih-pu-shan-yeh-tao-ching (A sutra on the ten no good deeds) প্রভৃতি গ্রন্থ বিভিন্ন উৎসে অশ্বঘোষের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া গেলেও গ্রন্থগুলোর সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়নি। তাছাড়া, গ্রন্থগুলোর ইংরেজি অনুবাদও পাওয়া যায় না। অধিকন্তু গ্রন্থগুলো সম্পর্কে গবেষণাকর্মও খুব অপ্রতুল এবং দুর্লভ। ফলে গ্রন্থগুলো অশ্বঘোষের প্রকৃত রচনা কিনা সিদ্ধান্ত প্রদান করা কঠিন।

যাহোক, সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, অশ্বঘোষ কাব্য, নাটক এবং বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচনা পূর্বক বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

গ্রন্থের গুণগত মান এবং লেখকের সফলতা নির্ভর করে অবলম্বনকৃত বিষয়বস্তুর মহত্ত্ব ও গ্রহণযোগ্যতার উপর। গ্রন্থ রচনায় অশ্বঘোষ কতটুকু সফল ছিলেন তা নির্ণয়ের জন্য তৃতীয় অধ্যায়ে অশ্বঘোষ রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তুর স্বরূপ এবং উৎস সমীক্ষায় করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষের সকল গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বুদ্ধের জীবন-দর্শন ও তাঁর শিষ্যগণের দীক্ষা কাহিনি এবং অধিকাংশ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর উৎস গ্রহণ করা হয়েছে পালি ত্রিপিটক হতে। তবে অশ্বঘোষ রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণশাস্ত্রে হতে বহু ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক চরিত্রের উপমা এবং উদ্ধৃতি গ্রহণ পূর্বক বর্ণিত বিষয়বস্তুর যথার্থতা প্রতিপন্ন করেছেন, যা অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণশাস্ত্রের প্রভাব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, সংসারত্যাগ ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ প্রভৃতি বুদ্ধের জীবন সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সাধারণ, মানবিক, সামাজিক এবং এমনকি গৃহজীবনের নানা কথাও অশ্বঘোষ তাঁর সাহিত্যকর্মে উপস্থাপন করেছেন কুশলতার সঙ্গে। তাছাড়া, বিষয়বস্তুকে প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করার মানসে বিচক্ষণতার সঙ্গে অশ্বঘোষ বহু পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক চরিত্রও উপস্থাপন করেছেন। ফলে, ধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত হলেও তাঁর সরল স্বাভাবিক সামাজিক অনুচিন্তন, মননশীলতা এবং রচনা চাতুর্য্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর রচনাকে শুষ্ক ধর্মগ্রন্থ থেকে পৃথক্ করে কালজয়ী সাহিত্যের মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ ধর্মীয় ভাবনা পরিবেশনের পাশাপাশি লোকায়ত পরিবেশ সৃষ্টি করতেও সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে দু'ধরণের আবেদন রয়েছে : ধর্মকে আপন জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সেই আদর্শকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়া। একটির উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজে আলোকিত হওয়া এবং অপরটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অন্যকে আলোর পথে নিয়ে আসা।

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষ রচিত গ্রন্থের বিষয়বস্তু সমীক্ষা হতে স্পষ্ট হয় যে, তিনি শুধু উন্নত সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের মর্যাদাই বৃদ্ধি করেন নি, অধিকন্তু মানুষকে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ এবং দুঃখমুক্তির পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

একজন লেখকের কৃতিত্ব বিচারের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর পাশাপাশি রচনাশৈলীর সৌকর্য, রচনার উদ্দেশ্য এবং স্বাজাত্যবোধ - এই তিনটি গুণ বিবেচনা করা অত্যাবশ্যক। চতুর্থ অধ্যায়ে এই তিনটি বিষয় পর্যালোচনাপূর্বক বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে অশ্বঘোষের অবদান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। প্রথমে অশ্বঘোষের রচনাশৈলী সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ কাব্যে সংস্কৃত আলংকারিক নির্দেশিত সর্বোত্তম কাব্যরীতি বৈদর্ভী রীতি প্রয়োগ করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই রীতির প্রচলন থাকলেও অশ্বঘোষই প্রথম ব্যক্তি যিনি বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে এই রীতির প্রচলন করেছেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডারে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। রচনার উদ্দেশ্য সমীক্ষায় পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, অশ্বঘোষ নানা আঙ্গিকের বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রকৃতির সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর গতি-প্রকৃতি অনুসারে রচনার উদ্দেশ্যও ভিন্ন হয়। কিন্তু বিষয়বস্তু ও সাহিত্যকর্মের ধরণ ভিন্ন হলেও অশ্বঘোষের প্রায় সকল গ্রন্থেরই রচনার মূখ্য উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ নানা দুঃখে জর্জরিত, বিষয়ভোগে মত্ত, লোভ-দ্বেষ-মোহে আসক্ত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত এবং মুক্তির বিষয়ে বিমুখ মানুষকে বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে দুঃখমুক্তি তথা নির্বাণের পথে পরিচালিত করা। অশ্বঘোষ কবি বা সাহিত্যিক হলেও মূলত বৌদ্ধ ভিক্ষু। বুদ্ধের জীবন-দর্শনই ছিল তাঁর জীবন চর্চার পাথেয়। তিনি নিজে যেমন বুদ্ধের শিক্ষাকে ধারণ করেছেন তেমনি তা গ্রন্থ রচনার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে অপরের মাঝেও ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে অপররের মুক্তিও কামনা করেছেন। এই আদর্শের পাশাপাশি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্পকলার বহু গুরুত্বপূর্ণ উপাদানও ধারণ করে আছে। বিশেষত, প্রাচীন ভারতীয় জনপদ, নগর, বন্দর, গ্রাম, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়, যা

Dhaka University Institutional Repository

অশ্বঘোষের স্বদেশ প্রেমের স্বাক্ষর বহন করে। এসব তথ্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া, অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্মে নৈতিকতায় ভাস্বর, ত্যাগের মহিমায় প্রোজ্জ্বল, অনুকরণীয় এবং অনুসরণীয় বহু ধার্মিক ও সাধু-সজ্জন ব্যক্তির জীবনী পাওয়া যায়, যা মানুষের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতা জাগ্রত করে। অতএব, বলা যায়, অশ্বঘোষের উন্নত রচনাশৈলী বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যকেই কেবল ঋদ্ধই করে নি, অধিকন্তু তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য এবং স্বাজাত্যবোধ জাতির কল্যাণ সাধনেও ব্যাপৃত ছিল।

অশ্বঘোষের নানা পরিচয় থাকলেও তিনি 'মহাকবি' হিসেবেই সবচেয়ে বেশি পরিচিত ছিলেন। গবেষকগণ মনে করেন, বুদ্ধচরিত কাব্য রচনার জন্যই অশ্বঘোষ 'মহাকবি' অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। তিনি 'মহাকবি' পদবাচ্যের যোগ্য কি না এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকাব্য শাখাকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান কতটুকু তা পরিমাপের জন্য পঞ্চম অধ্যায়ে মহাকবি হিসেবে অশ্বঘোষের মূল্যায়ন সমীক্ষা করেছি। সমীক্ষায় দেখা যায়, মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে কবিকে সংস্কৃত আলংকারিক নির্দেশিত কতিপয় বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করতে হয়, অন্যথায় তা মহাকাব্য পদবাচ্য হতে পারে না। বুদ্ধচরিত কাব্যে অশ্বঘোষ আলংকারিক নির্দেশিত প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করলেও শৃঙ্গাররস, বিরহ-মিলন এবং নায়কের জয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু এই ব্যর্থতা অশ্বঘোষের কবিত্ব শক্তির অপূর্ণতার জন্য নয়, কাব্যে অবলম্বনকৃত বিষয়বস্তুর ধরণের জন্য। বিষয়বস্তু বিবেচনায় বুদ্ধচরিত কাব্যখানি অন্যান্য মহাকাব্য হতে ভিন্ন। ধর্ম ও সংসার ত্যাগী ধার্মিকের জীবনী তথা গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন এ কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। আনন্দ দান অশ্বঘোষের কাব্য রচনার উদ্দেশ্য নয়, দুঃখ মুক্তির পথ বিশ্লেষণই ছিল তাঁর কাব্য রচনার প্রধান লক্ষ্য। ফলে অন্যান্য ভারতীয় মহাকাব্য তথা *রামায়ণ*, *মহাভারত*, *কিরাতার্জুনীয়ম্* প্রভৃতি গ্রন্থের মতো আলংকারিক নির্দেশিত সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী গৌতমবুদ্ধের জীবন-চরিত প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিত কাব্যে শৃঙ্গাররস, বিরহ-মিলন এবং নায়কের জয় প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। তবে,

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলেও বুদ্ধচরিত কাব্যে সংস্কৃত আলংকারিক নির্দেশিত প্রায়ই বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও অশ্বঘোষ সুনিপুণ রচনাশৈলী দ্বারা কাব্যখানিকে উচু মানের মহাকাব্যের মর্যাদা দান করেছে। পণ্ডিত সমাজেও গ্রন্থখানি মহাকাব্য হিসেবে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

পরিশেষে বলা যায়, অশ্বঘোষ কাব্য, মহাকাব্য, জীবনালেখ্য, নাটক, গান প্রভৃতি ছাড়াও দর্শন, যুক্তিবিদ্যা এবং নীতিবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারকে বৈচিত্রময় করে তুলেছেন এবং নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বুদ্ধের জীবন-দর্শনকে অবলম্বন করে অশ্বঘোষের পূর্বে এবং পরে সংস্কৃত ভাষায় নানা শ্রেণির গ্রন্থ রচিত হলেও মহাকাব্য রচিত হয়নি। তিনিই প্রথম এবং একমাত্র বৌদ্ধ পণ্ডিত যিনি মহাকাব্য রচনা করে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যেকে পরিপূর্ণতা দান করেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তিনিই প্রথম বৌদ্ধ কাব্যজগতে সর্বোত্তম কাব্যরীতি বিদর্ভ রীতি প্রচলন করেছিলেন, যা বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের মান-মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছিল। তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যও ছিল মহৎ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নানা রকম দুঃখে জর্জরিত মানুষকে বুদ্ধের শিক্ষার আলোকে দুঃখমুক্তি পথে তথা নির্বাণের পথে পরিচালিত করাই ছিল তাঁর গ্রন্থ রচনার অন্যতম উদ্দেশ্য। তিনি নিজে ধর্মকে ধারণ করে আলোকিত হয়েছেন এবং গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে অপরকেও আলোর পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। অতএব, সার্বিক বিবেচনায় বলা যায়, বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারকে ঋদ্ধ করার ক্ষেত্রে অশ্বঘোষের অবদান অপরিসীম।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. প্রাথমিক উৎস : বাংলা

ঈশানচন্দ্র ঘোষ (অনু), *জাতক*, ৪র্থ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ।

কালী প্রসন্ন সিংহ (অনু), *বেদব্যাস মহাভারত* ১ম ও ২য় খণ্ড, বেণীমাধব শীল'স লাইব্রেরী, কলিকাতা, ২০০৫।

চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়, *কাব্যাদর্শ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৫।

জগদীশচন্দ্র ঘোষ, *শ্রীমদ্ভগবদগীতা*, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৭৭।

শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের (অনু), *দীর্ঘ নিকায়*, শুধাংশু বিমল বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত, রেঙ্গুন, ১৯৬২।

প্রসূন বসু, *বুদ্ধচরিতম্*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৮।

প্রসূন বসু, *সৌন্দরনন্দম*, *সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ৯ম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮০।

প্রসূন বসু, *শারিপুত্রপ্রকরণ*,*সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার*, ১১তম খণ্ড, নবপত্র প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৮১।

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির (অনু), *মহাবর্গ*, কলিকাতা, ১৯৩৭।

বিমলাচরণ লাহা (অনু), *সৌন্দরনন্দ কাব্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কোলকাতা, ২০০৩।

বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, *সাহিত্যদর্পণঃ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ।

বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্য দর্পণ* (১ম পরিচ্ছেদ), অধ্যাপক শ্রী সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সংশো.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০০২।

বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্য দর্পণ (১ম ও ২য় পরিচ্ছেদ)*, সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (সম্পা.), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।

বিশ্বনাথ কবিরাজ, *সাহিত্য দর্পণ (৬ষ্ঠ অধ্যায়)*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৮৮।

মনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (অনু), *বুদ্ধচরিত*, ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৮০।

Dhaka University Institutional Repository

মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী (অনু), *বুদ্ধচরিত (অশ্বঘোষ)* , ধর্ম্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু), *কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্রম্* , সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০২

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (অনু), *মনুসংহিতা* , সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ

যুধিষ্ঠির গোপ, *দণ্ডিকৃতঃ কাব্যাদর্শ (প্রথম পরিচ্ছেদঃ)*, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০৪।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *ভোল্গা থেকে গঙ্গা*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০০৭ (নবম মুদ্রন)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বুদ্ধচরিত (অনুবাদ)*, বিশ্বভারতী, কলিকাতা ১৩৯৬।

রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি রামায়ণ (সারানুবাদ)*, সং ১০, এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লি, কলিকাতা, ১৩৯৬।

স্থবির, *থেরগাথা*, রেঙ্গুন বৌদ্ধ-মিশন প্রেস, রেঙ্গুন, ১৯৩৫।

খ. প্রাথমিক উৎস : ইংরেজি

Albert A. Dalia, '*Biography of Dharma Master Vasubandhu'*, Translated from Sanskrit into Chinese by Paramartha, Taisho Volume 50, No. 2049, BDK English Tripitaka 76-III, IV, V, VI, VII, Numata Center for Buddhist Translation and Reserach, California, 2002.

Bunyin Nanjio, *Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka*, Oxford University Press, Oxford, 1833.

Bhikkhu Nanamoli (trans), *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, Colombo, 1964.

Bhikkhu Dhamma Rakkhita (ed.) *Paramattha Nama Jatakatthakatha*, Bharatiya Gyanapita, Kasi, 1951.

C.V. Joshi (ed.) *Saddhammappakasini*, P.T.S. London, vol.1, 1933.

Coomara Swamy, *Data Vamsa*, Trubner, London, 1874.

D. Chattopadhyaya (ed.), *Taranatha's History of Buddhism in India*, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi 1990.

E. H. Johnston, *Asvaghosa's Buddhacarita or Act of the Buddha*, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi 1995 (rep.).

E. B. Cowell, *Asvaghosa's Buddhacarita,* Sacred Books of the East, Vol. XLVI.

E. B. Cowel (ed.), *The Buddha-Carita or Life of Buddha by Asvaghosa*, Oriental Press, Amsterdam, 1970.

Edward Muller (ed.), *Atthasalini,*Commentary on the Dhammasangani, P.T.S. London, 1897.

E. Hardy (ed.) *Dhammapala's Paramattha-dipani* pt. III, being the Commentary on the Peta-vatthu, I vol, P.T.S London, 1894.

E.B. Cowell, (ed.), *The Jataka*. Vol. i. P.T.S. London. 1973-1981.

Feer, M. Leon (ed.), *Samyutta Nikaya*, Part. 1, P.T.S. London. 1973.

Fausbol, (ed.), *The Jataka*, I V., P.T.S. London, 1962.

Gaiger, *Mahavansa,* E. London, P.T.S. 1880.

Herman Oldenberg (ed.), *Vinaya Pitaka*, P. T. S. London, 1982.

Henry Clarke Warren & Dharmananda Kosambi, *Visuddhimagga of Buddhaghosacariya*, Motilal Banarsidass, Delhi, 1999 (reprint).

Hermann Kopp (ed.), *Manorathapurani,* Buddhaghosa's Commentary on the Anguttara-Nikaya, vol. v, P.T.S. London, 1924-1967.

H. C. Norman (ed.), *Dhammapadatthakatha,* vol. 1, P.T.S. London, 1906.

Hardy (ed.) *Dhammapala's Paramattha-dipani* pt. IV, being the Commentary on the Peta-vatthu, 1 vol, P.T.S London, 1901.

I. B. Horner (trans.), *The Book of the Discipline,* P.T.S. London, 6 vols, 1982-1986.

I. B. Horner (trans.), *The Minor Anthologies of the Pali Canon. Part. 3*, P.T.S. London, 1975.

I. B. Horner (ed.), *Madhuratthavilasini nama Buddhavamsatthakatha of Bhadantacariya Buddhadatta Mahathera,* P.T.S. London 1946.

J. Takakusu (trans.), *A Record of the Buddhist Religion as Practised in India and the Malay Archipelago by I-Tsing, Motilal Baranasidass,* Delhi, 1966.

James Gray, *Buddhaghosuppatti*, P.T.S. London, 2001 (reprint).

J. H. Woods and D. Kosambi (ed.), *Papancasudani*, Majjhimanika-yatthakatha of Buddhaghosa, vol. v, P.T.S. London, 1916.

J. Takakusu and M. Nagai (ed.), *Samantapasadika,* Buddhaghosa's Commentary on the Vinaya Pitaka, vol. vi, P.T.S. London, 1924.

Li Longxi, *ÔThe Life of Asvaghosa Bodhisattva'*, Translated from Sanskrit into Chinese by Kumarajiva, *Taisho Volume 50, No. 2046, BDK English Tripitaka* 76-III, IV, V, VI, VII, Numata Center for Buddhist Translation and Reserach, California, 2002.

Morris, Rev. Richard (ed.), *Anguttara Nikaya. Part.1*, P.T.S. London, 1961.

Morris, R. & Hardy, E (ed), *Majjhima Nikaya. 5 vols.*, P.T.S. London, 1885/1900.

Malalasekera, G.P, *Dictionary of Pali Proper Names*, vol. i&ii. P.T.S. London, 1974.

Mabel Bode, *Sasanavansa*, P.T.S. London, 1966.

Morris, R. And Hardy, *Anguttara Nikaya, 5 vols.* E. London, P.T.S. 1885-1900.

P. Maung Tin, *The Path of Purity*, P.T.S. London, vol. 1.

P. V. Bapat, *Vimuttimagga and Visuddhimagga: A Comparative Study*, Poona, Furgusan College, 1973.

R. Morris and E. hardy (ed.), *Anguttara Nikaya*, Vol. I., P.T.S. London, 1985.

Speyer, J.S. (ed.), *Avadanacataka*, vol. i&ii, Meicho-Fukyu-Kai, Japan, 1977.

T. Suzuki (trans.), *Asvaghosa's Discourses on the Awakening of Faith*, Chicago, 1900.

T. W. Rhys Davids and I. Estin Carpenter (ed.), *Digha Nikaya*, P.T.S. London, 1962.

T.W. Rhys & Stede, William (ed.), Davids, *Pali-English Dictionary*, P.T.S. London, 1986.

T.W. Rhys David & W. Stede(ed.), *Sumangalavilasini*, Comentary on the Digha Nikaya, P.T.S. London, 1968-1971.

T.W. Rys Davids and J. Estlin Carpenter (ed.) *The Sumangala-Vilasini*, Buddhaghosa's Commentary on the Digha Nikaya, vol. 1, P.T.S. London, 1986.

Trenckner, *Majjhima Nikaya, 4 vols*, V. and Chalmers, R. London, P.T.S. 1887-1902.

V. Trenckner and R. Chalmers, *Majjhima Nikaya*, P. T. S. London, 1887.

Vaidya, P.L.(ed.), *Divyavadana*. The Mithila Institute, Darbhang, 1959.

Vaidya, P.L.(ed.), *Avadana-Kalpalata*, vol. i&ii. The Mithila Institute, Darbhang , 1959.

Wilhelm Geiger (trans.), *The Mahavamsa*, P.T.S. London, 1980.

Woodward, F.L. (trans.), *The Book of the Gradual Sayings*, vol. i, P.T.S. London, 1979.

William Geiger(trans.), *Cullavamsa*, P.T.S. 105.

গ. দ্বৈতীয়িক উৎস : বাংলা

অসিত কুমার বন্দ্যোপধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা.লি., কলকতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৭।

অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, *মহাকবি অশ্বঘোষঃ বৌদ্ধিক জবিনের নতুন দিগন্ত*, মনন প্রকাশন, চট্টগ্রাম, ১৯৯৩।

Dhaka University Institutional Repository

আশা দাস, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা, ১৩৭৫ বাংলা।

আবুল কালাম শামসুদ্দিন, *বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য :* মধুসূদন ও অনুসারীবৃন্দ, কলকাতা, ১৯৭৯।

শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী শাস্ত্রী, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতের ত্রিধারা*, গোস্বামী প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭।

কানাই লাল রায়, *বুদ্ধচরিতের গল্প*, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, রাজশাহী, ২০০২।

গৌরীনাথ শাস্ত্রী, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৮৭।

জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, *মহাকবিনাশ্বঘোষেণ রচিতম্ বুদ্ধচরিতম্*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৮।

জগন্নাথ বড়ুয়া, *মহাকাব্য ও মহাকবি অশ্বঘোষের কাব্যাদর্শ*, শোভা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৯।

দেব কুমার দাস, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, শ্রী বলরাম প্রকাশনী, কলকাতা ১৪১২।

দিলীপ কুমার বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *বুদ্ধ-উত্তর বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক*, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১৮।

ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮।

নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০২।

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৯৫।

ফয়েজুন্নেছা বেগম, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,২০১২

বিমল চন্দ্র দত্ত, *বৌদ্ধ ভারত*, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ এণ্ড কালচার, কলিকাতা, ১৯৭৩।

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, *বৌদ্ধ সাহিত্য*, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ২০০৭।

মুণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *বুদ্ধচরিত*, ধর্মাঙ্কুর বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৬৩ ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বুদ্ধচরিত*, বিশ্বভারতী, কলিকতা, ১৯০৫/১৩৯৬।

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯।

রনজিৎ কুমার বন্দোপধ্যায় ও রবীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস পরিক্রমা*, কলকাতা, ১৯৯২।

সত্যজিত চৌধুরী ও নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত (সম্পাদিত), *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ*, ৪র্থ খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮১।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭।

সাধন কুমার ভট্টাচায, *মহাকাব্য জিজ্ঞাসা*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ২০০২।

সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।

সুখময় মুখোপধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের পরিচয় ও সময়*, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, ১৯৯২।

সুরেন্দ্রলাল বড়ুয়া, *ধর্মপদ*, শ্রীমতি মনোরমা বড়ুয়া কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৯৬।

সুমন কান্তি বড়ুয়া ও শান্টু বড়ুয়া, *জাতক সন্দর্শন*, অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০১১।

সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম)*, আনন্দ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৮।

সুকুমার সেন *(উপদেশনা)*, সত্যজিৎ চৌধুরী প্রমূখ *(সম্পাদনা)*, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা সংগ্রহ (৩য় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪।

সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৭।

সুকুমার সেন, *চর্যাগীতি পদাবলী*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫।

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অকাদেমী, কলিকাতা, ১৯৬৬।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. দ্বৈতীয়িক উৎস : ইংরেজি

A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Motilal Banarasidass Publishers, Delhi 2001 (reprint).

A. B. Keith, *A History of Sanskrit Literature*, Motilal Baranasidass, Delhi, 1965.

A.B. Keith, *A History Of Sanskrit Literature,* Motilal Banarasdass, Delhi, 1974.

A. B. KEITH, *Sanskrit Drama*, Catalogue Of Sanskrit Manuscripts In The Bodleian Library, Oxford, 1950.

A. K. Warder, *Indian Kavya Literature*, Motilala Baranasidass, Delhi, 1974.

B. C. Law, *ÔAsvaghosa'*, *Encyclopedia of Buddhism*, Ceylon, Government Press, 1967.

B.C. Law, *History of Pali Literature*, Vols-I&Ii, Kegon Paul Trainer And Co. Ltd. 1933.

B. C. Law, *Historical Geography of Ancient India*, Societe Asiatique De Paris, France, 1954.

B. C. LAW, *Asvaghosha*, Royal Asiatic Society of Bengal, Monograph Scries, Culcatta, 1946.

Bimala Churn Law, *AŚVAGHOSA*, The Asiatic Society, Calcutta, 1993.

Debiprasad Chattopadyaya, Taranatha's *History of Buddhism In India. K.p. Banch & Company*, Clacutta, 1980.

E. B. Cowel, *Buddhacarita*, SBE Series, 1983.

E. H. Jonston, *Asvaghosa's Buddhacarita or Acts of the Buddha*, Motilal Baranasidass, Delhi 1995 (rep.).

E.H Johnaston. *The Buddhachaita Or Act Of The Buddha*, Motilal Banarasidass. Delhi, 1984.

G. K. Nariman, *Literary History of Sanskrit Buddhism*, Indological Book House, Varanasi, 1973.

G. P. Malalasekera, *Dictionary of Pali Proper Names*, Vol. II., Musndhiram Manoharlal Publishers Pvt Ltd., 1998.

Dhaka University Institutional Repository

G.P. Malalasekera, *Encyclopedia of Buddhism*, Vol-Ll, Colombo, 1961.

H. Luders, *Bruchstucke buddhistscher Dramen*, Berlin : NGGW, 1911.

H. Luders, *Bruchstucke der Kalpanamanditika des Kumaralata*, Leipzing 1826.

H. Kern, *Manual Of Indian Buddhism*, Munshiram Monoharlal Publishier Pvt. Ltd., Delhi, 1974.

Har Dayal, *The Bodhisattya Doctrine In Buddhist Sanskrit Literature*, Motilal Banarsidass Publication Private Ltd., Delhi, 1970.

J. F. Fleet, ÔThe Traditional Date of Kanishka', *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, London, 1906.

J. H. Marshall, 'The Date of Kanishka', *The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, London, 1915.

James Legge, *The Travels of fa-Hien*, Oriental Publishers, Delhi, 1972.

James Husting. Encyhlopedia of Religion and Eihics. Ed. Vol. Ii, London, 1909.

J.K. Nariman, Literary History of Sanskrit Buddhism, Motilal Banarasidass Publichers Private Ltd. Delhi, 1992.

Sir Jadunath Sarkar, *History Of Bengal*, Vol-ll b.r. Publisliy Delhi, 2004.

K. Venkata Ramanan, *Nagarjuna's Philosophy*, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi 1983.

Kimura, *Himayama and Mahayana*, Motilal Baranasidass, Delhi, 1927.

M M. Winternitz, *History of Indian Literature*, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd.,Vol. II, New Delhi 1991.

M. Anesaki, *ÔAsvaghosa', Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. 2, Charles Scribner's Sons, New York, 1988.

M. Anesaki, 'Asvaghosa' Encyclopacdia of Religion and Ethis, Vol, Ii, Charlcs Svribner's Sons New York, 1987.

Patrick Olivelle, *Life of The Buddha by Asvaghosa*, New York University Press, JIC Foundation, New York 2008.

Dr. Sumangal Barua, *Buddhist Councils and Development of Buddhism*, Atisha Memorial Publishing Society, Calcutta 1997.

Samuel Beal, *Buiddhist Literature in China*, Asian Educational Services, New Delhi, 1999.

Sarla Khosla, *Asvaghosa and His Times*, Intelectual Publishing House, New Delhi, 1986.

S. Beal, *Buddhist Literature in China*, Asian Educational Services, New Delhi, 1999.

Si-Yu-Ki, *Buddhist Records of the Western World*, Samel Beal, Delhi, 1981.

DR. Surendranath Das Gupta & Dr. Sushil Kumar By *A History of Sanskrit Literature*, Vol-L-Ll, University of Calcutta, 1987.

Sujit Kumar Mukhopadhyaya, (Ed.), *The Vajrasuci of Askaghosa*, Calcutta, 1950.

Sylvain Levi, According To Chinese Sources, *Asvagthosha Was the Spiritual Counsellor of King Kaniska*, Journal of the asiatque, 1876.

S. Levi, *JA*, 1908, vol. vii.

S. N. Dasgupta, *History of Indian Philosophy*, Vol. 1.

Thomas Watters, *On Yuan Chwang's Travels in India*, Vol. 1, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., New Delhi 1996.

Thomas Watters, *On Yuang Chwang;s Travel in India*, London Royal Asiatic Society, London 1904.

T. Suzuki Asvaghosa's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana, Ed., Chicago, 1900.

Vinaya Pitklam, vol. II. P. T. S. London.

W. Rahula, *History of Buddhism in Coylong*. M.d. Cnunasenea & Co. Ltd. Colombo, 1956.

W. Geiger, *Pali Literature and Language* Tans. By Batakrishna Ghosh, Calucutta University India, 1943.

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. প্রবন্ধ (জার্নাল) :

দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *মহাকবি অশ্বঘোষের সাহিত্যকর্ম পর্যালোচনা*, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ৪৮বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল ২০০৫।

দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *সংস্কৃত আলঙ্কারিকের বিচারে মহাকাব্য হিসেবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত কাব্যের মূল্যায়ন, কলা অনুষদ পত্রিকা*, ঢাবি, জুলাই ২০০৫-জুন ২০০৬।

মৈত্রী তালুকদার, *পালি সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক অবয়ব : একটি সমীক্ষা*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চতুস্ত্রিংশ খণ্ড, গ্রীষ্মসংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩/জুন ২০১৬ ।

রমা চৌধুরী, *অশ্বঘোষের ভাষা ও রচনাশৈলী*, নালন্দা, বৌদ্ধধর্ম ও ভারত সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা, কোলকাতা, ২০০৬।

সুমন কান্তি বড়ুয়া, *মহাকবি অশ্বঘোষের জীবন ও সাহিত্য কীর্তি*, (প্রবন্ধ), বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ঢাকা, ১৯৯২।

Suman Chatterjee, *SOCIAL CONDITION AS REFLECTED IN SAUNDARANANDA KAVVA*, অত্তদীপ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা, অষ্টম বর্ষ, গড়িয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংসদ, কলকাতা, ২৫৫৮ বুদ্ধাব্দ।